আলজেরিয়ার জিহাদ

ইতিহাস ও শিক্ষা



আলজেরিয়াতে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের জিহাদী আন্দোলন এবং তাতে ছড়িয়ে পড়া ফেতনার আলোচনা, ফাসাদ ও বিশৃংখলার কারণের উপর গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, মুজাহিদীন ও উম্মতে মুসলিমার প্রতি নির্দেশনা।

মাওলানা ডাক্তার উবায়দুর রহমান আল-মুরাবিত হাফিযাহুল্লাহ

ادارۂ حطین | AL HIKMAH MEDIA

আলজেরিয়ার জিহাদ

ইতিহাস ও শিক্ষা

আলজেরিয়াতে বিশ শতকের শেষ দশকের জিহাদী আন্দোলন এবং তাতে ছড়িয়ে পড়া ফিতনার আলোচনা, ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণের উপর গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, মুজাহিদীন ও উম্মতে মুসলিমার প্রতি নির্দেশনা।

মাওলানা ডাক্তার উবায়দুর রহমান আল-মুরাবিত
হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

جہادِ الجزائر – ایک تاریخ ... ایک سبق – مولانا ڈاکٹرعبید الرحمن مرابط

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪৪ পৃষ্ঠা

প্রকাশের তারিখ: মুহাররাম, ১৪৪৩ হিজরী / আগস্ট, ২০২১ ইংরেজি

প্রকাশক: ইদারায়ে হিত্তিন

সূচিপত্র

জিহাদি উলামা-শাইখদের কিছু উক্তি

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ

“ইসলামী আচারপ্রথায় একে অপরের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা অনেক গুরুতর একটা বিষয়। উম্মাহর কতো যুবক আবেগের বশে কিছু একটা করে নিজেদের সময় নষ্ট করেছে এবং গোটা জীবনে বারবার ব্যর্থতার গ্লানি তাদের সইতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ

“পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। ”

আলজেরিয়ার জিহাদে তিন দিক থেকে আক্রমণ এসেছে। ধূর্ত কাফিরগোষ্ঠী, ইরজাগ্রস্ত দরবারী উলামা এবং মুজাহিদদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা সীমালঙ্ঘনকারী খারিজী গোষ্ঠী। তাদের কারণে মুবারক এই জিহাদ বিলুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে সত্যপন্থিদেরকে অটল-অবিচল রেখেছেন। আজও খারিজী ও মুরজিয়াগোষ্ঠী জিহাদ-আগ্রহীদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

“আমার দৃষ্টিতে আলজেরিয়ার জিহাদে মূল বিষয় জনসাধারণের বল্গাহীন আবেগ, যাদের অধিকাংশই শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। জাগতিক নিয়ম-কানুন না জেনে, বাস্তব জ্ঞান অর্জন ব্যতীত এবং ধোঁয়াশাপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য-জ্ঞান অর্জন না করেই কেবল ধর্মীয় বই-পুস্তক মুখস্থ করার দ্বারা কখনও সাফল্য আসতে পারে না। এ কারণেই মুজাহিদদের বড় অংশ খারিজী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতেও পারেনি। যারা ওই বিভ্রান্ত পথ থেকে তওবা করে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন তাদের কাছেই আমি এমন শুনেছি। ”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ

“পশ্চিম আফ্রিকার জিহাদী ইতিহাস পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস এবং তাদের ঈমানী দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তবিকই সম্পূর্ণ পৃথক। ”

“এখানে নব্বইয়ের দশকে সবচেয়ে ভরপুর ও আশা জাগানিয়া জিহাদ তরফ থেকে ব্যাপক সাহায্য- সহযোগিতা, জিহাদ ও বিপ্লব আরম্ভ করার জন্য উপযুক্ত এমন বিভিন্ন কারণের বিদ্যমানতা যেগুলো জনসাধারণের সব শ্রেণি উপলব্ধি করতে সক্ষম—সবই সেখানে ছিলো। জাবহাত আল-ইনকায (সালভেশন ফ্রন্ট)-এর সামাজিক ও দাওয়াতী আন্দোলন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রায় বিলুপ্ত বলে ঘোষণা দেয়া, আলজেরিয়ান সরকারের দুর্বলতা ও দোলাচলবৃত্তি, সেনাবাহিনী, শান্তিরক্ষী বাহিনী ও প্রশাসনের বিবিধ দুর্বলতা, আলজেরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান (পাহাড়,মরুভূমি এবং গ্রাম), ইত্যবসরে আফগানিস্তানের জিহাদের সমাপ্তি, ইসলামী জাগরণের জোয়ার...”

“আমরা যখন আলজেরিয়াতে GIA-এর বিশৃঙ্খলা ও মারাত্মক বিভ্রান্তি দেখেছি, তারপর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে তার চেয়ে বেশি ভয়াবহতা এবং কঠিন পরীক্ষার বিশেষ ভয় এখন আর আমাদের নেই। ”

“যুবকদের উচিত, তারা এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানবে এবং এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আশ্বস্ত থাকবে। এটা প্রত্যেকেরই অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়। শরীয়তের এই ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্য দ্বিধা সৃষ্টিকারী ও বিরোধী লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

এমন কতো লোক রয়েছে; যারা অল্প কিছু মানুষের অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এমন অনেক জিহাদী জামাআতের সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা কাফির ও মুরতাদগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিলো লড়াইরত। তাদের অজুহাত এই ছিলো যে, এ জামাআতের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে অন্য জামাআতগুলোর অবস্থা অনুরূপ হবে বৈকি। অথচ প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো সত্যকে সত্য বলে জানবে এবং নিজের উপর অর্পিত জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করবে, অতঃপর সে পথে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখবে।

প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত, তাকে বিপদের মুখে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তো দরিদ্র,নগণ্য বান্দার মতো। শীঘ্রই তার মৃত্যু আসন্ন এবং তার সামনে কাজের যে সুযোগ ছিলো, তা শেষ হয়ে যেতে

চলেছে। তাই তাকে চেষ্টা করতে হবে, সে যেনো আল্লাহর দল এবং তার বন্ধুদের কাতারে শামিল হতে পারে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (সূরা আত তাওবা: ১১৯)

****

পূর্বকথা

সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অন্যের দ্বারা শিক্ষা লাভ করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته وعلينا أجمعين. وبعد

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের রব! সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, তাঁর সাহাবীদের উপর, তাঁর উম্মতের উপর এবং আমাদের সকলের উপর! !

হামদ ও সালাতের পর

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ [১]

দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত- দ্বীন ইসলাম ও আল্লাহর প্রতি ঈমান। মানুষের উপর আল্লাহ তাআলার একটি বড় অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকে নিজের পরিচয় দান করেছেন এবং বিধি-বিধান দিয়ে তাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন। যেহেতু সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার দ্বীন, তাই এই দুনিয়াতে যে এই দ্বীন ইসলামের একটি মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। আর মানবসভ্যতা জাগতিক এই বাস্তবতার সাক্ষী যে, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তারাই হয়, যাদের রয়েছে শক্তি। আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লৌহ অবতীর্ণ করেছেন—

﴿وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ﴾[২]

এতদুদ্দেশ্যে তিনি জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ করেছেন—

---

[১] অর্থঃ আর আল্লাহ তাআলা হক ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান নিজ কালিমা দ্বারা। [সূরা আল আনফাল: ০৯]

[২] অর্থ: আর আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি [সূরা আল হাদীদ: ২৫]

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾[৩]

আজ কাফির বিশ্বের শক্তিমত্তা ও হম্বিতম্বি দেখে অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, হায়! যদি এসব শক্তির মুকাবেলায় ইসলাম বিজয়ী হতো এবং বিশ্বের নেতৃত্বে মুসলমানরা চলে আসতো! কিন্তু এই শক্তি ও বিজয়েরপথ তথা জিহাদকে তারা চিনতে পারেনি। নিঃসন্দেহে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে এবং ইসলামকে তারা গোটা বিশ্বে বিজয়ী রূপে দেখতে আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু লড়াই ও সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কেবল দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা তারা অন্তরে পুষে রেখেছে। কারণ হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধবিগ্রহে রক্তপাত, নির্বাসন ও বঞ্চনা দেখা যায়। অন্যদিকে কাফিররাও সন্ত্রাসবাদের অপবাদ লাগিয়ে লড়াই-জিহাদকে অমানবিকতা, নৃশংসতা ও পাশবিকতার উদাহরণ হিসেবে দেখানোর জন্য পুরোপুরি চেষ্টারত। তারা মুজাহিদদের প্রয়াস তথা শরীয়তী জীবনযাপন ও কার্যবিধিকে দুনিয়ার জন্য অনুপযোগী ও অনুপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত।

এই বিভ্রান্তি বিদূরিত করা একান্ত জরুরী। মুসলমানরা যদি দ্বীন ইসলামকে মর্যাদার আসনে দেখতে চায়, তবে তাদের উচিত কিতাল ও জিহাদকে গুরুত্ব দেয়া। এছাড়া আর কোনো পথ নেই। এর বিকল্প যদি সম্ভবপর হতো, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ করাতেন না আর নবীজিও আঘাতপ্রাপ্ত হতেন না। রাসূল(সা)-এর দাঁত মুবারক শহীদ হতো না। নির্বাসিত ও বাস্তুহারা তথা হিযরত করে মুহাজির হয়ে থাকতে হতো না। নিকটাত্মীয় ও কাছের লোকদের বিচ্ছেদ সহ্য করতে হতো না। এসব কেন হয়েছে? এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা জানতেন, আল্লাহ তাআলার পরিচয় এবং ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব শুধু দাওয়াত ও বয়ানের দ্বারা মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে না। কিছুলোক তো অবশ্যই এই দ্বীনি দাওয়াতের প্রাণশক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সহজেই দাওয়াত কবুল করে নেবে; কিন্তু মানবসমাজের বড় অংশ এই দাওয়াতের মুকাবেলায় বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করবে। ইসলাম তখনই শক্তিমত্তা ও শৌর্যবীর্য নিয়ে আবির্ভূত হবে।

---

[৩] অর্থ: তোমাদের উপর সশস্ত্র লড়াই ফরয করা হয়েছে [সূরা আল বাকারা: ২১৬]

যখন কিতাল ও লড়াইয়ের দ্বারা এ দাওয়াত সজ্জিত হবে, যখন মুসলমানরা সর্বদিক থেকে এ কাজের প্রতি মনোযোগ দেবে, তখন ইসলাম সহজেই সকলের হৃদয়ে স্থান লাভ করবে।

আমরা তথা মুসলমানদের এ বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়া উচিত। কারণ এ-ই আমাদের দ্বীনের শিক্ষা। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস আমাদেরকে এ-ই শিক্ষা দেয়। এবিষয়ে এখানে দলীল-প্রমাণে যাবো না। আসলে এটি এতই সুস্পষ্ট বিষয় যে, কুরআন মাজীদের পাঠকারী মাত্রই, মুবারক হাদীসে নববী পাঠকারী যেকোনো তালিবে ইলম এবং দ্বীনি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এমন যেকোনো মুসলমান কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং নিজীয় চিন্তার ভিত্তিতে খুব সহজেই একথা বুঝতে পারে। এটি সহজে বোধগম্য একটি বিষয়।

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ[৪]

এখন যেহেতু বর্তমানে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে জিহাদের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে; তাই এ পর্যায়ে অল্প কিছু মুসলমান এমন রয়েছেন যারা নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে জিহাদের ময়দান অভিমুখে যাত্রা করছেন এবং আমেরিকার মতো বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর মুকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। অতঃপর অল্পসংখ্যক এই মুসলমানদের দ্বারা যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, আর সেসব ভুলের কারণে যদি কখনও কিছু ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করতে হয়, তবে তো অভিযোগকারীদের জন্য আরও বড় সুযোগ তৈরি হয়ে যায়, যার দ্বারা তারা জিহাদ ও কিতালের উপরেই এ অভিযোগ নিয়ে আসে যে, এই পথে তো সাফল্য আসতে পারে না। আর যেহেতু এই পথে সাফল্য আসতে পারে না, তাই আমাদেরকে স্ট্যাটাস ক্যু (বর্তমান পরাজিত বাস্তবতা)মেনে নিয়েই থাকতে হবে। কাফির শক্তিগুলোকেই বিশ্বের নেতৃত্বে ছেড়ে দিতে হবে। তাদের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থার অধীনে থেকেই নিজেদের দ্বীনের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, ততটুকুই কাজে লাগাতে হবে। তার চেয়ে বেশি কিছু করার প্রয়োজন নেই(!)অথচ তারা এটা চিন্তা করে না যে, জিহাদের ব্যর্থতা আর কুফরি শাসনব্যবস্থার মাঝে কি কোনো তুলনা হতে পারে? কোনোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর

[৪] অর্থঃ আর ফিতনা হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা জঘন্যতম [সূরা আল বাকারা: ২১৭]

কোনোটা তুলনামূলক কম গুরুত্বের? কোন্ কাজে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনা আর কোন্ কাজে ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ?

যদি জিহাদের পথে মুসলমানদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়, অথবা যদি কখনও তারা ব্যর্থতার গ্লানি মেনে নিতে বাধ্য হয়, তখন তো আমাদের উচিত কিংবা করণীয় হলো, জিহাদকে আরও নিখুঁত, ত্রুটিহীন ও মজবুত করার চেষ্টা করা। যে ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তা যেন আর না হয়, সে-ই ব্যবস্থা করা। অতঃপর আরও অধিক শক্তি নিয়ে এই ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া, যাতে এই জিহাদ দ্বারা ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা যায় এবং মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তা না করে গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরাটা তো আর সমাধান নয়। তাই এ বিষয়ে কাফিরদের প্রোপাগান্ডায় বিচলিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং মুসলমানদের দায়িত্ব হলো-জিহাদকে পুরোপুরি নতুনভাবে আরম্ভ করা, মুজাহিদদেরকে পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। আর মুজাহিদদের দায়িত্ব হলো-আত্মসমালোচনা অথবা আত্মমূল্যায়ন করে নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা। এটি সেই নসীহত যা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে—

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

অর্থঃ “সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে কিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাঁধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভবপর হয়। তোমাদের মধ্যে

যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।" (সূরা আল বাকারা: ২১৭)

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ[৫]

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, জিহাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, মুজাহিদদের দ্বারা যদি কোনো ভুল সংঘটিত হয়, তারা যদি কখনও ব্যর্থতার গ্লানি মেনে নিতে বাধ্য হয়, তখন উচিত হলো-তাৎক্ষণিক ভুলগুলোর সংশোধনের জন্য আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হওয়া। ব্যর্থতার কারণগুলো চিন্তা-ভাবনা করে খুঁজে বের করা এবং সেগুলো দূর করা। প্রস্তুতিতে অসম্পূর্ণতা থাকলে তা সম্পূর্ণ করা। আর মুসলমানদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি ও হতাশার যতো পথ রয়েছে সব বন্ধ করা। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের দ্বারা ত্রুটি হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সতর্ক করে ইরশাদ করেন—

حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থ: "এমনকি তোমাদের পা টলে যায় এবং তোমরা একটি বিষয় পরস্পরে মতপার্থক্যের মাঝে লিপ্ত হও, যখন তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় দেখে নিয়েছিলে আর তখন তোমরা আনুগত্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا

অর্থ: "তাদেরকে শয়তান তাদের কিছু ভুলের কারণে পা-পিছলে দিয়েছে। " (সূরা আলে ইমরান: ১৫৫)

অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনান এবং তাদের নিরাশা দূর করেছেন—

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ

---

[৫] অর্থঃ অতএব আপনি তাদের কাছে এসব ঘটনা বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়। (সূরা আল আরাফ: ১৭৬)

অর্থ: “আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনেক অনুগ্রহশীল।” (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

অর্থ: “আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাকারী ও সহনশীল।” (সূরা আলে ইমরান: ১৫৫)

পাশাপাশি তিনি এই নির্দেশনা দান করেছেন যে, মুসলমানদের চরিত্রগুণ হলো, যখন তাদের দ্বারা কোনো ভুল সংঘটিত হয়ে যায়, তখন তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, ইস্তেগফার করে, সেই ভুল নিয়ে বসে থাকে না;বরং তা থেকে ফিরে আসে—

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰي مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ“আর তারা তো ঐ সমস্ত লোক যদি তারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে বসে অথবা অন্য কোনোভাবে নিজেদের নফসের উপর জুলুম করে বসে, তবে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পরিণতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছেন যে গুনাহ মাফ করে দেবেন? ! আর ওইসব লোক জেনে-বুঝে নিজেদের ভুল কাজের পুনরাবৃত্তি করে না।”(সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

এই পুরো কাজের জন্য জরুরী এই যে, উম্মাহর মুজাহিদীনরা অতীতের ইতিহাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হবে। সৌভাগ্যবান তো ঐ ব্যক্তি যে অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করে। কেউ যদি তা করতে না পারে, তবে কমপক্ষে নিজের অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তো সে উপকৃত হতেই পারে। আর কেউ যদি তা করতে না পারে, তবে আল্লাহ তাআলা তার অনিষ্ট থেকে তাকে এবং পুরা উম্মাহকে হিফাযত করেন —আমরা এই কামনাই করি।

আলজেরিয়ার জিহাদী অভিজ্ঞতা সকল মুজাহিদের জন্য এক বড় উপদেশ

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্ভার অধ্যয়নের সবচেয়ে বড় উপকার এই যে, এতে নিজের এবং বিগত লোকদের দ্বারা অর্জিত শিক্ষা লাভ করা যায়। যেহেতু সকল বিষয়ে নিজীয় অভিজ্ঞতা থাকে না, তাই সর্ববিষয়ে নিজের দ্বারা উপকৃত হওয়াও যায় না;বরং পূর্বের কিংবা অন্যলোকদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে হয়। ভাল বিষয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় এবং মন্দ বিষয়ে তাদের পথ এড়িয়ে চলতে হয়। পূর্ববর্তীদের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থাদি তুলনা করতে হয়, অতঃপর তার আলোকে নিজের কৌশল ও পন্থা অবলম্বনে সাফল্যের আত্মিক-মনোজাগতিক ও বৈষয়িক-জাগতিক যতোগুলো উপকরণ রয়েছে, সবগুলো একত্রিত করতে হয়।

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দামা গ্রন্থে লিখেন:

اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا-[৬]

“জেনে রাখুন যে, ইতিহাসের জ্ঞান অনেক দামি, বড় উপকারী এবং এটিই উদ্দেশ্য-সন্নিবিষ্ট একটি শাস্ত্র। কারণ এই শাস্ত্র আমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর চরিত্র, নবীদের জীবনী, রাজা-বাদশাদের রাজত্ব ও রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। তাই কেউ যদি জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতি করতে চায় সে যেনো ভালো বিষয়ে পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। ”

অতঃপর আল্লামা ইবনে খালদুন ইতিহাসের দু’টি দিক উল্লেখ করেন-

১. জাহিরী রূপ কিংবা প্রকাশ্যরূপ।

২. বাতেনি রূপ কিংবা অপ্রকাশ্য রূপ।

---

[৬] মুকাদ্দামাতু ইবনি খালদূন, পৃষ্ঠা: ৯২, তাহক্বীক্ব: আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আদ্দারবীস, প্রকাশনায়: دار يعرب দামেস্ক।

[إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول[৭]]

জাহিরী রূপটা মূলত অতীতের রাজা-বাদশা, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের কাল্পনিক ও গল্পাশ্রিত বিবরণী। এতে অতীতের রাজা-বাদশার স্তুতি ও বিপক্ষ দলের কুৎসা রটনা, রাজাদের বংশ-পরম্পরা, সংখ্যা ও সালের আধিক্য থাকে। এতে কোনো ঘটনার পেছনে তার সম্ভাব্য সামাজিক, ভৌগোলিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণগুলোর উল্লেখ থাকে না।

অন্যদিকে বাতিনী রূপ হলো ইতিহাসের অন্তর্নিহিত দিক।

[وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق] -[৮]

ইবনে খালদুন ইতিহাসের বাতিনী রূপকে জাহিরী রূপ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত মনে করেন। এইধারা আমাদের সামনে অতীত ঘটনাবলীর কারণ, বিকাশ ও বিনাশের স্বরূপ উন্মোচন করে। এর মূল কাজ হলো কোনো ঘটনা কিংবা বিষয়কে 'কীভাবে' ও 'কেন' দ্বারা প্রশ্ন করে তার মূলকে জানা।

এক্ষেত্রে শুধু ঘটনাবলী শোনা বা পড়া যথেষ্ট নয়। যদি না বিশ্লেষণ করে তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা হয়।

শহীদ সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ লিখেছেনঃ

التاريخ ليس هو الحوادث، إنما هو تفسير الحوادث، واهتداء إلى روابط الظاهرة والخفية بين شتاتها، وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئيات، ولكي يفهم الإنسان الحادثة ويفسرها، ويربطها بما قبلها وما تلاها-[৯]

[৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৮১
[৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৮১
[৯] ফিত্তারীখ ফিকরাহ ওয়া মিনহাজ, পৃষ্ঠা: ৩৭, প্রকাশনায়: দারুশ শুরুক, কায়রো।

“নিছক ঘটনাবলীর নাম ইতিহাস নয়। ইতিহাস তো হলো ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা। ইতিহাস হলো ঘটনাবলীর বিভিন্ন অংশের মাঝে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সেই সম্পর্ক ও কার্যকারণ অধ্যয়নের নাম, যার মাধ্যমে সেসব ঘটনা একটি এককের মাঝে সন্নিবেশিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তবে প্রতিবারের ঘটনার মাঝে পারস্পরিক একটি গভীর সংশ্লেষ বিদ্যমান থাকে। এতে করে ইতিহাসের পাঠক ঘটনার প্রকৃতি বুঝতে পারে, ঘটনাচক্রের প্রতিটি শাখা ও অঙ্গের ব্যবচ্ছেদ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে পূর্বের ও পরের ঘটনার সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে। ”

অর্থাৎ ঘটনাবলীর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা, ঘটনার প্রকৃতি উদ্ঘাটন ও কার্যকারণ অনুধাবনের মাধ্যমে ঘটনার ঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাই ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য। এই যে চিন্তা-ভাবনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, এগুলোরই প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘটনা উল্লেখের পর তাঁর বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরশাদ করেছেন:

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থঃ “নিঃসন্দেহে এসব ঘটনার মাঝে বোদ্ধামহলের জন্য বড় শিক্ষার উপকরণ রয়েছে।” **[সূরা ইউসুফ: ১১১]**

এসব থেকে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, মানব জীবনে ইতিহাসের কতোটা গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ময়দানে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মহৎ প্রচেষ্টায় ইতিহাসের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই যুগে যারা পুরো দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন, তাদের উপর বিরাট এ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে যে, তারা প্রাচীন ও নিকট অতীতের ইতিহাস দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হওয়াকে জরুরী বিষয় জ্ঞান করবে। সমসাময়িক এই যুগে জিহাদী আন্দোলনগুলোর এমন অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেগুলো ভবিষ্যতে ঠিক পথ ও পন্থা নির্ধারণে মৌলিক অবদান রাখার দাবিদার।

এসব অভিজ্ঞতা খুব গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত। সেসব অভিজ্ঞতার মাঝে একটি বিরাট অভিজ্ঞতা হলো, বিংশ শতাব্দের শেষ দশকে আলজেরিয়ার জিহাদী

অভিজ্ঞতা। যদিও সে অভিজ্ঞতা ছিলো নিতান্তই বেদনাদায়ক, যদিও তা ছিলো ব্যর্থতার গ্লানিমাখা অভিজ্ঞতা;বরং তার চেয়েও দুঃখের ব্যাপার হলো, তা ছিলো একটি জিহাদী আন্দোলন ফিতনাকারী আন্দোলনে পরিবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তবুও বেদনাদায়ক এই অভিজ্ঞতা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের বহুবিধ উপকরণে ভরপুর। এই ইতিহাস পাঠ করা এ কারণেও জরুরী, যেসব ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলনে বিদ্যমান ছিলো, অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলনগুলোতে শুরু থেকেই যেনো সেসবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাতে লিপ্ত না হই। আর শুরু থেকেই যেনো এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যার দরুন সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কোনো সুযোগই যেনো না থাকে এবং ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রগুলোতে কেউ-ই যেনো অসতর্ক না হয়।

পূর্বকথা শিরোনামে এতটুকু আলোচনাই অনেক। পাঠকবৃন্দ আর কিতাবের মাঝে আমরা আর সময়ের দূরত্ব বাড়াতে চাই না। এই কিতাবে আলজেরিয়ার জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা রয়েছে। এখানে সেসব লোকের সাক্ষ্য বাণী এসেছে, যারা নিজেরা এই জিহাদের অংশগ্রহণ করেছিলেন। এসব অভিজ্ঞতা এমন একজন ব্যক্তি সংকলন করেছেন, যিনি একযুগ যাবত শুধু জিহাদী আন্দোলনের পথিকই ছিলেন না, বরং তার পূর্বেও একযুগ যাবত ইসলামী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবেও ছিলেন ব্যতিব্যস্ত। যিনি প্রতীচ্যকে (পশ্চিমা জগতকে) যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই দেখেছেন প্রাচ্যকে। যদিও সংকলক মহোদয় বাহ্যত নিজীয় বক্তব্য ও মন্তব্য এখানে সংকলন করেননি অথবা যদি করেও থাকেন সেটাও খুবই কম, কিন্তু তবুও ছত্রে ছত্রে পাঠকবৃন্দের অনেক কিছুরই দেখা মিলবে এবং সংকলক মহোদয় থেকে তারা অনেক বেশি উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এই প্রয়াসের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ তাঁর জন্য বরাদ্দ করে দিন! আমীন!! আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরও তৌফিক দান করেন, যেনো তিনি মুজাহিদীন এবং সাধারণ মুমিন-মুসলমানদের জন্য এধরনের আরও অনেক শিক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে অতি উত্তম বিনিময় দান করুন!!

আমরা পরিশেষে শুধু এতটুকু বলে নিজেদের বক্তব্যের ইতি টানতে চাচ্ছি যে, এই অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়ঃ

১. জিহাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কোনো স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত?

২. মুজাহিদীনের সাধারণ তরবিয়ত ও দীক্ষা কেমন হওয়া উচিত?

৩. মুসলমানদের মাঝে বিশেষত মুজাহিদীনের মাঝে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ঠিক বুঝ থাকার গুরুত্ব কতোটুকু? আর তা না থাকার ভয়াবহতা কতোটুকু?

৪. জিহাদী আন্দোলনের শত্রু-মিত্র নির্ধারণের মাপকাঠি কি হওয়া উচিত?

৫. ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদী আন্দোলনের আচরণবিধি কিরূপ হওয়া উচিত? আর যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি স্তর ও পর্যায় থাকা উচিত?

৬. মুসলিম জনসাধারণ, উলামায়ে কিরাম, দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী জামাআতগুলোর সঙ্গে জিহাদী আন্দোলনের আচরণবিধি কিরূপ হওয়া চাই?

উপরের বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে যদি কিতাবটি পাঠ করা হয়, তবেই এই অভিজ্ঞতা-সম্ভার দ্বারা উপকৃত হওয়া অনেক সহজ হবে।

এই কিতাবে তো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্যর্থতার গ্লানি মাখা এক একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। আমরা আশাবাদী এবং ভালোবাসার তরে এই দাবি রাখছি, জিহাদী আন্দোলনের শতভাগ সাফল্যের অভিজ্ঞতাগুলো কোনো মুজাহিদ লেখক মুসলমানদের সামনে কিতাব আকারে পেশ করবেন। কারণ সেগুলো অত্যন্ত মূল্যবান আর দুর্লভ। এসব অভিজ্ঞতা একুশ শতকের প্রথম দুই দশককে ঘিরে। আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীন আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে গোটা উম্মাহর সামনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নিঃসন্দেহে এটি সকল মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি মতো আমলের তৌফিক দান করুন এবং দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ আমাদের জন্য নিশ্চিত করুন।

আল্লাহ তাআলা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে সম্মানিত করুন! আমেরিকা-ইসরাইল এবং অন্যান্য কুফরী শক্তিগুলোকে ব্যর্থ ও ধ্বংস করুন!

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদেরকে সাহায্য ও নুসরাত দান করুন এবং তাদেরকে নিজের শত্রুদের মুকাবেলায় সাফল্য দান করুন!

আল্লাহ তাআলা ইমারাতে ইসলামিয়াকে সুসংহত ও শক্তিশালী করুন! একে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্র হিসেবে কবুল করুন! আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالىٰ على نبينا وحبيبا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وعلينا أجمعين، آمين۔

ইদারায়ে হিত্তিন

রজব, ১৪৪২ হিজরী

ভূমিকা

যে জন্য কলম হাতে নেয়া...

আসলে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য যদি এক বাক্যে বলতে হয় তবে তা হলো, বর্তমান যুগে জিহাদী আন্দোলনের হিফাযত এবং মুজাহিদীনকে শরীয়াহ ও রাজনীতিক ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করা।

সংকলনের জন্য আলজেরিয়ার জিহাদী অভিজ্ঞতাকে এ কারণে নির্বাচন করা হয়েছে যে,

১- এতে মুজাহিদদের শরীয়াহ ও রাজনীতিক ভুল-ত্রুটির কারণে জিহাদ তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হওয়াটা একেবারে সুস্পষ্ট। যাতে মুজাহিদীনরা এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জিহাদী আন্দোলনকে এসব ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করতে পারেন।

২- এই গ্রন্থ হলো, এক জিহাদী আন্দোলনের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত দাস্তান, যেখানে আবির্ভাবের আলোচনা এসেছে আবার পতনের কাহিনীও আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে উত্থান-পতনের কারণগুলোর উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

৩- সমকালীন জিহাদের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। মুজাহিদীনরা নিজীয় অবস্থার সঙ্গে এই গ্রন্থের বিবরণের অনেক বেশি মিল পাবেন, আর সমকালীন জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

৪-আলজেরিয়ার জিহাদী অভিজ্ঞতার অংশীদার আল-কায়েদার উচ্চপদস্থ আমীর শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, আলজেরিয়ার মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম হাফিযাহুল্লাহ এবং শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহর সাক্ষ্যবাণী থেকে ইতিহাসের উপর একটি বিশদ ফাইল আমার হস্তগত হয়। তাদের সমসাময়িক ও সতীর্থ অন্য কারও কাছ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা তেমন কিছু পাইনি।

আমার আকাঙ্ক্ষা, যদি সমকালীন কাবায়েলী (ওয়াজিরিস্তান) জিহাদের উপরে কেউ কলম ধরতেন! ! এ বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে যে অপরিচিতি রয়েছে, আর শত্রুদের পক্ষ থেকে যতো সংশয়-সন্দেহ ও নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা রয়েছে, কেউ

যদি সেসবের পর্দা ছিন্ন করে গৌরবের এই দাস্তান মুসলমানদের সামনে এনে রাখতেন! !

তথ্যসূত্র সম্পর্কে...

এই গ্রন্থ আসলে চারটি পুস্তিকা অবলম্বনে সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত একত্র রূপ।

১) আলজেরিয়ার মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম হাফিযাহুল্লাহ'[১০]র আলজেরিয়ার জিহাদ সংক্রান্ত একটি ইন্টারভিউ[১১]। এই কিতাবের অধিকাংশ তথ্য সে-ই ইন্টারভিউ থেকে সংগৃহীত।

২) আলজেরিয়ার মুজাহিদ আলিম শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ'[১২]র আলজেরিয়ার জিহাদ সম্পর্কে সাক্ষ্য[১৩] বাণী। তাঁর জবানি থেকে সংগৃহীত প্রায়

---

[১০] মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম পূর্ব আলজেরিয়ার আলআওরাস এলাকা থেকে। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে আফগানিস্তানের জিহাদে তাঁর পদার্পণ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালে তিনি পেশোয়ারে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান মাক্তাব আল-খিদমাহ'র অধীনে পরিচালিত মুআসকারে বারী সামরিক শিবিরের আমীর শাইখ আবু তুর্কিয়াহ আল-লিবি রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কাছে দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে আফগানিস্তান থেকে তিনি সুদান অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ'র মেহমানখানায় মুকীম ছিলেন। ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে আলজেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত দেশ নাইজারের সাহারায় (মরু অঞ্চলে) প্রবেশ করেন। সেখানে ব্রাদার খালিদ আবুল আব্বাস এবং তাঁর সঙ্গীগণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁদের সঙ্গেই সেই একই বছর তিনি আলজেরিয়ার নবম অঞ্চলে প্রবেশ করেন। ব্রাদার খালিদ আবুল আব্বাসের আলোচনা সামনে আসবে। ১৯৯৬ সালের শুরুর দিকে আল-জামআত আল-ইসলামিয়া আল-মুসাল্লাহাহ (সশস্ত্র ইসলামী জামাআত)'র নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছার সাফল্য অর্জন করেন। ঐ এলাকায় দেড়মাস অতিবাহিত করার পর দ্বিতীয়বারের মতো তিনি নবম এলাকা অভিমুখে রওনা হন। সে সময় তিনি নবম এলাকা এবং নাইজারের সাহারায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। ২০০০ সালের শুরুর দিকে আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ২০০১ সালের শেষের দিকে আলজেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত আরও একটি দেশ মালির সাহারা-অভিমুখে তিনি যাত্রা করেন। ২০০২ সালের শেষের দিকে পুনরায় তিনি আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন।

[১১] এই ইন্টারভিউ ইদারায়ে আফরিক্বিয়া আল-মুসলিমা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানটি 'হিওয়ার মা'আ আবি আকরাম হিশাম: হাক্বায়েক্ব ওয়া শুবুহাত আনিল জিহাদ ফিল জাযায়ের' নামে ৮ই শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী মুতাবেক ১৩ই জুলাই ২০১৬ সালে প্রকাশ করে।

[১২] শাইখ আসিম আবু হাইয়ানের আসল নাম মাদানী ইবন আব্দুল কাদের লসলুস। রবিউল আউয়াল ১৩৭০ হিজরী মুতাবেক ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে মেদিয়া প্রদেশের জেলা কসরে আল-বুখারীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেন আকনুন একাডেমি থেকে আইন ও ম্যানেজমেন্ট সাইন্সে বিএ করেন। ১৯৭২—১৯৯৩ পর্যন্ত প্রথমে রাজধানীর 'আল-হাওয়া আল-জামিল' মহল্লা এবং পরবর্তীতে 'বি'রুলখাদেম' মহল্লার মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে নিয়োজিত

সমস্ত তথ্য তার দিকে সম্বন্ধিত করেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং পরিচ্ছেদ বিন্যাসের খাতিরে কোথাও ব্যতিক্রম ঘটেছে।

৩) লিবিয়ান মুজাহিদ আলিম এবং আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় রাহবার শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর আলজেরিয়া বিষয়ক রচনাবলী। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

*মুনতাদা আল হিসবাহ ইন্টারনেট ডিসকাশন ফোরামকে দেয়া শাইখের বিভিন্ন জবাব। [১৪]

*তাঁর রচনাসমগ্র ‘আল আ'মালুল কামেলা’[১৫]

ছিলেন। ফ্রান্সের দালাল জেনারেলরা যখন ধরপাকড় আরম্ভ করে, তখন তিনিও গ্রেফতারীর শিকার হন। মুক্তি লাভের পর ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে মেদিয়া প্রদেশের জাবালুল লাওহ GIA-এর মুজাহিদদের সঙ্গে শামিল হয়ে যান। ১৯৯৪—১৯৯৫ সাল পর্যন্ত একটি খণ্ডদলের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৯৬—১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আল-মেদিয়া প্রদেশের জাবালুল লাওহ-এ আলকাতিবাতুর রব্বানিয়া'র (বাহিনী) কমান্ডার ছিলেন। ‘GIA-এর’ থেকে বের হবার পর ১৯৯৮—২০০৪ পর্যন্ত তিনি ‘আল জামাআত আসসানিয়াহ্ লিদ দাওয়াত ওয়াল জিহাদ’-এর আমীর আবূ সুমামা আব্দুল কাদের সাওয়ানের নায়িব (সহকারী) ছিলেন। অতঃপর ‘আল-জামাআত আসসালাফিয়া লিদ দাওয়াত ওয়াল কিতাল’-এ শরীক হয়ে ২০০৪—২০০৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের আমীর ছিলেন। তানযীম আল-কায়েদা বিলাদুল মাগরিব শাখা গঠনের পর সংগঠনের শরীয়াহ বিভাগ আল-হাইয়াতুশ শারঈয়্যাহ'র রুকন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০১০ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি তানযীমের কাজী পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

[১৩] এই ইন্টারভিউ ‘ইদারায়ে আফরিক্বিয়া আল-মুসলিমাহ’ প্রতিষ্ঠানটি ‘হিওয়ার মাআশ শাইখ আসিম আবি হাইয়ান (কাজী: তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি বিলাদিল মাগরিব): মাহাত্তাত মিন তারিখিল জিহাদ ফিল জাযায়ের (আলজেরিয়ার জিহাদী ইতিহাসের কয়েকটি মঞ্জিল)’ নামে জিলহজ্জ ১৪৩৭ হিজরী মুতাবেক সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে প্রকাশ করে।

[১৪] আল-হিসবা ফোরামের সঙ্গে শাইখ আতিয়াতুল্লাহ'র সাক্ষাতকার, দারুল জাবহাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী, আল-জাবহাতুল ইলামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-আলামিয়্যা, জুমাদাল ঊলা ১৪২৮ হিজরী।

[১৫] মাজমুউল আমালিল কামেলা (রচনাসমগ্র), শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী, আবি আব্দির রহমান জামাল ইবরাহীম ইশতিবী আল-মিসরাতী, সংকলন ও বিন্যাস: যুবায়ের আল-গাযী, আল-মাকতাবাতুল জিহাদিয়্যা, দারুল মুজাহিদীন লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী, প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৬ হিজরী মুতাবেক ২০১৫ সাল। তাতে বেশ কটা রচনা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ‘আত-তাজরিবাতুল জাযায়েরিয়্যাহ’, যা অডিও রেকর্ড থেকে অনুলিপিকৃত। এটি রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ হিজরীতে ‘আত-তাহায়া’ মিডিয়া ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে।

*মুরতাদদের স্ত্রী ও সন্তানাদির ব্যাপারে আলজেরিয়ার মুজাহিদীন এবং শাইখ আবু কাতাদার একটি ফতোয়ার জবাব, যা একটি ফোরামে গবেষণা আকারে এসেছে। [১৬]

৪) সিরিয়ার প্রবীণ মুজাহিদ ও চিন্তাবিদ শাইখ আবু মুসআব সূরীর (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন!) আলজেরিয়ার জিহাদ সম্পর্কিত সাক্ষ্য[১৭] বাণী। বিশেষ করে যে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে তা হলো, আলজেরিয়ার বাইরে এই জিহাদের জন্য অব্যাহত নুসরাহ ও সহযোগিতা এবং পরবর্তীতে এ থেকে শাইখদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা। অপর তিনজন শাইখের সঙ্গে শাইখ আবু মুসআব সূরীর একটি বিষয়ে মৌলিকভাবে বড়ো ধরনের মতবিরোধ ছিলো, আর তা হলো—বিশৃঙ্খলার সময়ে আলজেরিয়ান ইন্টেলিজেন্সগুলোর কার্যক্রম ও যোগাযোগ। আমি অপর তিন শাইখের সাক্ষ্য বাণীগুলো প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ তাদের সাক্ষ্যগুলো এই ব্যাপারে অধিক গ্রহণযোগ্য। যেহেতু তারা জিহাদের সময়ে আলজেরিয়াতে উপস্থিত ছিলেন, অপরদিকে শাইখ আবু মুসআব উপস্থিত ছিলেন না।

কিছু কিছু ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যদি কখনও আরোও অধিক তথ্যের প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে আমি উইকিপিডিয়ার সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু সেই তথ্যের কারণে আলোচনার মূলধারা ক্ষুণ্ণ হয়নি। উপমহাদেশের জনসাধারণ ও মুজাহিদদের কথা চিন্তা করে যেখানে সমীচীন মনে করেছি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় যোগ করে দিয়েছি। সেগুলোর কারণেও মূল বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

চাক্ষুষ সাক্ষ্য

মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম হাফিযাহুল্লাহ এবং শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহর ইন্টারভিউকে শাইখ আবু মুসআব সূরীর আবেদন ও ইচ্ছা অভিব্যক্তির ফলাফল বলা যেতে পারে। যদিও তিনি নিজে আলজেরিয়ার জিহাদের

---

[১৬] ‘মুরতাদ সৈন্যদের স্ত্রীদের হুকুম, রচনায় শাইখ আতিয়াতুল্লাহ’ নামে একটি ডিসকাশন ফোরামে আলাপচারিতা সংবলিত একটি দস্তাবেজ। দস্তাবেজটি শাইখ আযযাম আমরিকী (আদম ইয়াহইয়া গাদান) রহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে অন্যান্য মুজাহিদদেরকে উপকারিতা বিবেচনায় পাঠানো হয়েছিলো। দস্তাবেজে সন হিসেবে ২০০৫ -এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

[১৭] ‘আল্কাযায়া আয্যাহিরিনা আলাল হাক্কী সিরিজ-৬— মুখতাসারু শাহাদাতি আলাল জিহাদ ফিল জাযায়ের (১৯৮৮—১৯৯৬ সাল), লিখেছেনঃ আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী বান্দা উমর আব্দুল হাকিম (আবূ মুসআব আসসূরী) [জুন ২০০৪ সাল]

ব্যাপারে কলম ধরেছেন, কিন্তু তিনি সশরীরে আলজেরিয়াতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিলো আলজেরিয়ার জিহাদ নিয়ে এই অঞ্চলের ভিতরগত অবস্থা কাছ থেকে পর্যবেক্ষণকারীদের কেউ কলম হাতে নেবেন।

শাইখ আবু মুসআব সূরী লিখেছেনঃ

"আমি বুঝতে পারছি, আলজেরিয়ার জিহাদী অভিজ্ঞতা বিশ শতকের শেষার্ধের জিহাদী অভিজ্ঞতাগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এমনিভাবে সমকালীন ইসলামী জাগরণের যে ঘটনা প্রবাহ, সেগুলোর মাঝেও এই অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাস শিক্ষা উপদেশ ও ছবক গ্রহণের বহুবিধ উপকরণে ভরপুর। আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে যারা স্বয়ং এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ঘটনাপ্রবাহ কাছ থেকে দেখেছেন, কাউকে যদি এমন যোগ্যতা সততা ও নিষ্ঠা দান করতেন, আর তাদেরকে যদি দলান্ধতা ও অনুচিত দলপ্রীতি থেকে মুক্ত রাখতেন, যার দরুন তারা সেসব অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটনার ধারাপাত নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতেন! এতে সমকালীন জিহাদী লিটারেচারে নিজেদের তথ্য-উপাত্ত এবং উপকার বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দস্তাবেজ সংযোজনের মধ্য দিয়ে ইসলামী জাগরণের সাহিত্য সম্ভার ও গ্রন্থাগার আরও সমৃদ্ধ হতো। এই সমৃদ্ধির উপকারী প্রভাব আলজেরিয়ার সীমানা অতিক্রম করতো এবং আগামীতে উম্মাহর অনাগত প্রজন্মের জন্য বিরাট কল্যাণ ভাণ্ডার হিসেবে প্রমাণিত হতো। "

আলজেরিয়াতে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর কার্যক্রম ও সক্রিয়তা

হিসবা ফোরামের ইন্টারভিউতে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"আমি প্রাণ হাতে আলজেরিয়া থেকে বের হয়ে এসেছি। আমার স্মরণশক্তিতে যেটুকু ধরেছে তার বাইরে অন্য কোনো কিছুই লেখার মতো অবস্থা আমার ছিলো না। অতঃপর আমি আমার স্মৃতি থেকে আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ে ৩০০পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। কিন্তু আফগানিস্তানে ক্রুসেড হামলার সময় তা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়। এখন তা পাওয়ার সম্ভাবনা এতটুকু রয়েছে যে আমেরিকা খোদ তা প্রকাশ করবে(!) কারণ ওই পাণ্ডুলিপির একটি কপি পাকিস্থানে আমাদের এক ভাইয়ের ঘরে ছিলো। শত্রুপক্ষ তা ছাপিয়ে নিয়েছিলো। "

আলজেরিয়াতে নিজেদের জিহাদী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর একটি অডিও বক্তব্য রেকর্ড হয়েছে। সেখানে তিনি স্বচক্ষে দেখা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে সে বক্তব্য 'আত্তাজরিবাহ আল জাযায়েরিয়্যাহ' নামে তাঁর যেই রচনাসমগ্র রয়েছে, তাতে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়াও তিনি সাংগঠনিক লিখিত বিবৃতি এবং আল-হিসবা ফোরামকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আলজেরিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন যা আমরা এই কিতাবে নিয়ে এসেছি।

আলজেরিয়ার পরিচয়

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগর (মেডিটেরিয়ানিয়ান সি), যা একে ইউরোপ মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। উত্তর আফ্রিকার সমস্ত দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেগুলো আরবদেশ বলে গণ্য। উত্তর আফ্রিকার পূর্ব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে সর্বপ্রথম মিশর, তারপর লিবিয়া তারপর আলজেরিয়া, অতঃপর মরক্কো (ইসলামী), সাহরাউই আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (República Árabe Saharaui Democrática), আর মরক্কো এবং সাহারা আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ দিকে মৌরিতানিয়ার অবস্থান। লিবিয়া এবং আলজেরিয়ার দক্ষিণে রাষ্ট্র দুটির মাঝামাঝি এবং সমুদ্রতীর সংলগ্ন আরেকটি দেশ হচ্ছে তিউনিসিয়া।

এসব রাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশগুলোও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কতক আরব এবং কতক আফ্রিকার মাঝে গণ্য। পূর্ব দিক থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে যথাক্রমে সুদান, চাঁদ, নাইজার, মালি এবং সর্বশেষে পুনরায় মৌরিতানিয়া। এদিকে নাইজারেরও দক্ষিণ দিকে নাইজেরিয়ার অবস্থান।

আলজেরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যদি বলি তবে তার উত্তর-পূর্ব দিকে তিউনিশিয়া, পূর্বদিকে লিবিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নাইজার, দক্ষিণ দিকে মালি, দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌরিতানিয়া এবং পশ্চিমে মরক্কো অবস্থিত।



জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আলজেরিয়া সবচেয়ে বড় আরব-আফ্রিকান একটি দেশ। ২০১৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩কোটি৮৭লাখ। জনসংখ্যার অধিকাংশেরই বসবাস সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী এলাকাসমূহে।

আলজেরিয়া ৯৯.৯শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ, যেখানে অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী। তবে খুবই অল্পসংখ্যক লোক ইবাযি মাযহাবের অনুসারী। সুন্নিদের মাঝেও অধিকাংশই মালিকী মতাবলম্বী। গত শতাব্দতে সালাফী আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে আলজেরিয়াতেও তার কিছু প্রভাব দৃশ্যমান। এই প্রভাবের মুকাবেলায় সরকার সুফিজম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আরব অধিবাসী ছাড়া সেখানকার আদিবাসীরা মূলত আমাজিগ ও তাওয়ারিক। আরবী ছাড়া আমাজিগ ভাষাও তথায় সরকারি মর্যাদা বহন করে। তবে আরবী ভাষার প্রভাবই প্রবল।

আলজেরিয়ার উত্তরদিকে যদি হয় ভূমধ্যসাগর তবে দক্ষিণদিকে রয়েছে সাহারা মরুভূমি, যা পৃথিবীর বৃহত্তম মরু অঞ্চল। এই মরুভূমি পূর্বদিকে লোহিতসাগর থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমদিকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণদিকে সুদান ও নাইজার সমুদ্রের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনিভাবে এই মরুভূমি সুদান, লিবিয়া, চাঁদ, নাইজার, আলজেরিয়া, মালি এবং মৌরিতানিয়াকে পরস্পর-সংযুক্ত করে রেখেছে।

প্রশাসনিকভাবে আলজেরিয়া ৪৮টি প্রদেশে বিভক্ত। সেগুলোকে আমরা পাকিস্তানের/বাংলাদেশের জেলা হিসেবে ধরতে পারি। প্রদেশগুলো নিম্নরূপ:

১.আদরার, ২.ক্লেফ প্রদেশ, ৩.লেঘাউট, ৪.ওম এল বাউগি অথবা ওউম এল-বাউগি, ৫.বাটনা, ৬.বিজায়া, ৭.বিসক্রা, ৮.বেচার, ৯.ব্লিডা, ১০.বুয়াইরিয়া, ১১.তামানরাসেট, ১২.টেবেস্সা, ১৩.ট্লেমসেন, ১৪.তিয়ারেত, ১৫.তিজি ঔজু, ১৬.আলজিয়ার্স, ১৭.জেলফা, ১৮.জিজেল, ১৯.সেতীফ, ২০.সাঈদা, ২১.স্কিকদা, ২২.সিদি বেল আব্বেস, ২৩.আন্নাবা, ২৪.গোয়েলমা, ২৫.কনস্টান্টটাইন, ২৬.মেদিয়া, ২৭.মোস্তাগানেম, ২৮.ম'সিলা, ২৯.মাস্কারা, ৩০.উয়ারগলা, ৩১.ওয়াহরান, ৩২.এল বায়াধ, ৩৩.ইলিজি, ৩৪.বর্ঝ বঊ এর্রারীজ, ৩৫.বুমারডেস, ৩৬.এল তারেফ, ৩৭.টিন্ডোফ, ৩৮.তিসেমসিল্ট, ৩৯.এল ওয়েড, ৪০.খেনচেলা, ৪১.সৌক আহরাস, ৪২.টিপাজা, ৪৩.মিলা, ৪৪.আইন ডফলা, ৪৫.নায়ামা, ৪৬.আইন টেমুচেন্ট, ৪৭.ঘরডাইয়া এবং ৪৮.রিলিজেন বা গিলিজান।



কোন অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ তথা ওই অঞ্চলের ইতিহাস আমরা এ পর্যায়ে উল্লেখ করতে যাচ্ছি না এ কারণে যে, এই ইতিহাসের বড় অংশ কিতাবের বিষয়বস্তুর ভেতর পাঠকের সামনে চলে আসবে।

আলজেরিয়ার জিহাদের ঐতিহাসিক কয়েকটি পর্যায়

জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সামনে রেখে আমরা আলজেরিয়ার জিহাদকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিঃ

১- ১৮৩০—১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদ।

২- ১৯৬৩—১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ছায়া-ঔপনিবেশিক আমলে স্থানীয় তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ। তাতে শাইখ মোস্তফা আবু ইয়ালার প্রথম জিহাদী আন্দোলন আল-হরকাতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ ছিলো প্রথম সারিতে।

৩-১৯৮৮—২০০২ সাল পর্যন্ত ইসলামী গণতান্ত্রিক মানহাজের পতনের পর জিহাদী মানহাজের আবির্ভাব। নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের জবরদস্তি জয়লাভ, তাগুত সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ী ইসলামপন্থিদেরকে বিলুপ্তপ্রায় ঘোষণা এবং ইসলামপন্থিদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের পর প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ জিহাদী আন্দোলন। সেই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় জামাআত ছিল আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহা বা GIA। এই জামাআতকে নিয়েই এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।

৪- ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি বিশুদ্ধ জিহাদী মানহাজের পুনরুত্থান। GIA-তে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়া এবং তার সমাপ্তির পর বিশুদ্ধ জিহাদী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত জিহাদী আন্দোলন। এই ধারার সর্ববৃহৎ দল আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ। পরবর্তীতে এটি আল-কায়েদার অধীনে বাইয়াতবদ্ধ হয়ে তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ ফী বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী'র রূপ পরিগ্রহ করে।

****

প্রথম অধ্যায়ঃ ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলামী খিলাফত (১৫৪৬ সাল)

উমাইয়া খিলাফত আমলেই আলজেরিয়াতে ইসলামের প্রবেশ। অতঃপর আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তির পর যখন গোটা ইসলামী বিশ্ব বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন পুনরায় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দে উসমানী খিলাফত ইসলামী বিশ্বকে এক পতাকা তলে নিয়ে আসে। এমনিভাবে ১৫৬৪সালে আলজেরিয়া খিলাফতে-উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। উসমানী খিলাফত আমলের নৌবাহিনী আলজেরিয়ার বন্দরগুলো থেকে বের হয়ে ভূমধ্যসাগরে ক্রুসেডার ইউরোপের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ইসলামী সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ ছিলো। এভাবেই আলজেরিয়া ইসলামের একটি মজবুত কেল্লা হিসেবে নিজের গৌরবোজ্জ্বল অতীত বহন করছে।

ফরাসি ঔপনিবেশিকতা (১৮৩০ সাল)

ঊনবিংশ শতাব্দে উসমানী খিলাফতের দুর্বলতা এবং পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার সয়লাবকালে আলজেরিয়াকে কব্জা করা ইউরোপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট ও লক্ষ্য হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যখন নিজেদের মধ্যে ইসলামী ভূমিগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করতে আরম্ভ করে, তখন আলজেরিয়া ফ্রান্সের ভাগে পড়ে। আর তখন১৮৩০সালে ফ্রান্স রীতিমতো আলজেরিয়া দখলে নিয়ে নেয়।

আমীর আব্দুল কাদেরের জিহাদ (১৮৩২ সাল)

আলজেরিয়াতে ফরাসিরা পা রাখতেই মসজিদ ও খানকাগুলো থেকে জিহাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। ১৮৩২সালে আলজেরিয়ার উলামায়ে কিরাম, সুফি মাশাইখ এবং গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ আলজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ঔরানে আমীর আব্দুল কাদির আল জাযায়েরী[১৮]'র হাতে জিহাদের বাইয়াত সম্পন্ন

---

[১৮] আমীর আব্দুল কাদের ইবনে মহিউদ্দিন আল-হাসানী মাগরিবী আলজেরিয়ার শহর মাস্কারা'র নিকটে ১২৩৩ হিজরী মুতাবেক ১৮০৮সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলেম, সুফি কবি এবং রাজনীতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাজনীতি ও রণাঙ্গনের তিনি নেতা ছিলেন। ১৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি জিহাদের নেতৃত্ব দান করেন। মৃত্যুবরণ করেন দামেস্কে ১৮৮৩ সালে। তাঁকে নতুন আলজেরিয়ার স্থপতি ধরা হয়।

করেন। আমীর আব্দুল কাদির জিহাদের নেতৃত্ব দান করেন এবং ১৮৩৭সালের ভেতর পশ্চিম আলজেরিয়াকে স্বাধীন করে নেন। অতঃপর ১৮৪০সালে রাজধানী আলজিয়ার্স[১৯] পর্যন্ত অবরোধ করে ফেলেন। তখন ফ্রান্স পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এবং শুধু মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি;বরং আলজেরিয়ান মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধেও তারা নির্মম ও ন্যক্কারজনক নিপীড়নের স্টিমরোলার চালায়। পরিণতিতে আমীর আবদুল কাদিরকে গ্রেপ্তার করে সিরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়। সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল ঘটে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রহম করুন, আমীন!

এভাবেই আলজেরিয়াতে জিহাদী আন্দোলন সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে যায়।

ক্রুসেডার ফ্রান্স দখল সম্পন্ন করা মাত্রই আলজেরিয়াকে ফরাসিকরণের রাজনীতি আরম্ভ করে। একদিকে আলজেরিয়াতে তারা ফরাসি আবাসনের বন্দোবস্ত করে অপরদিকে পুরোপুরিভাবে আরবী ভাষা এবং আলজেরিয়ানদের ইসলামী পরিচিতি মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে। সেসময় যদিও জিহাদী আন্দোলনের শক্তি স্তিমিত হয়ে যায়, কিন্তু জনসাধারণের মাঝে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদমূলক কয়েকটি আন্দোলন চালু ছিলো। সেসব আন্দোলনগুলোর আলোচনা এখানে নিয়ে আসা সম্ভবপর নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, উপমহাদেশের মতো আলজেরিয়াতেও জিহাদী আন্দোলন পুরোপুরিভাবে কখনোই থেমে যায়নি।

শাইখ ইবনে বাদীস এবং জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীন (১৯৩১ সাল)

আল্লাহ তাআলা আলজেরিয়াকে একজন ক্ষণজন্মা যুগ সেরা ব্যক্তিত্ব শাইখ আব্দুল হুমাইদ ইবনে বাদীসের[২০] দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি ১৯৩১সালে আলজেরিয়ার উলামায়ে কিরামের জামাআত ‘জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ঔপনিবেশিক আমলে এই জামাআতের দাওয়াত সংস্কার ও শিক্ষামূলক অবদানের

---

[১৯] আলজেরিয়ার রাজধানীর নাম আলজিয়ার্স। আরবীতে উভয়টির নাম ‘আল জাযায়ের’।

[২০] ইমাম আবদুল হুমাইদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বাদীস সানাহেজী ১৩০৭ হিজরী মুতাবেক ১৮৮৯ সালে আলজেরিয়ার শহর কনস্টান্টিনে জন্মগ্রহণ করেন। (মৃত্যুসন ১৩৫৮ হিজরী মুতাবেক ১৯৪০)। তাঁর পিতা উসমানী খিলাফত আমলে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি জামিয়া আল-জায়তৌনা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত ছাড়াও মক্কা-মদিনায় গিয়ে ইলম অর্জন করেন। তিনি আরব দেশগুলোতে ইসলামী জাগরণের আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি আলজেরিয়াতে ১৯৩১ সালে জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বদৌলতে আলজেরিয়ার ইসলামী পরিচয় ও আরব জাতীয়তা রক্ষা লাভ করে। এতে জাতি হিসেবে আলজেরিয়ানরা পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবার যোগ্যতা ও সক্ষমতা অর্জন করে।

জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাসে আমরা দেখি যে, সামরিক পরাজয় এবং ভূখণ্ড হাতছাড়া হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মাথা তুলে দাঁড়াবার সক্ষমতা কেবল এমন জাতিই অর্জন করতে পারে যারা সুদৃঢ় আকীদার অধিকারী, পোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরবচ্ছিন্ন চিরঅবধারিত জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা এবং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয় ও সুদৃঢ় সংকল্প নিজেদের মাঝে পোষণ করে। কেননা রণাঙ্গনে পরাজিত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণই হলো জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতা দূর করাই জিহাদী আন্দোলনের প্রথম স্তর। কেননা দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিগত এই অপরিহার্য পরিচয় হিফাযতের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই জিহাদী আন্দোলনের প্রথম লক্ষ্য। আলজেরিয়াতে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মূল কৃতিত্ব শাইখ ইবনে বাদীস এবং জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের।

মহান স্বাধীনতা বিপ্লব (১৯৫৪ সাল)

দ্বিতীয়বার বৃহৎ জাতীয় যুদ্ধের সূচনাকালে ফ্রান্স আলজেরিয়ার জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেয়, যদি তারা ফ্রান্সকে সুযোগ দেয়, তবে তাদেরকে যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাই দ্বিতীয়বারের মতো যুদ্ধ সমাপ্তির পর ৮ই মে ১৯৪৫সালে আলজেরিয়ার অধিবাসীরা ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে। আর তখন ফরাসি সৈন্যরা অত্যন্ত নির্মমভাবে ৪৫হাজার মুসলমানকে শহীদ করে। এই ঘটনা থেকে আলজেরিয়ানদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, শক্তি ছাড়া স্বাধীনতা কখনই অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এছাড়া সে সময়ের মধ্যে শাইখ ইবনে বাদীসের কর্মকাণ্ডের ফলে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়;যারা ১৯৫৪সালে মহাবিপ্লবের আয়োজন করে। এই বিপ্লব ১০বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯৬৩সালে আলজেরিয়া স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপরীতে আলজেরিয়ার বিপ্লব ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তা ছিলো আগাগোড়া সশস্ত্র বিপ্লব। আলজেরিয়া সকল শ্রেণির মানুষই এই আন্দোলনকে

শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবর্তে জিহাদ বলে গণ্য করে। যদিও এই বিপ্লবে কয়েকটি ধর্মহীন ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ও উপকরণ সক্রিয় ছিলো। তথাপি আজ পর্যন্ত সরকারিভাবে একে জিহাদ নামেই অভিহিত করা হয় এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদেরকে মুজাহিদীন বলা হয়। এই বিপ্লবে ১০লক্ষ (১ মিলিয়ন)-এর অধিক মুসলমান শহীদ হয়। এ থেকেই আলজেরিয়া ১মিলিয়ন শহীদের মাতৃভূমি নামে প্রসিদ্ধ।

****

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ছায়া-ঔপনিবেশিকতা'র বিরুদ্ধে জিহাদ

পরোক্ষ ঔপনিবেশিক আমলের সূচনা (১৯৬৩ সাল)

এই ১০বছর ধরে চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে যখন ফ্রান্সের বিশ্বাস স্থির হয়ে যায়, এ অবস্থায় সরাসরি দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল, তখন সে এমন পদক্ষেপ নেয় যে, বিপ্লব শেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনরায় সেসব দলের হাতেই আসে যারা পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তা এভাবে যে, 'জাবহাত আত্তাহরীর আল-ওয়াতানী' (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট) নামে একটি পার্টি আন্দোলনে শরীক হয়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে জিহাদ ও স্বাধীনতার জননন্দিত স্লোগান তোলে, কিন্তু পর্দার অন্তরালে পার্টির মাঝে জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও লিবারেল (উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ তথা সেকুলার)দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে রত ছিলো। পরিণতিতে ক্রমান্বয়ে পার্টির মধ্যে ইসলামপন্থিদের প্রভাব হ্রাস পায়। স্বাধীনতা অর্জনের যুগসন্ধিক্ষণে এ পার্টি আলজেরিয়ার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকারী দলরূপে আবির্ভূত হয়। তাদের সঙ্গেই ফ্রান্স ইভিয়ান শহরে ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতার বিনিময়ে তাদের পছন্দসই কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চুক্তির সেসব ধারা প্রকৃতপক্ষে আলজেরিয়াতে জোরপূর্বক পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয়ারই নামান্তর ছিলো। কিংবা বলা যায়, সেসব চুক্তি ছায়ারূপে ঔপনিবেশিকতা টিকিয়ে রাখার কৌশলগত উপায় ছিলো মাত্র। তাইতো তদানীন্তন ফরাসি প্রেসিডেন্ট চার্লিস ডি গাল বলেছিল:

'তারা আলজেরিয়াকে স্বাধীন করতে চায় তো? ঠিক আছে। আমরা তাদেরকে আলজেরিয়া দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ৩০বছর পর আমরা ঠিকই তা ফিরিয়ে নেবো। '

আলজেরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হোয়ারি বুমেদীন ছিলেন সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বামপন্থি আরব জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দল তথা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের অধীনে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। এই তাগুতি ব্যবস্থা অবলম্বনে গণআন্দোলনগুলো দমন করা এবং পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা চাপিয়ে দিতে তিনি ধরপাকড় ও জেল-জুলুমের রাজনীতি আরম্ভ করেন। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তাদের লোভ-লালসা ও দুর্নীতির কারণে আলজেরিয়ার অর্থনীতির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে

ওঠে। অথচ আলজেরিয়া তেলখনিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ, যা বিশ্বে তেল উৎপাদনকারী পঞ্চদশ বৃহত্তম রাষ্ট্র।

মুসলিম দেশগুলোর সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ

পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সেনাবাহিনীর মতোই আলজেরিয়ার সেনাবাহিনী ঔপনিবেশিক শক্তির অবিচ্ছিন্ন শাসনকাল এবং তাদের লক্ষ্যগুলো টিকিয়ে রাখার জন্যই গঠিত হয়। এমনকি আলজেরিয়ার বড় ফৌজি অফিসারেরা ফরাসি নাগরিকত্বের অধিকারী ছিলো। যেনো তারা ফরাসি সেনাবাহিনীর বি-টিম ছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যেমন পাকিস্তানি ফৌজি কমান্ড ইংরেজ জেনারেলদের হাতে ছিলো এবং আজ পর্যন্ত এই বাহিনী ব্রিটিশ ও মার্কিন ফৌজি নিয়ম-কানুন ও বিধিমালার অধীনে কাজ করে, অবিকলধারা আলজেরিয়ার সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও বজায় ছিলো।

আর যেহেতু মুসলিম দেশের সেনাবাহিনীগুলোকে গঠন করাই হয়, এসব দেশে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাই অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এসব সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিলো। আলজেরিয়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি সেসময় ক্ষমতাসীন দলের মাঝেও ফরাসি নাগরিকত্বের অধিকারী ফৌজি অফিসাররাও শামিল হয়ে যায়।

ফ্রাঙ্কফোনি আন্দোলন

যদিও আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আরব জাতীয়তাবাদী ছিলো, কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ফরাসি নাগরিকত্ব বহনকারী ফৌজি অফিসারদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে ফ্রাঙ্কফোনি আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। 'ফ্রান্সোফোনি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ তো ফরাসি ভাষাভাষী। কিন্তু গোটা বিশ্বে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক আমলের শেষলগ্নে যেমন ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটেনের রাজপরিবারের অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে কমনওয়েলথ নামে একটি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করে, তেমনি ফ্রান্স ফ্রাঙ্কোফোনি আন্তর্জাতিক সংস্থা (Organisation internationale de la francophonie)নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা তারই অধীনে পরিচালিত হয় এবং এর প্রভাবে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সরকারি ভাষা কোনো না কোনো পর্যায়ে ফরাসি থেকে যায়। এমনিভাবে ফ্রাঙ্কফোনের অর্থ আমরা

মোটামুটিভাবে সেটাই ধরে নিতে পারি, যা উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শব্দের অর্থ ছিলো।

উপমহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যেকোনো পাঠক নিজের বাপ-দাদার আমলে ইংরেজ ও ব্রিটিশ শব্দের প্রথম ব্যবহার সম্পর্কে খুব সম্ভবপর অবগত হবে না। আসলে সেসময় উপমহাদেশের সামাজিক পর্যায়ে ব্রিটিশ ও ইংরেজ শব্দটি ছিনতাইকারী জালিম-কাফিরের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এমনকি যদি কাউকে গালি দিতে হতো, তবে তাকে ব্রিটিশ অথবা ইংরেজ বলে আখ্যায়িত করা হতো। কারণ সুস্পষ্ট এবং তা হলো, উপমহাদেশের তৎকালীন বাসিন্দারা ইংরেজদের প্রকৃত চেহারা দেখে ফেলে, যা ন্যূনতম মনুষ্যত্ব বিবর্জিত, নৃশংস নির্মম নির্দয় এক দানবীয় ছিলো। অনুরূপ অর্থ আলজেরিয়াতে ফ্রাঙ্কফোনি শব্দের। ফ্রাঙ্কফোনি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কেবল ফরাসি সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করাই ছিলো না, বরং ইসলামের শত্রুতা এবং আলজেরিয়া থেকে ইসলামপন্থিদেরকে উৎখাত করাও তাদের লক্ষ্যের মাঝে শামিল ছিলো। তারই শাখা হিসেবে স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম শাইখ ইবনে বাদীস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের অবশিষ্ট রুকন ও নেতৃবৃন্দের কার্যক্রমের উপর স্বাধীনতার পর বিধি-নিষেধ আরোপ করা ছিলো তাদের পরিকল্পনা।

বুমেদীন মারা যাবার পর ১৯৭৯সালে চাডলি বেন্ডজেদিদ ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট দলের অধীনে প্রেসিডেন্ট হন। অবশ্য বুমেদীনের সমাজতান্ত্রিক আরব জাতীয়তাবাদী এবং আপেক্ষিক ফ্রান্স বিরোধী রাজনীতির বিপরীতে ফ্রাঙ্কফোনি ভাবধারার অধীনে চাডলি বেন্ডজেদিদ আলজেরিয়াকে পুনরায় ফরাসি রাজনীতির পূর্ণ তাবেদার পরিণত করে।

এভাবেই ফ্রাঙ্কফোনি আন্দোলন এবং ফরাসি নাগরিকত্বের অধিকারী বড়ো বড়ো জেনারেলদের ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়। আর ক্ষমতার আসনে থাকা লুটেরা ও দুর্নীতিবাজদের কারণে আলজেরিয়ার আর্থনীতিক অবস্থা উন্নতির পরিবর্তে শোচনীয় হয়।

আলজেরিয়াতে যখন থেকে মুসলমানরা অনুভব করতে পারে যে, স্বাধীনতার নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, তখন থেকে সরকারের কঠোরতা সত্ত্বেও বিভিন্ন নিষ্ঠাবান সংস্কারক, যারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন,

তারা রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখার দাওয়াত উচ্চকিত করেন এবং সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা সংশোধনের দাবি জানান। কিন্তু সরকার জুলুম-অত্যাচার ও কঠোর হাতে সত্যের এসব কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার পদক্ষেপ নেয়। নির্যাতন-নিপীড়নের এমন পর্যায়ে যেকোনো দেশে গোপনে বিভিন্ন সংগঠন ও সশস্ত্র আন্দোলনের জাগরণ অনিার্য, তা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আর এতো হলো আলজেরিয়া, যেদেশের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জনসাধারণের জন্য 'জিহাদ' কোনো নতুন শব্দ ছিলো না। এরকম দেশে পুনরায় জিহাদের আওয়াজ উচ্চকিত হওয়াই একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা। আর এ নিয়েই ছিলো ক্ষমতাসীনদের যতো ভয়।

ইসলামী জাগরণ এবং সশস্ত্র জিহাদ

৫০ ও ৬০এর দশকে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থি আন্দোলনগুলোর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এবং অবশেষে সেগুলোর পতন ঘটা, এসবের বিপরীতে ৭০এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই গোটা ইসলামী বিশ্বে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার আসতে থাকে, যাকে আমরা 'ইসলামী জাগরণ' বলে থাকি। তবে সে সময়ে এই জাগরণ মুসলিম বিশ্বের তাগুতি সরকারগুলোর ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে অত্যন্ত চাপের মুখে থাকে।

জিহাদ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চলমান

কঠোর সেই নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও ওই সময়ে আল্লাহর এমন কিছু বান্দা দাঁড়িয়ে যান;যারা সরকারি শক্তিগুলোকে শক্তির ভাষাতেই জবাব দেন। কারণ তারা এই বাস্তবতা পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন যে, লোহা কেবল আগুনের দ্বারাই গলে থাকে। আর যখন নির্যাতন-নিপীড়নের সঙ্গে কুফরি যোগ হয়, তখন তো সশস্ত্র আন্দোলন একটি দ্বীনি ফরয দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের ইসলামী আকীদা, শক্তি, পূর্ণ আবেগ, উদ্যম ও স্বতঃস্ফূর্ততা সহকারে এই ফরয দায়িত্ব পালনে মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এই বিধানকে ইসলামের মাঝে ফরয জিহাদ বলে স্মরণ করা হয়।

তাইতো আলজেরিয়াতে আল্লাহ তাআলার এক ওলী শাইখ মুস্তাফা আবু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে আলজেরিয়ার ক্ষমতা দখল করে রাখা কুফুরি শক্তিগুলোর তাবেদার তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার প্রথম ও নতুন জিহাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই জিহাদী আন্দোলনকে নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয় যে, আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলনগুলো তো খিলাফত পতনের সময়কাল থেকেই অব্যাহত ছিলো। আর প্রথম এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, কেউ কেউ মনে করে, আলজেরিয়াতে তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ১৯৯১ সালের প্রসিদ্ধ হরতাল এবং ১৯৯২ সালে সেনাঅভ্যুত্থানের পর আরম্ভ হয়েছে। যদিও ১৯৯১সালের জিহাদী আন্দোলনের তুলনায় শাইখ মোস্তফার আন্দোলন অবয়ব ও ব্যাপকতা বিচারে ক্ষুদ্র ছিলো, কিন্তু খোদ ১৯৯১সালের আন্দোলন শাইখ মোস্তফার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলো, যা পাঠকবৃন্দ এই কিতাব থেকে সহজেই জানবেন।

আমরা আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো, শাইখ মোস্তফা একাই জিহাদী চিন্তাধারা লালনকারী ছিলেন না, সমাজের বহু লোক তাঁর সমমনা ও সাহায্যকারী ছিলো, যাদের মাঝে প্রসিদ্ধ আফগান ফেরত আলজেরিয়ার মুজাহিদ ‘কারী সাঈদ’ শামিল ছিলেন।

এখানে এ সত্য আমরা পুনরায় উল্লেখ করছি যে, উপমহাদেশসহ মুসলিমবিশ্বের কোথাও জিহাদ পুরোপুরিভাবে কখনই থেমে যায়নি। তবে হ্যাঁ, জিহাদ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়। দুর্বল অবস্থায় জননন্দিত ব্যক্তিবর্গ দাওয়াত সংস্কার ও তরবিয়তের মাধ্যমে উম্মাহকে আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন এবং তাদের মাঝে সংস্কার সাধন করে থাকেন, যাতে উম্মাহ আগামীতে আসন্ন বাস্তব ময়দানের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এ কারণেই জিহাদী কার্যক্রম বাস্তবে কখনই পুরোপুরিভাবে থেমে থাকে না এবং হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতাবেক কিয়ামত পর্যন্ত তা কখনই থেমে থাকবে না।

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ (১৯৭৮ সাল)

কারী সাঈদের মূল নাম ওয়াহাবী ইবনে নাসরুদ্দিন। তিনি আলজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ বেকহার থেকে এসেছেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াইকারী আলজেরিয়ান মুজাহিদীনের মাঝে অন্যতম তিনি। ১৯৭৮ সাল থেকেই তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতিতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে ফ্রান্সের

বিরুদ্ধে জিহাদে শামিল হন কতক ফৌজি অফিসার ও সিপাহি দায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং উলামায়ে কিরামের অনেকেই।

কিন্তু কাজের বাস্তব ময়দানে পা রাখতেই কারী সাঈদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, আলজেরিয়ার জনসাধারণ তখন পর্যন্ত যথেষ্টরূপে জিহাদের উপায় অবলম্বন ও উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি আলজেরিয়ার তাগুতি ব্যবস্থা ও সরকারের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান, জনসাধারণ দূরে থাকুক;অধিকাংশ দাঈ ব্যক্তির কাছেও স্পষ্ট নয়।

তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, জিহাদ আরম্ভ করার জন্য প্রথমে স্বয়ং তিনি শরীয়াহর ইলম অর্জন করবেন। অতএব, এই উদ্দেশ্যে তিনি হিজাযের পুণ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে ছয় বছর পর্যন্ত তিনি দ্বীনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন থাকেন। সেখানে মুজাদ্দিদে জিহাদ(জিহাদ সংস্কারক)শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। ফলে তিনি হিজায থেকে আফগানিস্তানে গিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯১সালে কারী সাঈদ জিহাদের উদ্দেশ্যে আলজেরিয়াতে ফিরে আসেন। অতঃপর পূর্ণোদ্যমে মুবারক এই কাজে অংশগ্রহণের পর ১৯৯৪সালে কনস্টান্টটাইন প্রদেশের জাবাল এল ওয়াচ এলাকায় আলজেরিয়ান বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন! সামনে আবারও তাঁর আলোচনা আসবে।

আল-হরকাতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ (১৯৭৯ সাল)

শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা ১৯৪০সালে রাজধানীর শহরতলি ড্রারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিপ্লব ও জিহাদে যখন অংশগ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ১৭বছরের বেশি ছিলো না। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রসিদ্ধ মুজাহিদীনের মাঝে অন্যতম ছিলেন।

ইসলামী জাগরণের সূচনাকালেই শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিদের এই বিশ্বাস স্থির হয়ে যায় যে, এই শাসনব্যবস্থা ও সরকারের মুকাবেলা, শক্তির ভাষা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই দ্বারা সম্ভবপর না, ইসলামী রাজ্য ও ইমারত প্রতিষ্ঠামুখী একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মানহাজ ছাড়া অন্যকোনো পন্থায় সম্ভবপর নয়।

এজন্য আলজেরিয়ার সন্তানদের এই মুবারক জামাআত কাফির শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের প্রস্তুতি ১৯৭৯ সাল থেকেই আরম্ভ করেন। শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা আপন নেতৃত্বে আলজেরিয়ার সর্বপ্রথম সশস্ত্র জামাআত আল-হরকাতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ[২১] (সশস্ত্র ইসলামী আন্দোলন) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন জেলায় যুবকদের বেশ কয়েকটি গ্রুপকে সফলভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হন।

কিন্তু আশির দশকের শুরুতে, তার আগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সশস্ত্র কার্যক্রম আরম্ভ করা যায়নি।

শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলন

আলজেরিয়ান সরকার যখন স্বাধীনতা বিপ্লব ও মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যসমূহ থেকে সরে আসে, তখন শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা সে যুগের অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতই এই দাবি তুলেন যে, ১৯৫৪ সাল কালীন আলজেরিয়ার মুসলিম পরিচয়কে ঠিক সেই বিপ্লবের মূলনীতি অনুসারে বহাল করতে হবে, যার স্লোগান ইসলাম ও জিহাদ ছিলো। এছাড়া হুকুমতের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি আওয়াজ তোলেন।

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি জমিয়তুল উলামায় সংযুক্ত উলামায়ে কিরাম ও দাঈদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁদের মাঝে শাইখ **আহমদ সাহনূন**, শাইখ **আব্দুল লতিফ** সুলতানী ও শাইখ **আরবাবী** উল্লেখযোগ্য। শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করতে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বলার জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। সে সময় তিনি নিজেও মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মসজিদ আল-আশুরে খুতবা প্রদান করতেন।

---

[২১] শাইখ আবু মুসআব লিখেছেন, শাইখ মোস্তফা আবু ইয়ালা জিহাদের ঘোষণা করেন এবং হরকতুদ দাওলাতিল ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে মুজাহিদ আবু আকরামের বর্ণনা মুতাবেক শাইখ মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের নাম সেটাই, যা আমরা মূল কিতাবে উল্লেখ করেছি। অন্যত্র শাইখ আবু মুসআব নিজেই লিখেছেন যে, হরকতুদ দাওলাতিল ইসলামিয়া শাইখ মোস্তফার সঙ্গীবর্গ মুক্তি লাভের পর তাঁর একজন সহচর ও সহকর্মী শাইখ সাঈদ মাখলুফির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মুজাহিদ আবু আকরাম এবং শাইখ আসিম আবু হাইয়ান উভয়ই শাইখ সাঈদ মাখলুফিকেই হরকতুদ দাওলতিল ইসলামিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি যে, শাইখ সাঈদ মাখলুফি শাইখ মোস্তফার জামাআতের রুকনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি-না।

শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি (১৯৮২ সাল)

৭০-এর দশক থেকে মুসলিম বিশ্বের মতো আলজেরিয়াতেও সামাজিক পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ইসলামী জাগরণের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিলো। সামাজিকভাবে এ জাগরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্নভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সূচনাকালে ইসলামপন্থিদের পক্ষ থেকে মদের বারগুলোর বিরুদ্ধে কিছু কর্মসূচি পালিত হয়। ক্রমেই মসজিদে জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নারীদের মাঝে হিযাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৯৮২সালে জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের সঙ্গে যেকোনোভাবে যুক্ত কতক দাঈ ও স্বাধীনচেতা ইসলাম প্রচারক ব্যক্তি মিলে সরকারের কাছে ১৪দফা দাবি পেশ করেন। সেসব দাবির বুনিয়াদি লক্ষ্য ছিলো-ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন। এছাড়াও মুসলিম বন্দিদের মুক্তিদান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ইসলাম বিদ্বেষী লোকদেরকে বহিষ্কৃত করার দাবিও তাতে শামিল ছিলো। জাগরণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মাঝে শাইখ আহমদ সাহনূন, শাইখ আব্দুল লতিফ সুলতানী, শাইখ আরবাবী এবং ডক্টর আব্বাস মাদানী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বশেষ জন তো পরবর্তীতে আলজেরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্ববৃহৎ রাজনীতিক গণতান্ত্রিক পার্টির প্রধানও হন। সামনে তাঁর ব্যাপারে আলোচনা করবো।

১৪দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিরিজ গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। তাতে প্রায় ৪০০সক্রিয় নেতাকর্মী আটক হন। তাদের মাঝে উলামা, দাঈ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষকবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশার বহু আলজেরিয়ান নিষ্ঠাবান মুমিন মুসলমান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন জমিয়তুল উলামা'র শাইখ আব্দুল লতিফ সুলতানী স্বয়ং। ঔপনিবেশিক আমলের সরকারের মতোই আলজেরিয়ান সরকারও স্বাধীনতার এসব আওয়াজ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য পুলিশপ্রশাসন ও সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে নির্যাতন-নিপীড়ন ও কঠোরতার পন্থা অবলম্বন করে। চাপ প্রয়োগ ও কঠোরতার পাশাপাশি জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য কয়েকটি নামমাত্র ইসলামিক উদ্যোগও সরকার গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৯৮৪সালে কনস্টানটিন শহরে একটি বড় ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা এবং পরিবার সংক্রান্ত আইন-কানুন ইসলামী শরীয়তের কাছাকাছি নিয়ে আসার মতো উদ্যোগও ছিলো। উপমহাদেশের পাঠকবৃন্দ

পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি আর তার ফলাফলের সঙ্গে আলজেরিয়ার উপর্যুক্ত অবস্থা তুলনা করলে বাস্তবতা সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

সৌমাআ'র অপারেশন (১৯৮৬ সাল)

শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র সঙ্গীবৃন্দ আশির দশকের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র কার্যক্রমের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। শাইখ সামরিক কার্যক্রমের পূর্বে বিভিন্ন লেখা ও অডিও বক্তব্যের মাধ্যমে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। সেসবের মাধ্যমে তিনি জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করা এবং ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে আহ্বান জানান। শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র জামাআতে সদস্য বৃদ্ধির পর, পূর্বে যাদের সংখ্যা ছিলো বিশ, পরবর্তীতে তা পাঁচশতের উপরে এসে দাঁড়ায়। সে তুলনায় অস্ত্রাদি ছিলো খুবই অপ্রতুল ও স্বল্প পরিমাণ। এমতাবস্থায় জামাআত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অস্ত্রাদি লাভের জন্য ব্লিডা জেলায় অবস্থিত সৌমাআ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে হামলা করা হবে।

এটি শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র সর্বশেষ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক প্রদর্শনীমূলক বহুল আলোচিত সফল অপারেশন ছিলো। ২৬ই আগস্ট ১৯৮৬সালে আক্রমণ করা হয়। তাতে ছোট অস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রভাণ্ডার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ গনীমত হিসেবে তাদের হস্তগত হয়। [২২]

এ ঘটনার পর সরকার নিজের সমস্ত অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি সহকারে বু ইয়ালা-জামাআতের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাতে ছয়মাস অতিক্রান্ত না হতেই জামাআতের অধিকাংশ সদস্য গ্রেপ্তার হয়ে যায়। ইতোমধ্যে শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা নিজের কতক সঙ্গীসহ পালাতে সক্ষম হন।

---

[২২] সে অপারেশনে হস্তগত গনীমতের বিবরণ কিছুটা এই— ১০ টি বন্দুক (মডেল ম্যাস ৪৫৬), ১২০ টি সাধারণ বন্দুক, ৩৫ টি মেশিনগান (মডেল মেট ৪৯), ২৭ টি পিস্তল (মডেল স্মিথ এন্ড ওয়েসন), মাউজার মেশিনগান, ১৪০ টি বিভিন্ন ধরনের পিস্তল, ১ টি রকেট লাঞ্চার, ২ টি ভারি মেশিনগান, ২ টি কারবাইন বন্দুক, ১৫ টি গ্রেনেড, ১২ হাজার পিস্তলের গুলি (স্মিথ এন্ড ওয়েসন), ৬ হাজার গুলি (মেট ৪৯) মেশিনগান, মেশিনগানের গুলির ১৪০ কি ডিব্বা এবং ভারি বন্দুকের ১৮০ টি গুলি।

শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র শাহাদাত

অবশেষে ৩ই জানুয়ারি ১৯৮৭সালে রাজধানীর শহরতলি লারবায়েস এলাকায় সিকিউরিটি ফোর্স শাইখ এবং তাঁর পাঁচজন সঙ্গীর জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তাতে উভয়পক্ষে গোলাগুলির পর শাইখ সঙ্গীবর্গসহ শহীদ হয়ে যান। রহিমাহুল্লাহ তাআলা! !

কৃষ্ণ বিপ্লব (১৯৮৮ সাল)

আশির দশকের শেষ পর্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, জেল-জুলুম ও ধর-পাকড়ের ফলে আলজেরিয়ার পতনোন্মুখ আর্থনীতিক অবস্থা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর শিক্ষিত যুবকেরা ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৮সালে সহস্র লোকের জনস্রোত নিয়ে সড়কে নেমে আসে। তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিলো বহুল আলোচিত রুটি আন্দোলনের চেয়েও প্রসিদ্ধ। সেই আন্দোলনে সমাজের নানা শ্রেণির পাশাপাশি ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারাও যে পূর্ণ অংশগ্রহণ ছিলো, তা বলাই বাহুল্য।

বিক্ষোভকারী ও প্রশাসনের লোকদের মাঝে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপে পাঁচশতের অধিক যুবক নিহত হয় এবং ছোটাছুটির ভেতরে ৩৫০০জন গ্রেপ্তার হয়। আলজেরিয়ার সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা যেনো একটা ধামাকা ছিলো। তাই কেউ কেউ একে 'কালো অক্টোবর' নামে স্মরণ করে থাকে।

এতোটা ব্যাপক ও তীব্র বিক্ষোভ দেখে প্রেসিডেন্ট ও সরকারের বিশ্বাস স্থির হয় যে, বুনিয়াদি পরিবর্তন না এনে কেবল কঠোরতা ও জোর জবরদস্তি করে পরিস্থিতি সামলানো মুশকিল। কারণ পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, বিক্ষোভকারীরা গণতান্ত্রিক ভবন দখল করে নেবে। তাইতো প্রেসিডেন্ট চাডলি বেন্ডজেদিদ ক্রন্দনরত চেহারা নিয়ে টিভিতে আসেন এবং লোকদেরকে ফিরে যাবার জন্য জোরাজুরি করেন, আর সেই সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের আমূল সংশোধন ও সংস্কারের ঘোষণা করেন। তাতে স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু, রাজনীতিক দলগঠনের স্বাধীনতার পাশাপাশি ১৯৮৯সালে সিটি নির্বাচন এবং ১৯৯১সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের কথা বলা হয়। এভাবেই আলজেরিয়াতে একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ইতিহাস ও ঘটনাক্রম বর্ণনায় সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা আলজেরিয়ার ইসলামী জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধারা-উপধারা, সেগুলোর রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাভঙ্গি এবং সমাজের ইসলামী গণতান্ত্রিক বিভিন্ন দলসহ অন্যান্য ধর্মহীন সেক্যুলার দলের আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। কারণ প্রাক-জিহাদ সময়ে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও কর্ম-প্রভাব রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা

১৯৮৮সালের বিপ্লবের পর যখনই আলজেরিয়ার সামাজিক ও রাজনীতিক পরিমণ্ডলে স্বাধীনতার বাতাস প্রবাহিত হয়, তখনই ৭০-এর দশক থেকে জোরালোভাবে সক্রিয় কিন্তু অবদমিত ইসলামী আন্দোলন দৃশ্যপটে আসতে শুরু করে। সেই সঙ্গে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও মতপার্থক্যগুলোও সামনে আসতে থাকে। সেসব আন্দোলনের মাঝে মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান জিহাদী, ইখওয়ানী, সালাফী, তাবলীগী ও দাওয়াতী ইত্যাদি প্রায় সকল ধারা-উপধারার পাশাপাশি সীমিত পরিসরে তাকফীরি চিন্তারধারাও শামিল ছিলো। বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তা-প্রধান এই ধারা-উপধারা সত্ত্বেও তৎকালীন জাগরণমূলক আন্দোলনের সামষ্টিক প্রভাবে সমাজে শরীয়ত বাস্তবায়নের গুরুত্ব, তাগুতের প্রতি কুফরি এবং জুলুম সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়িল ব্যাপকতা লাভ করে। ক্রমেই জনসাধারণের তরফ থেকে শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি জোরদার হতে থাকে।

রাজনীতিক দলগুলোর বিবরণ দেয়ার আগে আমরা ইসলামী বিভিন্নধারা এবং সেগুলোর চিন্তাগত প্রাধান্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ ইসলামী গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং জিহাদী আন্দোলনের উপর এই ধারাগুলোর গভীর প্রভাব রয়েছে।

ইখওয়ানী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্কুল অব থট

প্রেসিডেন্ট বুমেদীন সকল অনাচার সত্ত্বেও আরব জাতীয়তাবাদ ও আরব জাতিসত্তা রক্ষার স্বার্থে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। তিনি আলজেরিয়ার আরব পরিচয় রক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে আরবী ভাষায় ঢেলে সাজানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন আরবদেশ

বিশেষত মিশর ও সিরিয়া থেকে অধিক সংখ্যক আরবী ভাষার শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানিয়ে আলজেরিয়াতে নিয়ে আসেন। সেই শিক্ষকদের মাঝে শহীদ হাসানুল বান্না রহিমাহুল্লাহ'র হাতে মিশরে প্রতিষ্ঠিত তানযীম ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই শামিল ছিলেন। এভাবেই অন্যান্য আরবদেশের মতই আলজেরিয়াতেও ইখওয়ানী চিন্তার প্রসার ঘটে।

ইখওয়ানীধারায় এতোটা উদার মনোভাব, নম্রতা ও বিস্তৃতি রয়েছে যে, তা বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকদেরকে নিজের বলয়ে অনায়াসে স্থান দিতে পারে। তাই তো এই এক জামাআতের মাঝেই সালাফী, সুফি, জিহাদী ও ইসলামী গণতন্ত্রবাদী— সবধরনের চিন্তাধারার লোকই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এক জামাআতের মাঝেই যেখানে একশ্রেণির লোক গণতন্ত্রের উপর অন্ধের মতো আস্থা রাখতো, অপরদিকে অন্যশ্রেণির লোকেরা শাসকদেরকে তাগুত এবং গণতন্ত্রকে কুফুরি আখ্যা দিতো।

সাধারণত হাকিমিয়্যাত(আল্লাহর একক শাসন ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত আকীদা ও ফিকহ) ও শাসক বিদ্রোহের ব্যাপারে সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ইখওয়ানীধারাকে কুতুবি বলা হয়। কুতুবি আসলে লোকদের দেয়া নাম। মূলত ইখওয়ানের একজন পথনির্দেশক এবং ইসলামের গর্বিত চিন্তাবিদ সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ'র প্রতি সম্বন্ধ করেই প্রদত্ত এই অভিধা করা হয়। কুতুবিধারার বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যুবকদেরকে সার্বিকভাবে তরবিয়াত ও দীক্ষা প্রদানের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে। আমরা একে ‘সদস্যদের ব্যক্তিত্বকে অটুট ভিত্তির উপর স্থাপন করার দৃষ্টিভঙ্গি’ বলতে পারি। যখন আলজেরিয়াতে জিহাদ শুরু হয়, তখন এরাও দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের মাঝে একদল মুজাহিদদের সঙ্গে মিলে যায়। তারা সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক কাজে উৎসাহ দান ও দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকে।

মালিক ইবনে নবীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'আল-জাযআরাহ'

মালিক ইবনে নবী রহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৩সালে। তিনি আলজেরিয়ার প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। অবশ্য প্রচলিত অর্থে তিনি আলিমে দ্বীন ছিলেন না। তিনি তাঁর দাওয়াতে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিতেন। আলজেরিয়াতে ইসলামপন্থিদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নকালে তিনি নিজগৃহে অনুসারীদেরকে সবক প্রদান করতেন। তাঁর অধিকাংশ অনুসারী নতুন

ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী হতো। এ কারণেই তাঁর জামাআত ‘জামাআত আততলাবা’ (ছাত্রদের জামাআত) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। মালিক ইবনে নবী রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়ার নতুন কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটিতে ইসলামপন্থিদের জন্য মসজিদ নির্মাণে বুনিয়াদি ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক শিক্ষিত শিক্ষার্থী এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নজর দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক, প্রফেসর, ইসলামী স্কলার এবং বিভিন্ন শিল্প ও শাস্ত্রের আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গিতে মালিক ইবনে নবীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীন ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দৃষ্টিভঙ্গিও শামিল ছিলো।

যেহেতু মালিক ইবনে নবী আলজেরিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য আলজেরীয় সমাজের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্বারোপ করেন, এজন্য তাঁর বিরোধী ইখওয়ানী পথনির্দেশক মাহফুজ নাহনাহ সর্বপ্রথম তাঁকে **'আল-জাযআরাহ'** উপাধি দেন যার অর্থ হলো—আলজেরীয় বানানো। কিন্তু জামাআতের সদস্যরা নিজেরা এই উপাধি গ্রহণ করেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে উস্তাদ **তৈয়্যেব বারগুস’**এর নেতৃত্বে **‘আল-জামইয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ লিল বিনায়িল হাযারী’** (সভ্যতা নির্মাণে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংঘ) সেসব সংগঠনের মাঝে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো মালিক ইবনে নবীর চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

এই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে শুধু আলজেরিয়াতে সর্ববৃহৎ ইসলামী রাজনীতিক পার্টি ‘ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট’ গঠনেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেনি;বরং তাদের মুর্শিদ শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ ১৯৯২সালে সেনা অভ্যুত্থানের পরে আল জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহা বা GIA'রও একজন বড় রাহবার ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে তার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুজাহিদদের মাঝে কট্টরপন্থি পথভ্রষ্ট সদস্যরা হত্যা করে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন—

“তাদের উপর এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, এ সমস্ত লোক যুক্তিবাদী, বুদ্ধি পূজারী, ইখওয়ানী, কুতুবি ও বিদাআতী। এসব অভিযোগ ঠিক নয়। তাঁদের মাঝে

অনেক সৎ লোক রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই সুশিক্ষিত। এই জামাআতের মাঝে বিশুদ্ধ বিষয় যেমন ছিলো, তেমনি বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তিও ছিলো। আমি তাঁদের কতক ব্যক্তিকে কাছ থেকে দেখেছি।

তাঁদের মাঝে এমন লোকও ছিলো যারা দাড়ি মুণ্ডন করতো। তারা ধর্মীয় অনুশাসন মতো 'দাশদাশ'[২৩]পরিধান না করে আধুনিক পোশাক পরিধান করতো। তাঁদের ধারণা ছিলো, কঠোরতার এই পর্যায়ে আমাদের জন্য এমনটা করা জরুরী। তাঁদের ওখানে ফতোয়া এরকম ছিলো, দাড়ি প্রকাশ করা যাবে না। এজন্য তাঁদেরকে 'জামাআতুল হাযার'অর্থাৎ সর্তকতা অবলম্বনকারী জামাআত নামেও ডাকা হতো।

কিন্তু তাদের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নেককার ও দ্বীনদার ছিলেন। তারা উচ্চতর ইসলামী মনোভাবের অধিকারী এবং নেহায়েত সমঝদার ছিলেন। সেই সঙ্গে সাহসিকতার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে ছিলেন না। এ কারণে তারা জিহাদের অঙ্গনেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাদের নেতৃবৃন্দের কারও কারও সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। ”

সালাফী দৃষ্টিভঙ্গি

উসমানী খিলাফত আমলে জাযীরাতুল আরবের শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহু যে আন্দোলন দাঁড় করান, তাকে পরবর্তী সময়ে সালাফী আন্দোলন বলা হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র থেকে এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটায় তা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য আন্দোলনগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং খোদ এই আন্দোলন বেশ বিস্তৃতি লাভ করে।

তাছাড়া সৌদি রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকে তাগুতি সৌদি বাদশা নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্বীন ইসলামের আলখেল্লা' গায়ে জড়িয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং ইসলামী ব্যবস্থাকে নিজের অনুগত রাখার জন্য খ্রিস্টীয় আশির দশক থেকেই সালাফী দৃষ্টিভঙ্গিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে আরম্ভ করে। সৌদি বাদশারা নিজেদের রাষ্ট্র ও আরব বিশ্বের ৭০শতাংশ মিডিয়া নিজেদের দখলে নেয়ার মাধ্যমে সালাফী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। কিন্তু পরিণামে দেখা যায়, সৌদির

[২৩] আলজেরিয়াসহ মাগরিবে ইসলামীর অন্যান্য দেশে পরিধেয় জুব্বা সদৃশ পোশাক বিশেষ।

ফেরাউনি শাসকগোষ্ঠী যেন নিজেদের প্রাসাদে এতদিন মূসার প্রতিপালন করে এসেছে।

এখানে এটি স্পষ্ট করে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, বিশুদ্ধ সালাফী চিন্তাধারা আর সৌদি রাজপরিবারের তাবেদার সালাফী চিন্তাধারা পরস্পরে ওতপ্রোত নয়;একটি অপরটির জন্য জরুরী বিষয় নয়। সালাফীদের বিস্তৃত বলয়ের ভেতর বিভিন্ন রকম এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী উপধারা জন্ম নিয়েছে। যেমন সুরুরী সালাফী এবং জামি মাদখালী সালাফী —চিন্তা ক্ষেত্রে এই দু'টি উপধারা পরস্পর বিরোধী। অতএব, অন্যান্য মুসলিম দেশের মতই আলজেরিয়ার যুবকেরাও নিজেদের মতপার্থক্য এবং ধারা-উপধারাগুলোর মতবিরোধসহই সালাফী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

সুরুরী সালাফী

সুরুরী চিন্তাকেন্দ্রের নির্মাতা সিরিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত মুহাম্মদ সুরুর জাইনুল আবেদীন (জন্ম:১৯৩৮ সাল)। শুরুর দিকে তিনি ইখওয়ানী ছিলেন। কিন্তু যখন সিরিয়াতে ইখওয়ানীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন শাইখ সুরুর সৌদি আরব চলে যান। তথায় তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সৌদি আরবে তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এবং সাইয়্যিদ কুতুবের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর-যুক্ত করেন। তিনি নিজের অনুসারীদের মাঝে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বৈপ্লবিক আদলে পেশ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন সৌদি যুবকদের জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিলো।

সৌদি আরবের কঠোর সরকারি বিধি-নিষেধের ভেতর এটা স্পষ্ট যে, তিনি আলাদা কোনো জামাআত গঠন করতে পারেন নি, এ কারণে তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁরই নামের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। এই চিন্তাধারাকে ইখওয়ানী সালাফী দৃষ্টিভঙ্গিও বলা হয়। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর তাঁর এই চিন্তাধারার কারণে তাঁকে সৌদি আরব ত্যাগ করতে হয়। সেখান থেকে তিনি লন্ডন চলে যান এবং নিজের প্রসিদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সে সাময়িকীর একটি অংশে সৌদি শাসকদের বিরুদ্ধে লেখা হতো।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, একসময় গণতন্ত্রকে কুফুরি আখ্যা দানকারী ব্যক্তি এখন লন্ডনে বসে নিজেই আলজেরিয়াতে ইসলামী গণতন্ত্রকে সমর্থন দান এবং মুজাহিদদের বিরোধিতা করে যাচ্ছেন।

জামি মাদখালী দৃষ্টিভঙ্গি

এই চিন্তাকেন্দ্রের নির্মাতা ইথিওপিয়ার আলিম মুহাম্মদ আমান আল-জামি (মৃত্যু ১৪১৬ হিজরি)। তাঁর পরে তাঁর চিন্তা প্রচার করেন তাঁরই উল্লেখযোগ্য শিষ্য সৌদি আলিমে দ্বীন রাবি মাদখালী (জন্ম ১৯৩২ সাল)। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে এবং খুব সম্ভবপর তা সুরুরী চিন্তাধারার খণ্ডন ছিলো। মাদখালীদের দৃষ্টিতে যেকোনো মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য। এছাড়াও যেকোনো মুসলিম দেশে কোনো প্রকারের দল গঠন করা, বিশেষত রাজনীতিক দল গঠন—তা পুরোপুরি ইসলামবিরোধী। কারণ তাদের দৃষ্টিতে ইসলামে কেবল একটি দল থাকতে পারে, আর তা হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দল। এমন সালাফীরা সর্বদাই আলজেরিয়ার তাগুতি সরকারের সঙ্গ দিয়েছে এবং বিদ্রোহ ও জিহাদের বিরোধিতা করে এসেছে।

তাকফীর প্রবণ সালাফী চিন্তাধারা

মিসর সরকারের শরীয়ত বিমুখতা এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাগুতি জেলখানাগুলোর ভেতর কতক অজ্ঞ-মূর্খ ইসলামপন্থি কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই তাকফীরের পথ খুলে দেয়। এমনকি যারা ঢালাওভাবে শাসকদেরকে তাকফীর করার প্রবক্তা না হবে, তাদেরকেও কাফির বলতে আরম্ভ করে দেয়া হয়। তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তাদের মধ্যে কারও কারও মতে জনসাধারণের আকীদা যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট না হবে, তাদেরকে যেমন কাফির বলা যাবে না, তেমনি মুসলমানও বলার সুযোগ থাকবে না। তাছাড়া এ জাতীয় যুবকদের মাঝে ব্যাপকভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকার দরুন জগত ও ধর্মের ব্যাপারে তারা নানান ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়।

আলজেরিয়ার রাজধানী ও অন্যান্য মধ্যাঞ্চলীয় এলাকায় এমন চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ যুবককে পাওয়া যায়। তাদের মাঝে কারও কারও সম্পর্ক রাজধানীর সালাফী জামাআত ‘জামাআত আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি

আনিল মুনকার'-এর সঙ্গে ছিলো। [২৪]লোকমুখে তাদেরকে রাজধানীর সালাফীও বলা হতো। আলজেরিয়ার জিহাদে বড় গুমরাহী এ জাতীয় লোকদের হাতেই ছড়িয়েছে।

সালাফী জিহাদী চিন্তাধারা

এসব প্রান্তিকতার বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ প্রাচীন সালাফীধারাও বিদ্যমান ছিলো। তারা তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদকে জায়িয মনে করত এবং গণতন্ত্রের মানহাজকে ভ্রান্ত বলতো। কিন্তু তাকফীর বিষয়ে শরীয়ত মুতাবেক সর্তকতা অবলম্বন করতো এবং সেভাবেই কাজ করতো। এ ধারার শীর্ষে রয়েছেন প্রসিদ্ধ দাঈ ও **শাইখ আলী বালহাজ।** শাইখ আলী বালহাজের রচনাবলী, বিভিন্ন বয়ান ও বক্তব্য, দরস ও লেকচারগুলোর মূল ও বুনিয়াদি বিষয়বস্তু হতো শরীয়ত বাস্তবায়ন। এছাড়াও শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনের অবশিষ্ট সদস্যবৃন্দ যারা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, বিশেষ করে **শাইখ সাঈদ মাখলুফি**— তাঁরাও সালাফী জিহাদী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন।

আফগান জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ইসলামী জাগরণের পাশাপাশি আফগান জিহাদের আওয়াজও উচ্চকিত হতে থাকে। রুশ বিরোধী মার্কিন রাজনীতির তাবেদারী হিসেবে দাসপ্রতিম আরব সরকারগুলো জিহাদে অংশ গ্রহণে আগ্রহী যুবকদেরকে ছাড় দিয়েছিলো। আলহামদু লিল্লাহ, মুজাহিদীনরা এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার পর খোদ আমেরিকার বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করে দেয়, যা আজও পর্যন্ত চলমান। এভাবেই শত শত আলজেরীয় যুবক আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করে, যাদেরকে আলজেরীয় আরব আফগান বলা হতে থাকে।

রুশদের বিদায় নেয়ার পর আফগান জিহাদী জামাআতগুলোর মাঝে অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। তারা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তখন অনেক আলজেরীয় মুজাহিদ আলজেরিয়াতে তাগুতি শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি

---

[২৪] শাইখ আবু মুসআব সূরীর বক্তব্য হলো, এই পুরো জামাআত তাকফীরি মনোভাব এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত ছিলো। কিন্তু অন্যান্য শাইখ এতটা দ্ব্যর্থহীনভাবে এই জামাআতের প্রতি তাকফীরি মনোভাবের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন নি। যদিও এ বিষয়ে তারা একমত যে, রাজধানী আলজিয়ার্স সহ মধ্যপ্রদেশগুলোতে তাকফীরি মনোভাবের লোকদের সংখ্যা বেশি ছিলো।

গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে কারী সাঈদ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর কথা পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি এবং সামনে আবারও তাঁর আলোচনা আসবে। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে আলজেরিয়ার প্রতিটি শহর ও এলাকায় আফগান ফেরত মুজাহিদরা নিজেদের গ্রুপ খুলতে আরম্ভ করে। সেসব গ্রুপ জনসেবা, অতিথিকেন্দ্র নির্মাণ ও সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ করতে থাকে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, তৎকালে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পৃষ্ঠপোষকতায় হতো। কিন্তু আফগানিস্তানে গমনকারী আলজেরীয় মুজাহিদীনের বিভিন্ন চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও, মিশর ও লিবিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত মুজাহিদীনের বিপরীতে তারা অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে যেতেন;দলবদ্ধভাবে নয়। আর আলজেরিয়ার সমস্ত মুজাহিদ পেশোয়ারে অবস্থিত মুযাফাতুল মুজাহিদীন নামক একটি অতিথিকেন্দ্রে অবস্থান করতেন। সে সময়ে আফগানিস্তানে আলজেরীয় মুজাহিদীনের সংখ্যা একহাজারের অধিক ছিলো। আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাঝে সালাফী, ইখওয়ানী, জিহাদী—সবধরনের চিন্তাধারার লোক ছিলো। তাদের মাঝে কেউ কেউ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতি অধিক টান অনুভব করে, অপরদিকে কেউ কেউ সালাফীদের প্রতি। কিন্তু সকলেই জিহাদের ব্যাপারে একমত ছিলো। এদিক থেকে এই গ্রুপটি অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারার তুলনায় অধিক সংখ্যক মনে হতো।

অন্যান্য ইসলামী ধারা-উপধারা

এছাড়াও আলজেরিয়ার ইসলামী সমাজে প্রাচীন সুফি, সংস্কারবাদী এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা বিদ্যমান ছিলো। এভাবেই আশির দশকে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্নধারা ও কিসিমের ইসলামী জাগরণমূলক আন্দোলন আলজেরিয়ার সমাজে পাশাপাশি নজরে আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ রাজনীতিক দলসমূহ

উপরে বিভিন্ন ইসলামী ধারা-উপধারার আলোচনা এসেছে। কিন্তু সামনের ইতিহাস ও ঘটনাক্রম বর্ণনা করার জন্য ১৯৮৮সালের বিপ্লবোত্তর আলজেরিয়ার রাজনীতিক অঙ্গন দাঁপিয়ে বেড়ানো ধর্মীয় ও ধর্মহীন রাজনীতিক পার্টিগুলোর

আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। কারণ আলজেরিয়ার জিহাদের তৃতীয় আমলে মুসলিম দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং তার ফলাফলগুলোর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

আলজেরিয়ার রাজনীতিক চিত্রপটে ওই সময় মৌলিকভাবে তিনটি শক্তি সক্রিয় ছিলঃ

১) সেনাবাহিনীর প্রভাব ও কর্তৃত্বের অধীনে পরিচালিত ধর্মহীন ক্ষমতাসীন শক্তি।

২) ধর্মহীন বিরোধী দলগুলো, যেগুলোর মাঝে সব রকমের পশ্চিমা চিন্তাধারার অধিকারী দল অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৩) ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা, যেগুলোর মাঝে ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলো থেকে আরম্ভ করে সরকার সমর্থক, রাজপুষ্ট ও দরবারী সবধারার লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট

১৯৮২সালে জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের পক্ষ থেকে শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি ও আন্দোলন অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে গিয়ে থেমেছে, ১৯৮৮সালের স্বাধীনতার পরে সেখান থেকেই তা আবার অগ্রসর হতে শুরু করে। তাইতো রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করা মাত্রই জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রবীণ শাইখ আহমদ সাহনূনের নেতৃত্বে রাবেতাতুদ-দাওয়াহ নামক একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়, যাতে সমস্ত ইসলামিক দলকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসা যায়। সূচনা লগ্নে ওই কাউন্সিলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ছিলো:

১- জমিয়তুল উলামা আল-মুসলিমীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডক্টর আব্বাস মাদানী।

২- সালাফী চিন্তাধারার অধিকারী স্বাধীনচেতা মুবাল্লিগ শাইখ আলী বালহাজ।

৩- ইখওয়ানী চিন্তাধারার অধিকারী মাহফুজ নাহনাহ'র হারাকাতুল মুজতামায়িল ইসলামী। আব্দুল্লাহ জাবুল্লাহ'র হিযবুন্নাহযাতিল ইসলামিয়াহ।

৪- মালিক ইবনে নবীর চিন্তাধারার অধিকারী শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং আব্দুর রাযযাক রাযযাম, জামাআতুল বিনায়িল হাযারী।

৫- শাইখ মুস্তফা বু ইয়ালার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শাইখ আব্দুল কাদির শাবূতী এবং শাইখ সাঈদ মাখলুফী। হারাকাতুদ্দাওলাতিল ইসলামিয়াহ, যাকে হারাকাতুল ইসলামিয়াও বলা হয়।

৬- এছাড়া আরও কিছু ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রথমদিকে এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ছিলো চিন্তাধারা, চেতনা-বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি ও সংশোধন এবং সামাজিক অবস্থার আরও উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন। অতঃপর এ প্লাটফর্ম থেকে শাইখ ডক্টর আব্বাসী মাদানী একটি বিস্তৃত পরিসরে ইসলামী রাজনীতিক ফ্রন্ট খোলার আহ্বান জানান, যাতে আলজেরিয়ার ইসলামপন্থিরা একটি সুসংহত ও একতাবদ্ধ জাতিরূপে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই দাওয়াতে তাঁর সঙ্গে সালাফী শাইখ আলী বালহাজও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। তবে সিটি নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের পর তিনিও দাওয়াত কবুল করে নেন। কিন্তু ইখওয়ানী রাহবার মাহফুজ নাহনাহ এবং আব্দুল্লাহ জাবুল্লাহ শুরু থেকেই এই চিন্তার বিরোধিতা করতে থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করেন।

এভাবেই বিভিন্ন ইসলামীধারা ও ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট নামে আলজেরিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনীতিক ইসলামী দল গঠিত হয়।

এই জামাআত সমাজের বুকে দাওয়াত ও দ্বীনদারী প্রচারে বড় অবদান রাখে। যেহেতু এতে ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা ও চিন্তাকেন্দ্র এবং ব্যক্তিগতভাবে বড় বড় শাইখের অংশগ্রহণ ছিলো, এজন্য তাদের ইসলামিক রাজনীতিক ও সংশোধনমূলক প্রোগ্রামগুলোর প্রতি জনসাধারণের আস্থা ছিলো এবং জনগণের বিরাট অংশ তাদের পার্টিতে শরীক হয় তথা যোগদান করে।

সালভেশন ফ্রন্ট শুধু রাজনীতিক ময়দানেই অগ্রসর ছিলো না বরং সামাজিক ও আর্থনীতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন অঙ্গনে তারা সংস্কারমূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করে। অতঃপর অগ্রসর হয়ে সালভেশন ফ্রন্ট জনসাধারণকে দাওয়াত দেয়ার জন্য ইসলামী হুকুমতের সাধারণ খসড়াকে আবেগপ্রবণ আদলে পেশ করে। আর এটাও একটি বাস্তবতা যে, আলজেরিয়ার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্যান্য মুসলিম দেশের জনসাধারণের মতোই ইসলামপন্থিদের উপর অধিক আস্থাশীল ছিলো।

এভাবেই আলজেরিয়ার সর্ববৃহৎ রাজনীতিক দল হিসেবে সালভেশন ফ্রন্টের অভ্যুদয় ঘটে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

" সালভেশন ফ্রন্টের নামটা যেমন বৈপ্লবিক ছিল, তাদের কার্যকলাপও ছিলো তেমনি বৈপ্লবিক। তাদের মানহাজ ও কর্মপন্থা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঠিক ও স্পষ্ট ছিলো। হাকিমিয়্যাতের মাসআলার ব্যাপারে তাদের অবস্থান পুরোপুরি স্পষ্ট ছিলো যে, বর্তমান সরকার কাফির ও মুরতাদ। সালভেশন ফ্রন্ট যদিও বিশেষ কোনো চিন্তাকেন্দ্র, স্কুল অব থট বা বিশেষধারার আন্দোলনের অনুগামী ছিলো না, তবে সেখানে সালাফী প্রভাব প্রবল ছিলো এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলনমুখী কর্মপন্থা ছিলো। কেননা এই দলটি ইখওয়ানীধারাসহ আরও কয়েকটি আঞ্চলিক আলজেরীয় দলের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়। সালভেশন ফ্রন্ট বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, যারা একটি রাজনীতিক দলের অধীনে কাজ করার জন্য একত্রিত হয়েছিলো। "

ডক্টর আব্বাসী মাদানী

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ফ্রন্টের মানহাজ ও কর্মপন্থা পুরোপুরি ব্যতিক্রমী ছিলো। একদিকে ছিলেন শাইখ ডক্টর আব্বাস মাদানী। যিনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং প্রসিদ্ধ দাঈ। শাইখ আব্বাস মাদানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারি আমলেও তিনি দাওয়াতী ব্যস্ততা জারী রাখেন। তাই তো ১৯৮২সালে শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবির আন্দোলনে তাঁর নাম চলে আসে। অবশ্য তাঁকে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থি ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদের মাঝে গণ্য করা হতো এবং তাঁর বয়ানের ধরনও আপন সঙ্গী শাইখ আলী বালহাজের বক্তব্যের ধরন অপেক্ষা অধিক নম্র ছিলো। সালভেশন ফ্রন্টে তাঁর অংশগ্রহণ থেকেই ইসলামী জাগরণমূলক আন্দোলন আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে সামনে এসেছে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"আব্বাসী মাদানী নিজের সমস্ত বক্তব্য ও আলোচনায় হাকিমিয়াহ'র উপর জোরারোপ করতেন এবং হুকুমতের কুফরি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। এ ব্যাপারে

তাঁর মাঝে কোনো সংশয় বা সন্দেহ ছিলো না। আসলে তিনি জনসাধারণের ব্যাপারে এমনই আস্থা অর্জন করেন যে তিনি মনে করতেন, নিশ্চিতভাবে রাজনীতিক অঙ্গনে এই জনসমর্থন থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। ”

শাইখ আলী বালহাজ

শাইখ আব্বাসী মাদানীর তুলনায় তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো কিন্তু তাঁর অপেক্ষা অধিক নিয়মতান্ত্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী ছিলেন শাইখ আলী বালহাজ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে আইনপ্রণয়নের একমাত্র উৎস মনে করতেন এবং শরীয়ত বিরোধী আইনকে কুফরী ও ইলহাদ বলে আখ্যায়িত করতেন, যদিও তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই হোক না কেন। শাইখ আলী বালহাজ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন যে, তিনি গণতন্ত্রকে শুধুই একটি টেকনিক হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং গণতন্ত্র মূলগতভাবে কুফরী। গণতন্ত্রকে তিনি একের অধিক কুফরীর মিলনক্ষেত্র বলে মনে করতেন।

শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারেও তিনি নিজের প্রসিদ্ধ ফিকহী প্রবন্ধ ‘ফাসলুল কালাম ফিল খুরুজি আলাল হুক্কাম’ (শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা) রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি ঐ সময়ে ব্যাপক প্রচার ও বিতরণ করা হয়। তাঁর অবস্থান ছিলো, তিনি গণতন্ত্রকে কেবল এজন্যই গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, ফ্রন্ট বিরাট জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা অর্জন করবে এবং তারা নির্বাচনে এমন বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে যে, তারাই নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে রাজ করবে। তারাই আগামী দিনে দেশে সরকার পরিচালনা করবে এবং তারাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। অতঃপর তারা গণতন্ত্রকে প্রায় বিলুপ্ত ঘোষণা করে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে। এজন্যই আলজেরিয়ার সকল ইসলামপন্থি তাদের দাওয়াত কবুল করে নেয়। সালাফীদের মধ্যে যারা তাকফীর-প্রবণ, আর ইখওয়ানীদের মাঝে যাদের ঝোঁক গণতন্ত্রের প্রতি, সকলেই তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়।

তখন ইসলামপন্থিদের মধ্যে যে শাইখরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের বৈধতা ঘোষণা করেন তাদের মাঝে শাইখ আলী বালহাজের অবস্থান শরীয়তের সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে মনে হয়। কিন্তু এটাই সালভেশন ফ্রন্টের বিরোধিতাকারী গণতন্ত্রপূজারী ধর্মীয় ও ধর্মহীন বিভিন্ন দলের শক্ত দলীল হয়ে দাঁড়ায়। আর এ

কারণেই তারা সকলে মিলে সালভেশন ফ্রন্টের জয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে এবং সেনা অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানায়। তাদের কথা হলো, সালভেশন ফ্রন্টের এই বিজয় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা তো গণতন্ত্রকে শুধু এজন্যই মেনে নিয়েছে, যাতে করে তার বিলোপ সাধন করতে পারে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ শাইখ আলী বালহাজের ব্যাপারে বলেন-

"তিনি প্রসিদ্ধ আলেম ও বক্তা ছিলেন। হাজারো ব্যক্তি তাঁর সমচিন্তার ছিলো। লোকেরা তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে ছুটে আসে। তিনি শহরের নানা জায়গায় গমন করতেন এবং বড় বড় মসজিদে বয়ান করতেন। আমি তাঁকে নেককার ও সজ্জন মনে করি। তাঁর মাঝে বরকত সততা নিষ্ঠা এবং দ্বীনের আত্মমর্যাদাবোধ ছিলো। তিনি সালভেশন ফ্রন্টের প্রাণভোমরা ছিলেন। যদি তিনি এই ফ্রন্টে না থাকতেন, তাহলে ফ্রন্ট কিছুই করতে পারতো না। "

শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ

শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ বিন কাসেম আলওন্নাস কাবায়েলি এলাকার লোক ছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন এবং শুরু থেকেই দ্বীনদারীর ব্যাপারে ছিলেন প্রসিদ্ধ। তিনি দাওয়াতের ময়দানে বিপুল সক্রিয়তা দেখান। ১৯৮৮সালের বিপ্লবের সময় তিনি জামাআতুল বিনায়িল হাযারি'র প্রধান ছিলেন। সালভেশন ফ্রন্ট গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় ডক্টর আব্বাস মাদানী এবং শাইখ আলী বালহাজ গ্রেফতার হবার পর ফ্রন্টের তৃতীয় শীর্ষস্থানীয় রাহবার হিসেবে তিনি সামনে আসেন।

যখন আলজেরিয়াতে পুরোদমে জিহাদ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ নিজের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক লোক সহকারে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ'র অধীনে মুজাহিদদের মধ্যকার ঐক্যজোটের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৫সালে কট্টরবাদী ও পথভ্রষ্ট মুজাহিদরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রতারণা করে তাঁকে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর রহম করুন! আর মুসলিম উম্মতকে কট্টরপন্থি তাকফীরিগোষ্ঠীর অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন! আমীন! !

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদকে আমি নেককার, একজন সুশিক্ষিত, আলিমে দ্বীন ও দাঈ মনে করি। "

শাইখ আব্দুল কাদির শাবূত্বী

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ মুজাহিদীনের মাঝে তিনি অন্যতম। শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে শরীক ছিলেন। শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা গ্রেপ্তারের পর তিনি পালিয়ে যান। দীর্ঘ সময় সরকার থেকে আত্মগোপন করে পাহাড়ে পাহাড়ে ও গ্রামে গঞ্জে তিনি অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সরকার তাঁর কথা ভুলে যায়। "

ইখওয়ানীধারার সংগঠনসমূহ

সালভেশন ফ্রন্টের বাইরে গণতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে ইখওয়ানীরা পৃথক পৃথক রাজনীতিক দল গঠন করে। ১৯৮৮সালের রাজনীতিক স্বাধীনতার পর আলজেরিয়াতে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দুইটি সংগঠন সক্রিয় ছিলো।

• বৈশ্বিক ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আলজেরীয় শাখার প্রধান মাহফুজ নাহনাহ 'হারাকাতুল মুজতামায়িল ইসলামী' (ইসলামী সমাজ আন্দোলন)[২৫]নামে একটি দল গঠন করেন। সালভেশন ফ্রন্ট গঠনের সময় তিনি কেবল অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সালভেশন ফ্রন্টের উপর আপতিত কঠোর পরীক্ষা ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও জীবনভর তিনি এই ফ্রন্টের বিরোধিতা করেন। এছাড়া তিনি মুজাহিদীনের কঠোর বিরোধীদের মাঝেও রয়েছেন। ২০০২সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

• অপরদিকে আঞ্চলিক ইখওয়ানীদের রাহবার আব্দুল্লাহ জাবুল্লাহ 'আন-নাহদ্বাতুল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামী রেনেসাঁ পার্টি) নামে আলাদা দল গঠন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ইখওয়ানী ও আঞ্চলিক আলজেরীয় ইসলামী জাগরণমূলক

---

[২৫] শাইখ আবু মুসআব সূরী এই আন্দোলনের নাম বলেছেন 'হারাকাতু মুজতামায়িস সালাম' বা শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন। আর উইকিপিডিয়াতে রয়েছে যা আমরা মূল কিতাবে উল্লেখ করেছি।

আন্দোলনের মিলিত রূপ ছিলো। কিন্তু তিনিও সালভেশন ফ্রন্টের এবং মুজাহিদদের বিরোধিতা করেন। তবে তিনি সরাসরি বিরোধিতা করার পরিবর্তে রেখে ঢেকে বিভিন্ন শব্দচয়ন ও বাক্য ব্যবহার করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিভাবে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে যায়।

ইখওয়ানীধারার এই দু'জন নেতা শেষ সময় পর্যন্ত আলজেরিয়াতে ঘটে চলা সমস্ত রক্তপাত ও খুন-খারাবির দায় বরাবরই ডক্টর আব্বাস মাদানী, শাইখ আলী বালহাজ ও সালভেশন ফ্রন্টের উপর চাপাতেন।

উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মহীন দলসমূহ

ধর্মহীন পার্টিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টি তো স্বয়ং ক্ষমতাসীন দল 'জাবহাতুত-তাহরীরিল ওয়াত্বানী' (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট)ছিলো। দলটি ৪০বছরেরও অধিক সময় যাবত আলজেরিয়াতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন জারী রেখেছিলো। এছাড়া অন্যান্য ধর্মহীন পার্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

• জাবহাতুল ক্বাওয়া আল-ইশতিরাকিয়্যাহ (সোশ্যালিস্ট ফোর্সেস ফ্রন্ট)। আয়াত আহমদ তার নেতৃত্বে ছিলেন। নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের জয়লাভের পর দলটি সালভেশন ফ্রন্টের বিপক্ষে মিছিল করে। সেই মিছিল ও বিক্ষোভে দলটি সরকার ও পশ্চিমা শক্তিগুলোকে ইসলামী মৌলবাদীদের ব্যাপারে সতর্ক ও হুশিয়ার করে দেয়।

•হিযবুত-তাজাম্মু মিন আজকিস সিকাফতি ওয়াদ দিমুক্বারাতিয়্যাহ (Rally for Culture and Democracy)। এটি ইসলামপন্থিদের তীব্র বিরোধী একটি দল। দলটি আলজেরিয়ার সমাজ থেকে ইসলামপন্থিদের উচ্ছেদ এবং রাজনীতিক কার্যকলাপের উপর পুরোপুরি বিধি-নিষেধ আরোপের আহ্বান জানাতো। এই দলের প্রধান সাঈদ সাদী ছিলেন।

• সমাজতান্ত্রিক দল যার প্রধান ছিলেন খাতুন লবীযা হানূন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নির্বাচন এবং সেনা অভ্যুত্থান

ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা এবং রাজনীতিক দলগুলো নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা পুনরায় ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম তুলে ধরছি।

প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৮৯ সাল)

১৯৮৮সালের রাজনীতিক স্বাধীনতার পর পূর্বের কথা মতো ১৯৮৯সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, সালভেশন ফ্রন্ট ক্ষমতাসীন দলসহ অন্যসকল ধর্মীয় ও ধর্মহীন দলগুলোর উপর ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করেছে। আলজেরিয়ার ৪৮টি প্রদেশের মধ্যে ৩২টি প্রদেশেই ফ্রন্ট জয়লাভ করে। প্রাদেশিক দায়িত্ব হাতে নেয়ার পরপরই সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে জনসেবামূলক কাজ করতে আরম্ভ করে, দীর্ঘদিন ধরে আলজেরিয়াতে যার অভাব ছিলো। এতে সালভেশন ফ্রন্টের আরও অধিক জনসমর্থন অর্জিত হয়। প্রাদেশিক বিজয় ও জনসমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ফ্রন্ট পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়।

ইসলামপন্থিদের মুক্তি লাভ (১৯৯০ সাল)

দল গঠনের সময় থেকেই ফ্রন্ট পুরোপুরি জনসমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে আসছিলো। দলটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণিকে নিজের এজেন্ডা অনুযায়ী সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এরই ভিত্তিতে দলের উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিলো, আশির দশকে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যেসকল ইসলামপন্থিকে সাজার রায় দেয়া হয়, তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। সুতরাং জনসাধারণের চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট চাডলি বেন্ডজেদিদ সরকারি ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ক্ষমা অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই ১৯৯০সালে বহু ইসলামপন্থিসহ শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র জামাআতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বন্দিদেরকেও মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন শাইখ মানসুরি আল-মিলয়ানী।

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর বু ইয়ালা'র জামাআত সম্পৃক্ত রুকনরা চাচ্ছিলেন, তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে সুবিন্যস্তভাবে সামরিক কার্যক্রম আরম্ভ করবেন। কিন্তু ইসলামিক রাজনীতিক কার্যক্রমের ভেতরে সে কাজ সম্ভবপর হয়নি।

সালভেশন ফ্রন্টের আহূত গণহরতাল (মে ১৯৯১ সাল)

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, এতদিনে সারাদেশে ইসলামপন্থিদের সক্রিয়তা উত্তুঙ্গে আরোহণ করে। প্রাদেশিক নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয়ের পর যখন সরকারের মনে কঠিন শঙ্কা জাগ্রত হয়, তখন সালভেশন ফ্রন্টের বিরুদ্ধে মারমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে সরকার। এর মাধ্যমে তারা নেতৃবৃন্দকে টার্গেট বানাতে আরম্ভ করে। ফলে ফ্রন্টও বিভিন্ন সভা-সেমিনার, হরতাল ও বিক্ষোভের ধারাবাহিক কর্মসূচি আরম্ভ করে। কয়েকটি মিছিলে তো প্রায় লক্ষাধিক জনগণ অংশগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ মিছিলে সালভেশন ফ্রন্টের পক্ষ থেকে যেটা ঘোষণা করা হয় তা হলো ২৫ই মে ১৯৯১সালের গণহরতাল। জনসাধারণ সড়কে অবস্থান করতে শুরু করে। লোকেরা রাজধানীর সাহাতুশ-শুহাদা, সাহাত আউয়াল নুফিমবারসহ বিভিন্ন এলাকার প্রাঙ্গনগুলোতে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নেয়। যাহোক, এভাবেই সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এই হরতাল, অসহযোগ আন্দোলনের ন্যায় ছিলো। হরতালে সেনাবাহিনী জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করে এবং হাজারো লোক শাহাদাত বরণ করেন।

সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারি

এসব ঘটনার পর সরকারের সঙ্গে সালভেশন ফ্রন্টের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রেফতার আরম্ভ করে। সালভেশন ফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় দুই ব্যক্তি ডক্টর আব্বাসী মাদানী এবং শাইখ আলী বালহাজকে দলের কর্মীদের পক্ষ থেকে কোনোপ্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীর সমাবেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, সালভেশন ফ্রন্টের মজলিসে শুরা শাইখ আব্বাসী মাদানী কর্তৃক বাধা প্রদান ও মুকাবেলায় যাবার নির্দেশ অমান্য করেছিলো। শাইখ আব্বাসী মাদানীর ব্যাপারে বলা হয় যে, গ্রেফতারের সময় যখন তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীরা পরামর্শ দিচ্ছিলো, আপনি পালিয়ে যান, তখন তিনি তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, আমি চোরের মতো পালিয়ে যেতে পারবো না;আমি তাদের নেতা, তাদেরকে ছেড়ে যাবো না।

সে সময় শাইখ মাদানীর সহকারী শাইখ আলী বালহাজ আরও আশ্চর্যজনকভাবে টিভি স্টেশন অভিমুখে রওয়ানা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তিনি নিজের গ্রেফতারি

ও নির্বাচন বিষয়ে সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এই সুধারণার বিনিময়ে সরকার তাকে ১৪বছরের কারাদণ্ড দেয়। এসবের মাধ্যমে মুজাহিদীনরা আরও অধিক সমর্থন লাভ করে এবং একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শক্তি ছাড়া পরিবর্তন আসতে পারে না।

সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের কতক সদস্য, যারা সরকারের কূটচাল অনুমান করতে পেরেছিলেন, তারা প্রথমেই পালিয়ে যান। তাদের মাঝে ছিলেন শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং শাইখ আব্দুল কাদির শাবূতী।

কিমার অপারেশন (নভেম্বর ১৯৯১ সাল)

এসব গ্রেফতারির পরে পুরোদমে সশস্ত্র প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। যদিও বড় পরিসরে জিহাদের সূচনা ১৯৯২সালের সেনাঅভ্যুত্থানের পর হয়েছিলো, কিন্তু সেনা বিপ্লবের আগে অতি প্রসিদ্ধ অপারেশনগুলোর মাঝে ছিলো কিমার অপারেশন।

একুশে নভেম্বর ১৯৯১সালে ওয়েদ সৌফের অন্তর্গত কিমার শহরের সেনাক্যাম্পে আফগান ফেরত আলজেরিয়ান মুজাহিদ আবু সিহাম আফগানীর কমান্ডে মুজাহিদীনরা হামলা করেন। মুজাহিদ **আব্দুর রহমান কিমারী** মে ২০০০সালে নিজের রেকর্ডকৃত বক্তব্যে কিমার অপারেশনের ব্যাপারে বলেন-

“যখন আমাদের কাছে আবু সিহাম আসেন এবং তিনি জিহাদের জন্য উৎসাহিত যুবকদেরকে পেয়ে যান, তখন আমরা অপারেশনের জন্য লিবিয়া থেকে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে এবং অস্ত্রাদি ক্রয় করতে আরম্ভ করি। কিন্তু যখন সীমান্তবর্তী সেনাক্যাম্প কিমারে আক্রমণের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়, তখন শাইখ উমর লাযআর রহিমাহুল্লাহ যিনি সালভেশন ফ্রন্টের পক্ষ থেকে কিমার এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসার দাবি জানান। তিনি ১৫দিন পূর্বেই আবুল হোসাইন কিমারীর গৃহে অপর কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সামরিক কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি নিজেই অপারেশন সফল করার অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও বাইয়াত দিয়ে রেখেছিলেন।

কিমার সেনাক্যাম্পের এই অপারেশন অপর ১৩টি অপারেশনের মধ্য থেকে একটি ছিলো মাত্র। অন্যগুলো কাছাকাছি সময়ের ভেতরেই হয়েছিলো। অন্যান্য অপারেশনের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

• আবু আনাসের নেতৃত্বে টেলমসান প্রদেশে অপারেশন,

• আবু সারিয়াহ'র নেতৃত্বে তিয়ারেত প্রদেশ, মাস্কার প্রদেশ ও রাজধানীর অপারেশন,

• আহমদ আল-উদ্দের নেতৃত্বে উয়ারগলা প্রদেশ, হাসি মেসাউদের শহর এবং টেবেস্‌সা প্রদেশের অপারেশন,

• এমনই আরও কিছু এলাকার অপারেশন রয়েছে, যেগুলোর কথা আমি ভুলে গেছি।

যাহোক, কিমার সেনাক্যাম্পের অপারেশন আমরা সম্পন্ন করি এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাফল্য দান করেন। ৫০টি ক্লাশিনকোভ এবং প্রচুর পরিমাণে গুলি গনীমত হিসেবে আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের তিনজন সঙ্গী আহত হন।

স্মরণ রাখা চাই, আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়, ক্যাম্পের ভেতর কোন সেনাকে যেন হত্যা করা না হয়। কারণ এটি প্রথম অপারেশন ছিলো এবং আলজেরিয়ার সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যেরই জিহাদ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। এতদসত্ত্বেও ছ'জন সৈন্যকে হত্যা করতে হয়। তারা আমাদের সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলো। ”

এই ঘটনার জন্য সরকার সালভেশন ফ্রন্টকে দায়ী করে।

পার্লামেন্ট নির্বাচন (ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল)

প্রাদেশিক নির্বাচনে যখন সরকার আশঙ্কা অনুভব করে, তখন সালভেশন ফ্রন্টের কর্মতৎপর রুকন ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারির পাশাপাশি এমন নির্বাচনী কানুন জারী করে, যার দরুন সালভেশন ফ্রন্ট সেসকল প্রদেশে জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে, যেগুলোতে তাদের সমর্থকগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ছিলো।

কিন্তু গ্রেফতার, কানুনী চালবাজি, কিমার সেনাক্যাম্পের অপারেশনের অপবাদ সত্ত্বেও ২৬ডিসেম্বর ১৯৯১সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফায় সালভেশন ফ্রন্ট ৫৩লক্ষের (৫.৩ মিলিয়ন) অধিক ভোট এবং ২৩১টি আসনের মধ্যে ১৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়, যা ছিলো মোট আসনের ৮২শতাংশ।

এই ঐতিহাসিক ভূমিধ্বস বিজয়ের মাধ্যমে যখন দ্বিতীয়বারের মত সালভেশন ফ্রন্টের সাফল্য প্রস্ফুটিত হয় এবং ক্ষমতায় তাদের যাবার পথ নিশ্চিতভাবেই উন্মুক্ত হয় তখন অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলসহ অন্যান্য ধর্মহীন পার্টিগুলো পূর্ব-পশ্চিমে বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ফ্রান্সের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ একথা পর্যন্ত বলে যে,

"ইসলামপন্থাদের ক্ষমতায় যেতে বাধা দেবার জন্য ফ্রান্স প্রয়োজনে নিজের সেনাবাহিনী নামিয়ে দিতে পারে। "

এমন পরিস্থিতিতে সালভেশন ফ্রন্টকে আটকাতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর সামনে একটাই পথ ছিলো, আর তা হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থান।

সামরিক অভ্যুত্থান (জানুয়ারি ১৯৯২ সাল)

সালভেশন ফ্রন্টের জয়ের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর আগে থেকেই অনুমান ছিলো এবং পূর্ব থেকেই তারা যেকোনো পরিস্থিতি মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিলো। সেনাবাহিনীর কাছে সর্বশেষ সমাধান ছিলো সড়কে ট্যাংক নামিয়ে আনা। অর্থাৎ নির্বাচনের পরে অভ্যুত্থান হয়েছেও তাই। ১৯৯২সালের জানুয়ারিতে আলজেরিয়ান সেনাবাহিনীর চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট সেডলি পূর্বের এসেম্বলি ভেঙ্গে দিয়ে নিজে ইস্তফা নেন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিক কার্যক্রম বন্ধ করার অধিকার তার ছিলো না।

অতঃপর সেনাবাহিনীর তাবেদার সুপ্রিম সিকিউরিটি কাউন্সিল নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে এবং বেআইনিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পাঁচসদস্য বিশিষ্ট সুপ্রিম স্টেট কাউন্সিল গঠনের ঘোষণা দেয়। এই কাউন্সিলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল খালেদ নেযারও ছিলেন। জানুয়ারিতেই এই কাউন্সিলের অপর একজন সদস্য এবং প্রাক্তন জেনারেল মুহাম্মদ বু যাইয়াফকে দেশের বাইরে থেকে ডেকে এনে জনসাধারণের মতামত না নিয়েই প্রেসিডেন্টের আসনে বসানো হয়। জেনারেল

মুহাম্মদ বু যাইয়াফ আসার পর তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী অবস্থা জারী করেন এবং সমস্ত রাজনীতিক দল ভেঙ্গে দেন। আর মার্চ মাসে সালভেশন ফ্রন্টকে ভেঙ্গে না দিয়ে তা পুরোপুরি অবলুপ্ত ঘোষণা করে দেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনীতিক আইন পরিবর্তন সত্ত্বেও সালভেশন ফ্রন্টের ব্যাপারে উপর্যুক্ত নিষেধাজ্ঞার আইন এখন পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

মরু কারাগার

ইমারজেন্সি বা জরুরী অবস্থা জারী করার পর মিটিং মিছিল ও সভা সেমিনারও নিষিদ্ধ করা হয়। সারাদেশে সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে বড় পরিসরে গ্রেপ্তারির ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়। এমনকি কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামপন্থিদেরসহ ৫০হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মাঝে বহু সাধারণ নাগরিকও ছিলো।

পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এবং গণতন্ত্রকে পদদলিত করে সামরিক সরকার এই হাজার হাজার ইসলামপন্থি বন্দিদেরকে আলজেরিয়ার সর্ববৃহৎ মরু অঞ্চলে অবস্থিত রেগেনি ও ইন আমগুয়েলের মত জেলখানাগুলোতে আটক করে রাখে। সেখানে তাদের উপর এমন নির্যাতন চালানো হয় যে, পশ্চিমা মানবাধিকার সংস্থাগুলো পর্যন্ত শিউরে ওঠে। অতঃপর এই ঘটনা আলজেরিয়াতে জিহাদের নতুন যুগ সূচনার কারণ হয়;এমন এক যুগ, যার সূচনা ছিলো বিপুল আশা জাগানিয়া, কিন্তু যার সমাপ্তি ঘটে ভয়ানক রক্তপাতের মাধ্যমে। কয়েক হাজার নিরীহ মুসলিম নাগরিক সেই নির্মমতার শিকার হয়। [২৬]

যাহোক, ফ্রান্স ও পশ্চিমা শক্তিগুলো সামরিক শাসনকে স্বাগত জানিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক মহানুভব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে এবং প্রমাণ করে যে, পশ্চিমা শক্তিগুলো কোনো অবস্থাতেই ইসলামী শাসন ও শরীয়ত বাস্তবায়ন মেনে নিতে পারে না;এর জন্য তাদের নিজেদেরই তৈরি গণতান্ত্রিক মূলনীতিগুলো পদদলিত করতে হোক না কেন।

[২৬] শাইখ আবু মুসআব সূরী আড়াই লক্ষ নিরীহ মুসলমান হত্যার কথা লিখেছেন। সম্ভাবনা রয়েছে, এটি সমষ্টিগত সংখ্যা অর্থাৎ মুজাহিদীন, মুরতাদ শত্রুপক্ষ এবং জনসাধারণ সবাইকে নিয়ে আড়াই লক্ষ হবে; শুধুই নিরীহ জনসাধারণের সংখ্যা এটা নয়। কিন্তু তারপরেও এই বর্ণনায় অতিশয়তা চোখে পড়ে। কারণ ১৯৯৭ সালে GIA'র হাতে সংঘটিত সকল গণহত্যা কর্মকাণ্ডে নিহত লোকসংখ্যা উইকিপিডিয়া মুতাবেক ২৯০০, যেমনটা আমরা সামনে উল্লেখ করবো।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ (১৯৯২ সাল) প্রতিরোধ ও জিহাদের দ্বিতীয় যুগ

কিমার সেনাক্যাম্পের অপারেশন থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ওই সময়ে জিহাদের সূচনা গণ-হরতালের পর ১৯৯১সালের নভেম্বর মাসে হয়েছিলো। সামনে কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং আফগান ফেরত মুজাহিদীনের কার্যক্রম থেকে এই বাস্তবতা আরও প্রতীয়মান হয়ে উঠবে যে, শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনের পর থেকে যদিও আলজেরিয়ায় সশস্ত্র কর্মকাণ্ড কখনও ঘটে নি, কিন্তু জিহাদের মাধ্যমে অন্যায়মূলক নেজামের পরিসমাপ্তি ও শরীয়ত বাস্তবায়নের চিন্তা আলজেরিয়া থেকে কখনোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

অবশ্য লড়াইয়ের মাঝে তীব্রতা ১৯৯২সালের জানুয়ারি মাসের ওই সময় এসেছে, যখন নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা আসার পর সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এ যেনো নির্বাচন বাতিল করার পর সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়ার দ্বারা জনমনে তৈরি হওয়া জিহাদের বৈধতার উপর তাগুতগোষ্ঠী মোহর এঁটে দেয়। অতএব, তা আর পরিবর্তন হবার ছিলো না। এই লড়াইয়ের তীব্রতা শেষ পর্যন্ত ২০০২সালে গিয়ে থামে, যখন পথভ্রষ্ট মুজাহিদদের প্রসিদ্ধ আমীর আনতার যাওয়াবেরীকে হত্যা করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই ১০বছরের ইতিহাস উল্লেখ করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সালভেশন ফ্রন্ট থেকে সালভেশন ফোর্স পর্যন্ত

সরকার যখনই সালভেশন ফ্রন্টকে অবলুপ্ত ঘোষণা করে, তখনই ফ্রন্ট দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী একদল যারা দেশের বাইরে আশ্রয় নেয়। তারা ‘আল-হাইআতুত-তানফীযিয়্যাহ লি জাবহাতিল ইনক্বায ফিল খারিজ’ (প্রবাসে সালভেশন ফ্রন্ট নির্বাহী সংস্থা) নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতিক কার্যক্রম আরম্ভ করে দেয়। তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনা-পাল্টা আলোচনায় ব্যস্ত থাকে। অথচ এই গ্রুপের সম্পর্ক ও যোগাযোগ গ্রেপ্তার শীর্ষস্থানীয় দুই নেতা ডক্টর আব্বাসী মাদানী ও শাইখ আলী বালহাজের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও তাদের নামে নির্বাহী কাউন্সিল বিভিন্ন নির্দেশনা জারী করতে থাকে।

এর বিপরীতে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সদস্যদেরকে দুই গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। একভাগে থাকে গ্রেপ্তার হওয়া সদস্যগণ;যাদের অধিকাংশই দেশের বাইরে অবস্থানরত গ্রুপের বিপরীতে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী মনোভাবের কারণে গ্রেফতার হয়েছিলেন। অপর অংশে ছিলো সেসব সদস্য যারা গ্রেপ্তারি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কার্যত তারা এখন দেশের অভ্যন্তরে সালভেশন ফ্রন্টকে নেতৃত্বদানের বৈধ কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মাঝে ছিলেন শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ, শাইখ আব্দুল কাদের শাবূতী, শাইখ সাঈদ মাখলুফী এবং শাইখ আব্দুর রাযযাক রাজ্জাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। দেশের অভ্যন্তরে সরকারি গ্রেপ্তারি বাঁচিয়ে পালিয়ে থাকা স্বাধীন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে; না গ্রেপ্তার নেতৃবৃন্দের নির্বাহী কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাচ্ছিলো আর না প্রবাসে অবস্থানকারী নেতৃবৃন্দের, কারণ তাদের তো আলজেরিয়ার সঙ্গে অবস্থানগত কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আল-হিসবা ফোরামকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন-

“আলী বালহাজ ও আব্বাসী মাদানী গ্রেফতার হওয়ার পর আব্দুল কাদের হাশশানী ফ্রন্টের আমীর নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও গ্রেপ্তার হন। অতঃপর ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মাঝে মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। যারা সরকারের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে রাজী ছিলো, তারা খালিয়াতুল আযমাহ (জরুরী অবস্থায় নির্বাহী কমিটি) গঠন করে। নেতৃবৃন্দের এটি ছিলো একটি সাময়িক কর্তৃপক্ষ, যার প্রধান নিযুক্ত হন শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ। শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি অ্যাকশনে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো, জিহাদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। তিনি কিছুতেই পেছনে সরে আসতে রাজী ছিলেন না। ফ্রন্টের প্রধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের বিশেষ জামাআতেরও প্রধান ছিলেন, যা আল-জাযআরাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। পরবর্তীতে দু'দল একীভূত হওয়ার পর তিনি আল-ফিদা ব্রিগেড গঠন করেন। ”

শাইখ মুহাম্মদ সাঈদের নেতৃত্বে সালভেশন ফ্রন্টের স্বাধীন নেতৃত্ব ইসলামিক সালভেশন ফোর্স নামে একটি সামরিক ফ্রন্ট গঠন করে এবং সালভেশন ফ্রন্টেরই মাদানী মিরযাককে তার প্রধান নিযুক্ত করা হয়। সালভেশন ফোর্স গঠনের সময় তাদের চিন্তাধারা সালাফী জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি ছিলো। তারা গণতন্ত্রকে

এমন একটি ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো, যেদিকে দ্বিতীয়বার পা বাড়ানোর চিন্তাই করা যায় না।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“যখন মুজাহিদদের মাঝে আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মুসাল্লাহাহ নামে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ'র নেতৃত্বে ঐক্য সাধিত হয়, তখন শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ ঐক্যের অঙ্গীকারপত্রের উপর সালভেশন ফ্রন্টের নামেই স্বাক্ষর করেন, কারণ কার্যত তিনিই সে সময় ফ্রন্টের প্রধান ছিলেন।

কিন্তু ফ্রন্টের ভেতর সে সময় তাঁর নিজের জামাআত আল-জাযআরাহ'র কিছু সদস্যসহ আরও কিছু লোক কেবল ঐক্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করে নি, বরং তারা এ বিষয়ে আপত্তি তোলে যে, শাইখ সাঈদ তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের দাবি ছিলো, তিনি কেবল নিজের দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন;ফ্রন্টের নয়। ”

এভাবেই মাদানী বু মিরযাকের নেতৃত্বাধীন সালভেশন ফোর্স সালভেশন ফ্রন্টের সর্বশেষ আমীর শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের নেতৃত্ব এবং আল জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহা বা GIA—উভয় দল থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, লড়াই শুধু দ্বিতীয় বার নির্বাচনী প্রক্রিয়া বহাল করার লক্ষ্যে হবে। এ যেন সালভেশন ফোর্স সালভেশন ফ্রন্টের প্রবাসী লিডারশিপের অধীনে দলের এক রকম সামরিক ক্যাডার বাহিনী হয়ে গিয়েছিলো। মাদানী বু মিরযাক ছাড়াও সালভেশন ফ্রন্টে সেই সময় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন মোস্তফা কাবির। তিনি প্রবাসী নেতৃবৃন্দের প্রধান রাবিহ কাবিরের ভ্রাতা ছিলেন।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, ঐক্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে রাবিহ কাবিরের বড় ভূমিকা ছিলো। ”

সালভেশন ফ্রন্টের অধিকাংশ কার্যক্রম ও তৎপরতা পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে ছিলো।

যাই হোক, একদিকে মরু কারাগারগুলোতে ইসলামপন্থিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, অপরদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো। এমনকি তা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। পাহাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী

সদস্যরা অস্ত্র সংগ্রহ করে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়। তাদের মাঝে এমনও সদস্য ছিলো, যারা পূর্ব থেকেই আলজেরিয়ার তাগুতি সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে উৎসাহী ছিলো; আবার এমনও লোক ছিলো, যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলো, যাতে সরকারকে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য করা যায়। এভাবেই সারাদেশে যেখানে রাজনীতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তারই মাধ্যমে সশস্ত্র কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আফগান ফেরত মুজাহিদীন

আশির দশকে আলজেরিয়ান যুবকদের মাঝে জিহাদের প্রতি আগ্রহীরা আফগানিস্তানে গমন করে তথায় আফগান সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এবং আলজেরিয়াতে জিহাদের ক্ষেত্র তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যদিও তারা কোনো একক সংগঠনের অধীনে কাজ করেনি, কিন্তু সকলে মিলে একটি স্বতন্ত্র চিন্তার প্রতিনিধিত্ব ঠিকই করতো। আর প্রকৃতপক্ষে শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ'র আন্দোলনের পর আলজেরিয়াতে নির্বাচনের পূর্বে জিহাদ আরম্ভ করার পক্ষে তারাই ছিলো। তাদের মাঝে কারও কারও সম্পর্ক আফগানিস্তানে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র অতিথি কেন্দ্রের সঙ্গে, আবার কেউ কেউ ছিলেন; যারা অন্য সে সকল জামাআতের সদস্য হিসেবে কাজ করছিলেন, যেগুলো আলজেরিয়াতে জিহাদ আরম্ভের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত ছিলো। তাদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষুদ্র জামাআত সবিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

- দক্ষিণ আলজেরিয়াতে **আবু সিহাম আফগানি** রহিমাহুল্লাহ'র জামাআত

আবু সিহাম আফগানীর প্রকৃত নাম **আব্দুর রহমান দুহান** ছিলো। তিনি ওউলেড জেলালাল নামক আলজেরিয়ার বিসক্রা প্রদেশের একটি শহর থেকে এসেছিলেন। তিনি আলজেরিয়ান সেনাবাহিনীতে স্পেশাল কমান্ডো ফোর্সে ৭বৎসর পর্যন্ত কাজ করেছেন। অতঃপর আফগানিস্তানে গিয়ে কুররাম এজেন্সিতে অবস্থিত শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র 'সাদী' প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মিলিটারি টেকনিকেল সায়েন্সের প্রশিক্ষক হয়ে যান। তিনি নির্বাচনের আগেই ১৯৯১সালের নভেম্বর মাসে পরিকল্পিত প্রসিদ্ধ কিমার সেনাক্যাম্প অপারেশনের কমান্ডার ছিলেন, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সেই অপারেশনের কিছুকাল পরেই এক সংঘর্ষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

• পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা ট্রেলমসানে **আবু আনাস** রহিমাহুল্লাহ'র বাহিনী। যিনি ১৯৯৪সালে শাহাদাত বরণ করেন।

• পশ্চিম আলজেরিয়ার এলাকা সিদি বেল আব্বেস-এ ব্রাদার আব্দুল মাজীদ রহিমাহুল্লাহ, যিনি রাজধানীতে[২৭] শাহাদাত বরণ করেন।

• পশ্চিম আলজেরিয়ার অপর একটি এলাকা এল বায়াধে ব্রাদার আবু আউফ রহিমাহুল্লাহ। তিনিও রাজধানীতে শহীদ হন।

• মধ্যাঞ্চলীয় এলাকা মসীলায় সালাহুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ উমর রহিমাহুল্লাহ'র বাহিনী। এই উভয় শাইখ আল-জামাতুল ইসলামিয়া আল-মুসাললাহা বা GIA 'র মজলিশে শুরার রুকন ছিলেন। উভয়েই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সালাহুদ্দিন রহিমাহুল্লাহ জামাআতের অধীনে ওয়ার্কশপের জিম্মাদারও ছিলেন। অপরদিকে শাইখ উমর মসীলা এলাকা ও মেহমানখানাগুলোর আমীর ছিলেন। উভয়েই ১৯৯৬সালে শাহাদাত বরণ করেন।

• মধ্য আলজেরিয়ার এলাকা মসীলা থেকে ব্রাদার আবুল লাইস রহিমাহুল্লাহ, যিনি ১৯৯৭সালে কট্টরপন্থিদের হাতে নিহত হন।

• রাজধানী আলজিয়ার্সে ব্রাদার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহিমাহুল্লাহ, যিনি মুরতাদ সরকারের হাতে বন্দি হন এবং পরবর্তীতে তাঁকে সারকাজী জেলে সংঘটিত গণহত্যার ঘটনায় মুরতাদগোষ্ঠী শহীদ করে দেয়।

• আর তাদের সবার মাঝে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ। যিনি ১৯৮৭সালে শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ'রও পূর্বে জিহাদের সুদূরপ্রসারি প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

---

[২৭] মুজাহিদ আবু আকরাম রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন যে, "তিনি 'জাযায়েরে' শহীদ হন"। এ কথার দুটো অর্থ হতে পারে। যেহেতু আরবীতে আলজেরিয়া গোটা রাষ্ট্রের নাম এবং রাজধানীর নাম অভিন্ন তথা জাযায়ের, এজন্য এখানে রাজধানী কথাটা লিখেছেন।
দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে। যেহেতু তিনি সেখানকার পরিবর্তে আলজেরিয়ায় এসে শহীদ হয়েছেন, তাই এখানে উদ্দেশ্য মূল দেশের নাম। তবে আগে-পরে দেখে বোঝা যায়, এই অর্থ ঠিক হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
{পুনশ্চ আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দুটো নাম আলাদাভাবে পারিভাষিক রূপ পেয়েছে। দেশের নাম আলজেরিয়া এবং রাজধানীর নাম আলজিয়ার্স।—অনুবাদক}

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র কার্যক্রম ও সক্রিয়তা

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ'র আন্দোলনের আলোচনার সঙ্গে গত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি যখন আলজেরিয়ান সমাজকে জিহাদের জন্য অপ্রস্তুত দেখতে পেলেন, তখন জিহাদের প্রস্তুতির নিয়তে ইলম অর্জনের জন্য হিজাযের পুণ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে শাইখুল মুজাহিদীন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ইলম অর্জনের পর কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ ১৯৮৫সালে জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান গমন করেন। সেখানে তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র মজলিসে শুরার রুকনও ছিলেন।

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র মধ্যকার যোগাযোগ ও সম্পর্ক

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র আলজেরিয়া বিষয়ক অডিও আলোচনা থেকে জানা যায়, তিনি ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে যখন দ্বিতীয়বারের মত আলজেরিয়াতে প্রবেশ করেন, তখন পর্যন্ত কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে সাক্ষাৎ ঘটেনি। কারণ কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে অবস্থান করছিলেন আর এদিকে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ রাজধানীতে ছিলেন। তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিলো কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র ব্যাপারে তাঁর অডিও রেকর্ড এবং আল-হিসবা ফোরামকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্যের খোলাসা কিছুটা নিম্নরূপঃ

❝কারী সাঈদ বিশারি রহিমাহুল্লাহ মদীনার আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করেছিলেন। তিনি একজন যোগ্য নেতা এবং বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি আমার শাইখদের অন্যতম। যখন আমি আফগানিস্তানে আসি, তখন তাঁর সম্মুখে শিষ্যের ন্যায় বসি। আলেমের পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত নেককার ও সজ্জনও ছিলেন। আমি তাঁর মত আলজেরিয়ান ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। তিনি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গেও ছিলেন। আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহা বা GIA'র আমীর শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ

জেল থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই তাঁকে ডেকে পাঠান, যাতে তিনি তাঁর নিকটবর্তী মধ্যাঞ্চলীয় এলাকায় থাকেন। বরং আবু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র কতক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সূত্রে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ'র অভিপ্রায় ছিলো, জিহাদের নেতৃত্ব তিনি তাঁর কাছে অর্পণ করবেন। কিন্তু এর আগেই কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। উভয়ই আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। ”

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সহযোগিতা

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানের জিহাদে থাকা কালেই শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, যেন তিনি আলজেরিয়াতে জিহাদী ফ্রন্ট খোলার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং পেশোয়ারে তাঁর জন্য 'মুযাফাতুল মুজাহিদীন'[২৮]নামে একটি মেহমানখানা খোলেন। এটি খোলার উদ্দেশ্য ছিলো, আলজেরিয়া থেকে আগত মুজাহিদদেরকে এখানে নিয়ে আসা, তাদের যথাযথ তারবিয়াত ও দীক্ষা দানের ব্যবস্থা করা এবং পুনরায় তাদেরকে আলজেরিয়াতে জিহাদের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। এই মেহমানখানা সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আল-কায়েদার সেনাপ্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হতো।

সাধারণত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতো আল-ফারূক সামরিক ক্যাম্পেই। সে সময়ে ওই ক্যাম্পের আমীর ছিলেন পূর্ব আলজেরিয়ান প্রদেশ সৌক আহরাসের অন্তর্গত শহর আমদৌরুশের জুবায়ের আল জাযায়েরি। তিনিও ১৯৯৩সালে আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ ভাইদের সঙ্গে জিহাদে শরীক থাকেন। ২০০২ সালে তিনি নিজ শহরে শাহাদাত বরণ করেন।

এমনিভাবে জালালাবাদে আল-কায়েদার অধীনে বদর সামরিক ক্যাম্পেও প্রশিক্ষণ হত। ওই ক্যাম্পের আমীর ছিলেন রাজধানী আলজিয়ার্সের আব্দুল মাজীদ আল জাযায়েরি।

---

[২৮] স্মরণ রাখা চাই, মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম প্রথমে মেহমানখানার নাম উল্লেখ করেছেন — মুযাফাতুল মুহাজিরিন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন, আলজেরিয়া থেকে আগত সমস্ত মুজাহিদদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও একই মেহমানখানায় তারা অবস্থান করতো। এ থেকে বোঝা যায়, এটি সেই মেহমানখানা, যার আলোচনা পূর্বে গিয়েছে।

সালভেশন ফ্রন্টে মুজাহিদদের ভর্তি

কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর এক বয়ানে বলেন-

"আমরা কতক মুজাহিদকে আফগানিস্তান থেকে আলজেরিয়ায় পাঠাই এ নির্দেশনা দিয়ে যে, জিহাদী চিন্তাধারা প্রচারের জন্য তারা যেন সালভেশন ফ্রন্টে ভর্তি হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হলো ফ্রন্টের নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা। তখন পর্যন্ত সালভেশন ফ্রন্টের উপর শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিক আন্দোলনের প্রভাব খুবই তীব্র ছিলো। কিন্তু তবুও এই সংগঠনকে জিহাদের জন্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিলো। একারণেই আমরা সালভেশন ফ্রন্টের সময়টাকে জিহাদের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের সময় বলে গণ্য করি। এর ভেতরেই আমাদের সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের বয়ান ও বক্তৃতামালা জিহাদের আলোচনা থেকে খালি হতো না। তাদের সর্বোচ্চ দাবি সেটাই ছিলো;যা মুজাহিদীনের দাবি ছিলো, আর তা হচ্ছে এমন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা, যা রাষ্ট্রে শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে। "

আলজেরিয়াতে জিহাদের দাওয়াত (১৯৯১ সাল)

১৯৯১সালে পালিত গণহরতালের পর কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি তাগুতি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আলজেরিয়ার বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করেন। কিন্তু অধিকাংশ শাইখ ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় ছিলেন। কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ ১৯৯৪সালে কনস্টানটাইন শহরে শাহাদাতের কিছু পূর্বে রেকর্ডকৃত নিজ বক্তব্যে বলেন-

"১৯৯১সালে গ্রীষ্মকাল চলে যাবার পর পেশাওয়ারে আমাদের ওখানে কমর উদ্দিন খরবানী নামক এক ব্যক্তি আসে এবং দাবি করে যে, সালভেশন ফ্রন্ট তাকে এখানে পাঠিয়েছে, যাতে আলজেরিয়ার মুজাহিদীনকে আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। অথচ আমার এ বিষয়ে সন্দেহ ছিলো। বিশেষ করে যখন আমাদের সাক্ষাৎ শাইখ আবু উবায়দা পাঞ্জেশেরী রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গীদের সঙ্গে হয়, তখন এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও আমি যেকোনোভাবে একটি সুযোগ পেয়েছি, তাই সেটি কাজে লাগিয়ে মরক্কোর গোপন পথ ধরে আলজেরিয়ায় ফিরে আসি।

১৯৯১সালের নভেম্বর মাসে যখন আমি আলজেরিয়ায় পৌঁছি, তখন দেখি, আলজেরিয়ার রাজনীতিক অঙ্গন পুরোপুরি উত্তপ্ত। চারিদিকে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ব্যস্ততা ও সাজ সাজ রব। সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ জিহাদের ব্যাপারে একেবারেই নীরব।

তখন আমি শাইখ আব্দুল কাদের শাবূতীর (যিনি শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনে তাঁর সহযোগী ছিলেন)সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাঁকে বলি যে, কমর উদ্দিন তো আমাদের ওখানে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলো। তখন শাইখ আব্দুল কাদের অস্বীকার করে বলেন, না তো, কমর উদ্দিনকে তো আমাদের কেউ পাঠায়নি। তখন আমি তাঁকে বলি, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো। কিন্তু আমরা আলজেরিয়াতে জিহাদের জন্য আসতে প্রস্তুত। তখন তিনি জবাবে বলেন আমরা কেন লড়াই করতে যাবো যখন কি-না আমাদের সামনে সালভেশন ফ্রন্ট রয়েছে যাদের মাধ্যমে সহজেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারি। ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন তো সময়ের ব্যাপার মাত্র।

অতঃপর আমি শাইখ সাঈদ মাখলুফী'র কাছে যাই, যার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। গিয়ে আমি দেখতে পাই, তিনি ফেরারী অবস্থায় রাজনীতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কারণ তিনি অসহযোগ আন্দোলন নামক একটি রচনা প্রচার করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সালভেশন ফ্রন্টের কতক ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাঁর উপর এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করছেন। তাঁর কাছে সে সময় ৪৯মডেলের একটি পুরানো গান ছিলো। আমি তাঁকে বলি:আমরা আলজেরিয়ান আফগানিরা পেশোয়ারে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, তাহলে আমরা আলজেরিয়াতে প্রবেশ করবো এবং আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে লড়াই করবো। তিনি আমার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং বলেন যে, এখনও তার সময় হয়নি।

যাহোক, সে সময় আমি অনুভব করি, যাদের সঙ্গেই আমি সাক্ষাৎ করব না কেন, কারোই মন বা মস্তিষ্কে বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র পরিষ্কার নয়। সকলেই নির্বাচনের ফলাফলের অপেক্ষায় বসে আছেন। তারা আশাবাদী, নির্বাচনের পরেই ইসলামী নিজাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। নিজেদের কাজে-কর্মে তারা বলে দিচ্ছেন,

ইনশাআল্লাহ এবারে শীতের মৌসুমেই ইসলামী রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চললো। তাহলে আর এত মেহনতের কি আছে? এত রক্তপাতের কি প্রয়োজন?

এমতাবস্থায় আমার সামনে কেবল শাইখ মানসুরী আল-মালইয়ানীই ছিলেন। (তিনিও শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনে শরীক ছিলেন)। আমি তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর সামনেও একই প্রস্তাব উত্থাপন করি। সকলের বিপরীতে তিনি আমার এই প্রস্তাব কবুল করেন, আমাদের আগমনকে সমর্থন জানান এবং এই প্রস্তাবে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তখন আমি সঙ্গীদেরকে তা জানানো এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পেশোয়ারে ফিরে আসি।

অতঃপর আমরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং সফরের পাথেয় পুরোপুরি প্রস্তত করে আলজেরিয়ায় পৌঁছতে শুরু করি। আলজেরিয়ায় পৌঁছে আমরা চোরাগোপ্তা হামলা আরম্ভ করি। যেমন-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল খালিদ নেযারের কাফেলাকে টার্গেট বানানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছিলো রাজধানীতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ল'মিরআউট-এ হামলা। ”

আফগানিস্তানেই কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে শাইখ আবু মুসআব সূরীর সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। শাইখ আবু মুসআব রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“কারী সাঈদ হরতালের পরপরই আলজেরিয়ায় গমন করেন এবং সেখানে একমাস অবস্থান করেন। ফিরে এসে তিনি আমাদেরকে বলেন, আরব আফগান, মোস্তফা বু ইয়ালা'র জামাআতের সদস্যবৃন্দ এবং কতক সালাফী জামাআত মিলে একটি জিহাদী জামাআত তিনি গঠন করছেন। অতঃপর কারী সাঈদ পেশোয়ারে আপন সঙ্গীবৃন্দকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলজেরিয়াতে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। আলজেরিয়ায় পৌঁছে তিনি পেশোয়ারে নিযুক্ত নিজের সহকারীকে ফোন করে বলেন, যেই জামাআত গঠনের জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, তা আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ (GIA) নামে গঠিত হয়ে গেছে। ”

স্মরণ রাখা উচিত, আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ (GIA) ১৯৯২সালের আগস্টের আগে অস্তিত্বে আসেনি। সামনের আলোচনা থেকে আমরা তা দেখতে পাবো।

ল'মিরআউট-এ হামলা (১৯৯২ সাল)

ইতিবাচক উত্তর না পাওয়ায় কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ নিজের মতো করে সামরিক কার্যক্রম আরম্ভ করে দেন। এমনকি তিনি ১৯৯২সালের মার্চে রাজধানী আলজিয়ার্সের নৌবন্দরে অবস্থিত নৌঘাঁটি ল'মিরআউট-এ হামলা করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। এটাকে 'নৌবন্দর অপারেশন' নামেও স্মরণ করা হয়। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা মতে কারী সাঈদের চেষ্টা ছিলো নৌবন্দর পুরোপুরি কব্জা করে ফেলা।

শাহাদাত বরণ (১৯৯৪ সাল)

আনুমানিক ২৭শে রমজান ১৪১৩ হিজরী মুতাবেক ১০ই মার্চ ১৯৯৪সালে বাটনা প্রদেশের তাজল্ট এলাকার জেলখানায় একটি বড় অপারেশন হয়। সেই অপারেশনে মুক্তি পাওয়া ১২০০বন্দির মাঝে একজন ছিলেন কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ নিজেই। বরং তিনি স্বয়ং এই অপারেশনে কমান্ড করছিলেন।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ওই জেলের নাম লুম্বীয বলেছেন, যা একটি ফরাসি নাম। কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ যখন বের হন, তখন দেখতে পান মুজাহিদদের মাঝে ঐক্য হয়ে গেছে। কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ সেখান থেকে পূর্ব প্রদেশ কনস্টানটাইন অভিমুখে যান। সে বছরেই চারমাস পরে সেখানেই তিনি Djebel El Wahch এলাকায় আলজেরিয়ান সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন! আমীন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মুসাল্লাহাহ্

এটি প্রকাশ্য বিষয় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিক পার্টি হওয়ার কারণে সালভেশন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য প্রচার-প্রচারণা ও রাজনীতিক কার্যক্রমের প্রতি নিবন্ধ ছিলো। সেনাঅভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত সামরিক কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিলো না। এ কারণে যখন জিহাদ শুরু হয়, তখন তারা রাজনীতিক অঙ্গনে সাফল্য উদযাপনের পরিবর্তে সামরিক অঙ্গনে সালভেশন ফোর্স গঠন করা সত্ত্বেও তেমনি দুর্বল থেকে যায়। এভাবেই আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ গঠনের পথ তৈরি হয়। দলটি

আলজেরিয়ার সর্ববৃহৎ জিহাদী তানজিম হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এই দলের ইতিহাসই এই কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয়। পরবর্তীতে এই দলটি ফরাসি শব্দ সংক্ষেপ[২৯]GIA-'র আরবি উচ্চারণ '**جيا**' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আলজেরিয়াতে এই দলের সূচনা বুনিয়াদিভাবে মুজাহিদদের দু'টি অংশের দ্বারা হয়েছে:ওই সমস্ত আলজেরিয়ান মুজাহিদ;যারা আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে ঐ সকল মুজাহিদ;যারা আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থান করেই জিহাদ করছেন।

আলজেরিয়ানদের অভ্যন্তরীণ মুজাহিদ জামাআত

আফগান ফেরত মুজাহিদীনের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। এখান আমরা আলজেরিয়ার ভেতরে থেকে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের আলোচনা করবো। সালভেশন ফ্রন্টের আহুত গণহরতাল এবং তার সূত্রে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিসহ অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মাঝে এই চিন্তা দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে, জিহাদ ব্যতীত আলজেরিয়ার মুসলমানরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না। তাই বিভিন্ন এলাকায় ছোট্ট ছোট্ট সামরিক গ্রুপ তৈরি হতে আরম্ভ করে। যেগুলোর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- আবু সিহাম এবং আবু আনাস, উভয় শাইখের গ্রুপগুলোসহ কিমার সেনাক্যাম্পের অপারেশনে শরীক অন্যান্য গ্রুপগুলোর আলোচনা গত হয়েছে।

- পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে আব্দুর রহীম ইবনে খালেদের কঠোর সালাফী গ্রুপ। এই দলের আলোচনা GIA-এর বিভ্রান্তি সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা আবারও নিয়ে আসবো।

- শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র গ্রুপ যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

- মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনে শরীক শাইখ মানসুরী আল-মালইয়ানী'র গ্রুপ।

- জামাআত আল-আসেমা সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুহাম্মদ ইলালের গ্রুপ।

শেষোক্ত গ্রুপ দু'টির আলোচনা আমরা এখানে সংক্ষেপে পেশ করতে চাচ্ছি, যে দু'টির ঐক্যের উপর ভিত্তি করে GIA-এর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়।

[২৯] Groupe Islamique Armé

শাইখ মানসুরী আল-মালইয়ানী (এপ্রিল, ১৯৯২ সাল)

শাইখ মোস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনে সম্পৃক্ত শাইখ মানসুরী আল-মালইয়ানী'র গ্রুপ রাজধানী আলজিয়ার্স ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে সক্রিয় ছিলো। কেবল তিনিই নির্বাচনের আগেই কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র প্রস্তাব কবুল করে নেন এবং আলজেরিয়াতে জিহাদের সূচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ১৯৯২সালের এপ্রিলে সামরিক কার্যক্রম আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐবছরের জুলাই মাসেই গ্রেফতার হয়ে যান। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড শোনানো হয় এবং তা কার্যকরও করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন রহমতের চাদরে আবৃত করুন! !

মুহাম্মদ ইলাল (জুলাই ১৯৯২ সাল)

এছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ ইলাল ওরফে মৌহ লেফী'র গ্রুপ ছিলো উল্লেখযোগ্য। দলটি রাজধানী আলজিয়ার্স এবং শহরতলিগুলোতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলো। গ্রুপের প্রধান আলজিয়ার্সের জামাআত আল-আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার (জামাআতুল আসিমা)'র একজন রুকন ছিলেন। এই তানযীমের আমীর নুরুদ্দিন সালামিনা'র শাহাদাতের পর মুহাম্মদ ই'লাল এর আমীর নিযুক্ত হন। ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা বিষয়ে আলোচনা কালে আমরা বলেছি যে, এই সংগঠনের কতক সদস্যদের মাঝে কট্টরপন্থা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যেত।

১৯৯২সালের অক্টোবরে তেমুযকিদা এলাকায় সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে মুহাম্মদ ইলাল শাহাদাত বরণের পর আবু আদলান আব্দুল হক লেইয়াদা (জন্ম: ১৯৫৯সালে) এই গ্রুপের আমীর নিযুক্ত হন।

প্রথম আমীর আবু আদলান আব্দুল হক লেইয়াদা (আগস্ট ১৯৯২ সাল)

আবু আদলান আব্দুল হক লেইয়াদা'র নেতৃত্বেই সর্বপ্রথম এই উভয় জামাআত আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ বা GIA নামে কাঠামোযুক্ত হয়।

দুই গ্রুপ ভেঙ্গে এক জামাআত গঠনের এই প্রক্রিয়া কয়েকটি বৈঠকের পরে আমলে আসে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিলো যা তেমুয্কিদায় অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাজধানীর শহরতলী বারাকি-তে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শাইখ মানসুরী আল-মালইয়ানী'র পর নিযুক্ত তাঁর গ্রুপের আমীর আহমদ আল-

উদ্দ জামাআত আল-আসিমা সংগঠনের আমীর আব্দুল হক লেইয়াদা'র সাক্ষাতে মিলিত হন। এটা ১৯৯২ সালের আগস্টের শেষ দিকের এবং সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকের কথা। এই উভয় শাইখ গোটা আলজেরিয়াতেই জিহাদের জন্য নিজেদের সারি একীভূত করতে উদ্বুদ্ধ হন। তাই তো আবু আদলান আব্দুল হক লেইয়াদা এবং আহমদ আল-উদ্দ পরস্পরে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, যা GIA প্রকাশিত সাময়িকীর প্রথম সংখ্যায় আশ-শাহাদাহ্ নামে প্রকাশিত হয়।

এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় কয়েকজন প্রসিদ্ধ দাঈ ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তন্মধ্যে ছিলেন শাইখ আব্দুন নাসের আলামী এবং তদীয় ভ্রাতা শাইখ উমর আলামী, যিনি 'আন-নাক্বাবাতুল ইসলামিয়্যা লিল-আমাল' সংস্থারও প্রধান ছিলেন।

এরপর থেকেই সামরিক দিক ও সাংগঠনিকভাবে সর্ববৃহৎ জিহাদী শক্তি হিসেবে GIA-এর আবির্ভাব ঘটে। সংগঠনটি পরিস্থিতির এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্বও গ্রহণ করে নেয়।

আব্দুল হক লেইয়াদা'র গ্রেপ্তারি (মে ১৯৯৩ সাল)

সেকালে অস্ত্রশস্ত্র ও মুজাহিদীনকে আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে মরক্কোর গোপন পথ দিয়ে প্রবেশ করানো হতো। GIA-এর আমীর আব্দুল হক লেইয়াদা দেশের বাইরে কার্যক্রমের তদারকি এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য ১৯৯৩ সালের মে মাসে নিজেই মরক্কো গমন করেন। সেখানেই তিনি অপর কয়েকজন নেতাসহ গ্রেপ্তার হন। সেপ্টেম্বর মাসে মরক্কো সরকার তাঁকে আলজেরিয়ার কাছে হস্তান্তর করে। সেখানেই তিনি সারকাজী জেলে ১৩বছর পর্যন্ত বন্দি থাকেন। অবশেষে জাতীয় শান্তিচুক্তির আইন অনুসারে ২০০৬সালের মার্চ মাসে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

আব্দুল হক লেইয়াদা'র গ্রেপ্তারির পর ঈসা ইবনে আম্মার রহিমাহুল্লাহ আমীর নিযুক্ত হন। ১৯৯৩সালের আগস্ট মাসে নিযুক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই সিকিউরিটি ফোর্স তাঁকে শহীদ করে দেয়।

অতঃপর জাফর আফগানী রহিমাহুল্লাহ, যার প্রকৃত নাম সাইয়্যিদ আহমদ মুরাদ, (অথবা সাইয়্যিদ আলী মুরাদ) আমীর হিসাবে নিযুক্তি পান। তাঁর জন্ম ১৯৬৪সালে এবং সম্পর্ক রাজধানীর বূজরঈয়া এলাকার সঙ্গে। ১৯৯৪ সালের

২৬শে মার্চ আলজেরিয়ান সেনাবাহিনী ব্লিডা প্রদেশের পাহাড়ে ৯জন সঙ্গীসহ তাঁকে শহীদ করে দেয়। জাফর আফগানী রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ (মার্চ ১৯৯৪ সাল)

জাফর আফগানী রহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাতের পর শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ;যার প্রকৃত নাম শরীফ কসমী ছিলো, GIA-এর আমীর নিযুক্ত হন। আমীর হিসেবে নিযুক্তি পাবার আগে তিনি জামাআতের শরঈ দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি ১৯৬৬সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই অঙ্গনে আসার আগে তিনি রাজধানীর একটি মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দাওয়াতী কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকেন। আমীর হওয়ার পর তাঁর আমলেই মুজাহিদীনের মাঝে বিরাট ঐক্য সাধিত হয়।

শাইখ আবু আসিম হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ'র ব্যাপারে বলেন-

"বির খাদেমে যেহেতু আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম, এজন্য কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁর ও আমার মাঝে ভালো যোগাযোগ ও জানাশোনা ছিলো। তিনি ছিলেন দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ আকীদা ও উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বুদ্ধি-বিবেচনা, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ইলমে দ্বীনের উপরও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। বির খাদেম শহরে বিভিন্ন মজলিস, মাহফিল ও মসজিদে ওয়াজ-নসীহত করতেন, আবার ইলমে দ্বীনের তালিমী হালকার (শিক্ষা বৈঠক) তদারকি করতেন। বির খাদেমে আমার মহল্লার কাছাকাছি যোঁকা মহল্লার মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে নিযুক্তি দানের জন্য আমি নিজেই মসজিদ কমিটিকে তাঁর কথা বলি। এভাবেই তিনি সেখানে ইমাম ও খতীব হিসেবে নিযুক্ত হন। যখন সালভেশন ফ্রন্টের রাজনীতিক শাখায় ভুল পদক্ষেপ ও সামাজিক স্ক্যান্ডাল প্রকাশ পায় তখন আমি উৎসাহ দেই, তিনি যেন সংশোধনকারীদের সঙ্গে মিলে এসব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। কারণ সেই ভুলগুলো শুধু দলেরই বদনাম করছিলো না বরং সরাসরি ইসলামের দুর্নামও করে যাচ্ছিলো। কিন্তু শরীফ কসমী কখনই ফ্রন্টে

শরীক হননি, আর এই দলের প্রাদেশিক দপ্তরের কখনও প্রধান ছিলেন না, যেমনটা কেউ কেউ লিখেছেন।

অবশ্য গ্রেফতারি চলাকালে তিনি ইন্টেলিজেন্সের টার্গেটে ছিলেন। আর এ কারণেই পরিচিত একব্যক্তির কাছে একটা সময় পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। অতঃপর যখন জিহাদ শুরু হয় তখন তিনি মহল্লার মুজাহিদদের সঙ্গে বেসাতীন, সাহাবিলা ও বির খাদেমের একটি সামরিক গ্রুপ আল-মুওয়াক্কিউনা বিদ-দামিতে সংযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি সেই গ্রুপের আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিরে খাদেমের পশ্চিমদিকে সাহাবিলা শহরের টহলদার পুলিশ বাহিনীর জন্য ওঁৎ পাতেন। সেখানে নয়জন পুলিশ নিহত হয় এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে হস্তগত হয়। এই ঘটনার পর GIA-এর কাছে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁকে GIA-এর কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে জাফর আফগানীর শাহাদাতের পর তিনি GIA-এর আমীর নিযুক্ত হন। ”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে আলোচনা শুনেছি এবং লোকেরা যেভাবে সাক্ষ্য দিয়েছে;তাতে আমি মনে করি, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। পক্ষের বিপক্ষের সকলেই তাঁর ব্যাপারে একমত ছিলো। ”

মহাঐক্যজোট (১৯৯৪ সাল)

জিহাদী অপারেশনের সূচনা এবং সামরিক গ্রুপগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পর গ্রুপগুলোকে পরস্পরে একীভূত করার প্রয়াস চলতে থাকে। ঐক্য সাধনের এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবার আগে আরও কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা ১৯৯৪সালের মে মাসের ১৩তারিখে মুজাহিদদেরকে মহাঐক্য দান করে ধন্য করেন। আল-জামাআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ'র পতাকা তলে এই ঐক্যকে ‘ওয়াহদাতুল ইতিসামি বিল কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ’ নামকরণ করা হয়। এই জোটের ভেতর সালভেশন ফোর্সের বড় বড় মাশাইখ শরীক হন। জোটগঠনের সর্বশেষ বৈঠকের অডিওও প্রচার করা হয়, যা ছিলো অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাতে মুহাম্মদ সাঈদ, আব্দুর রাযযাক রাজ্জাম, আব্দুল কাদের শাবূতী এবং সাঈদ মাখলুফীর মত মাশাইখ তাঁদের পুত্র বয়সী এক যুবক মুজাহিদ আবু

আব্দুল্লাহ আহমদকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই ঐক্যের মাধ্যমে মুজাহিদদের মাঝে আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়।

অবশ্য সালভেশন ফোর্সের আমীর মাদানী মিরযাক তখনই ঐক্যের বিরোধিতা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি কেবল আব্বাসী মাদানী এবং আলী বালহাজের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। অথচ তখন উভয় শাইখই গ্রেপ্তার ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি এই মানহাজ গ্রহণ করেন যে, আমাদের লড়াই শুধু নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে বাধ্য করার জন্যই হবে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“অনেক গ্রুপের লিডারশিপ সাধারণ মুজাহিদ ও জনসাধারণের চাপে পড়ে মহাজোটে শরীক হয়ে যায়। এই ঐক্য জিহাদ ও সালাফী মানহাজের উপর হয় এবং তার সাধারণ দিকগুলো ভালোই ছিলো। ”

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ'র যুগ

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙখলার মুখে তিনি রুদ্ধদ্বার ছিলেন। ঐক্য সাধিত হওয়ার মাত্র ৬মাস পরই ১৯৯৪সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে রাজধানী আলজিয়ার্স-এর একটি শহরতলিতে সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন[৩০]। তিনি এত সংক্ষিপ্ত সময় দায়িত্বে থাকার কারণে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও মৌলিক মানহাজের উপর একতা ও একাত্মতা তৈরি করা যায়নি, তাই বহু বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়। এছাড়াও তাঁর আমলে বিরোধ ও মতপার্থক্য কম হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, সেসময় সামরিক সক্রিয়তা ছিল সবচেয়ে তুঙ্গে।

শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র গ্রুপ

যদিও এটি স্বতন্ত্র কোনো গ্রুপ ছিলো না বরং সালভেশন ফোর্সের অংশ হিসেবেই GIA-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তথাপি যেহেতু পূর্ব থেকে তার একটি স্বতন্ত্র দলগত

---

[৩০] অথচ শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ “রাজধানী আলজিয়ার্স ও ব্লিডা'র মাঝামাঝি মহাসড়কে একটি গাড়ি তাঁর গাড়ির কাছাকাছি এসে তাঁর উপর ফায়ার করে। কেউ কেউ বলেছেন, অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ছিলো। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আসলে কোনোটাই বলা যায় না।”

বৈশিষ্ট্য ছিলো, এজন্য তার সদস্যরা মিলে রাজধানী আলজিয়ার্সে 'সারিয়াতুল ফিদা' গঠন করে। তাদের কার্যক্রম পরিষ্কার করা এই কারণে জরুরী যে, পরবর্তীতে শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং তাঁর জামাআতের সদস্যদের উপর আল-জাযআরাহ ও বিদআতী হওয়ার অপবাদ আরোপ করে GIA-এর নেতৃবৃন্দ তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাতে আরম্ভ করেছিলো।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"সারিয়াতুল ফিদা পরবর্তীতে কাতিবাতুল ফিদা (আল-ফিদা ব্রিগেড) নামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ব্রিগেড অত্যন্ত শিক্ষিত ও বিরল প্রতিভাধর সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। তাতে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকবৃন্দ, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ারসহ উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির লোকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই ব্রিগেডে শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের সঙ্গে সাঈদ আসী নামে তাঁর অপর একজন সঙ্গী ছিলেন। জিহাদের অঙ্গনে এই ব্রিগেড অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

আল-ফিদা ব্রিগেড বড়ো বড়ো ব্যক্তিদেরকে গুপ্তহত্যা, টার্গেট কিলিং ও চোরাগুপ্তা হামলার কার্যক্রমে বেশ দক্ষ ছিলো। তারাই আলজেরিয়ার এক বড় জিন্দিক আব্দুল হক ইবনে হামুদাকে হত্যা করেছে। এই লোক আলজেরিয়ান ওয়ার্কার্স জেনারেল ইউনিয়নের প্রধান ছিলো। তাকে আলজেরিয়ায় প্রেসিডেন্টের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে গণ্য করা হতো। এছাড়াও আরও অনেক জেনারেলকে হত্যা করে এই ব্রিগেড।

গ্রুপটি চেকপোস্ট বানিয়ে লোকদেরকে চেকিং করার মাধ্যমে বড়ো বড়ো ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার অথবা হত্যা করতো। যেহেতু তাদের মাঝে বড়ো বড়ো কোম্পানির লোক এবং সরকারি কর্মকর্তারা ছিলো, সেজন্য তাদের পক্ষে ইউনিফর্ম এবং মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা কোনো ব্যাপারই ছিলো না। প্রথমে তারা পুরো রাজধানীর পরিদর্শন করতো। অতঃপর উপযুক্ত জায়গা বেছে চেকপোস্ট বসাতো। তাদের কাজ অত্যন্ত সুগঠিত, সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও গোপন হতো। এই ব্রিগেডের অধিকাংশ সদস্য অপর গ্রুপের মুজাহিদদের বিপরীতে পাহাড়ের পরিবর্তে রাজধানীতে বসবাস করতো এবং সেখানেই লড়াই করতো। এটি এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা ছিলো, যা আমার দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এই ব্রিগেডের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মাঝে আব্দুল ওয়াহাব আম্মারাহও ছিলেন, যার থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে GIA তাকে হত্যা করে। এমনিভাবে আরও ছিলেন আবু সালেহ, যিনি আব্দুল ওয়াহাব আম্মারাহ'র নিহত হওয়ার পর ব্রিগেডের আমীর নিযুক্ত হন। ”

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ জিহাদের অগ্রগতি (১৯৯২—১৯৯৫ সাল)

এখন আমরা যে বিষয়টি শুরু করবো, তা হলো, মুজাহিদীনের কট্টরপন্থা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ১৯৯২সালে জিহাদ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ১৯৯৫সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত তাদের সামরিক কার্যক্রম ও সাফল্যের আলোচনা। তাতে পরিষ্কার হবে যে, আলজেরিয়াতে জিহাদ এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কতোটা বিস্তৃতি পায় এবং কিরূপ সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। সেসঙ্গে তুলনা করবো যে, পরবর্তীতে কট্টরপন্থা দ্বারা আক্রান্তের পর এর ভয়ানক পরিণাম বিষয়ের ।

গেরিলা যুদ্ধ

এলাকা এবং সংগঠন

আলজেরিয়ার অধিকাংশ এলাকায় জিহাদী গ্রুপ ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশের নগর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিলো মুজাহিদদের সমর্থক এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের ছিলো সহানুভূতিশীল। বিশেষত উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে এবং তার পাহাড়গুলোতে। আরও বিশেষায়িত করে বললে— উত্তরাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত এলাকাগুলোতে। মধ্যভাগে অবস্থিত এলাকা দ্বারা উদ্দেশ্য রাজধানী আলজিয়ার্স, মেদিয়া ও ব্লিডা প্রদেশ এবং এই উভয় প্রদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহ। এই অঞ্চলগুলো-ই GIA-এর নেতৃবৃন্দের মারকাজ ও সদরদপ্তর ছিলো। জামাআত পথভ্রষ্ট হওয়ার পর উক্ত এলাকাগুলোতেই তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিলো।

সূচনাকালে জনসাধারণের সহায়তার কারণে মুজাহিদদের জন্য সামরিক কার্যক্রম অত্যন্ত সহজসাধ্য ছিলো। কারণ লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে কোনো চিন্তা এবং দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনই তাদের ছিলো না। গণসংযোগ ও জনসাধারণের সহায়তা এবং লজিস্টিক সাপোর্টই গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু অত্যন্ত

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, GIA নিজের হাতে নিজের গুমরাহী, বিভ্রান্তি ও প্রজ্ঞাহীন রাজনীতির কারণে এসব উপাদান হারিয়ে বসেছিলো এবং এসব উপাদানের অভাবেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ GIA-এর সামরিক ও সাংগঠনিক প্যাটার্নের ব্যাপারে বলেন-

"প্রতিটি অঞ্চলে জুন্দ অথবা আজনাদ ছিলো। আজনাদের ভিতর আবার কাতায়েব। কাতায়েবের ভেতরে ছিলো সারাইয়া এবং সারাইয়ার ভিতরে রাময।"

আমাদের কাছে যে হস্তলিখিত উৎসগুলো ছিলো, সেগুলোর মধ্যে GIA কর্তৃক গঠিত কিছু এলাকার কথা জানা যায়। আবার কিছু এলাকার কথা সেখানে উল্লেখ না থাকার কারণে সেগুলো আমাদের দৃষ্টি ও জানাশোনার বাইরে। যেসব এলাকার কথা জানা যায় সেগুলো নিম্নরূপঃ

• উত্তরাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত প্রথম অঞ্চল: রাজধানী আলজিয়ার্স, মেডিয়া ও ব্লিডা প্রদেশ।

• পূর্বাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত দ্বিতীয় অঞ্চল: বুমারডেস

• পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত তৃতীয় অঞ্চল: তিয়ারেত

• পশ্চিমাঞ্চলীয় চতুর্থ এলাকা: বেল আব্বেস, ট্লেমসান, ওহরান, সাঈদা, আইন টেমুচেন্ট

• পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চম এলাকা,

• পূর্বাঞ্চলীয় ষষ্ঠ এলাকা: বাটনা

• দক্ষিণাঞ্চলীয় নবম এলাকা: জেলফা, লেঘাউট, ঘরডাইয়া, এল বায়াধ, বেচার, উয়ারগলা এবং মালি, মৌরিতানিয়া ও নাইজারের সীমান্ত পর্যন্ত মরু অঞ্চল।

স্বর্ণযুগ

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"ঐক্যের সময়কাল অর্থাৎ ১৯৯৪সালের শেষ দিক থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ছিলো মুজাহিদদের স্বর্ণযুগ।

মুজাহিদীনরা প্রায় শতভাগ এলাকা নিজেদের দখল নেয়। তারা পূর্ণ স্বাধীনতাসহ চলাফেরা ও বসবাস করতো। অপরদিকে সেনাবাহিনী তাদের এলাকা থেকে বের হতেও পারতো না।

সেসময়ে সরকারের কাছে চারপ্রকারের নিরাপত্তারক্ষী সশস্ত্র সংস্থা ছিলো: পুলিশ, মিলিশিয়া, সেনাবাহিনী এবং ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু সংস্থা খোলা হয়। ”

ক্ষুদ্র সামরিক অপারেশন

❝সেনাবাহিনী শুধু গোপন তল্লাশি অপারেশনের জন্য বের হতো। প্রথম দিকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশনগুলোতে শুধু পেট্রোল অথবা নিসান মডেলের একটি কি দু'টি গাড়ি আসতো। সেগুলোকে তারা সন্ত্রাসীদেরকে (!) ধাওয়া করার জন্য ব্যবহার করতো এবং সেগুলো নিয়ে পাহাড়ে উঠতো। কিন্তু বন-জঙ্গল ও পাহাড়ি ঘাঁটিগুলো পর্যন্ত রাস্তা না থাকার কারণে তারা মুজাহিদদেরকে শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারতো না। আর এদিকে মুজাহিদরা পা চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতো। আলজেরিয়াতে ফরাসিদেরও আগে যারাই সরকার থেকে ফেরারী হতো, তারাই ঘন বন বিশিষ্ট পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পারতো। আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন—

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا[৩১]

জিহাদ আরম্ভ হওয়া মাত্রই 'জিহাদি টোলি' গঠিত হতে শুরু করে, যেগুলোকে সাধারণ পরিভাষায় **كليكات** বলা হতো। তখনও পর্যন্ত মুজাহিদরা ততোটা শক্তিশালী হতে পারেনি। প্রথম দিকে মুজাহিদরা সে গাড়িগুলোকে টার্গেট করে হামলা করতো এবং প্রতিটি অপারেশনেই অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে লাভ করতো। তখন সেনাবাহিনী এই অনুসন্ধান অভিযানে আর একটা বা দুটো গাড়ি নিয়ে আসতো না, বরং হেলিকপ্টারের হেফাজতে পুরো এক কাফেলা প্রেরণ করতো। ❞

[৩১] আর আল্লাহ পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন... [সূরা আন নাহল: ৮১]

পরিখা

❝অধিকাংশ সময় মুজাহিদরা পাহাড়ে পরিখা খনন করতো। কিন্তু কখনও কখনও তারা তাঁবুও ব্যবহার করতো। প্রায়শই ভূমি অর্ধেক খনন করে তাতে তাঁবু খাটিয়ে নিতো। আবার কখনও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে গাছের ডাল এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত কাল প্লাস্টিক ব্যবহার করে তারা তাঁবু বানাতো।

আলজেরিয়ানদের কাছে ভূগর্ভস্থ কুঠুরি তৈরির প্রচলন অনেক পুরানো ছিলো। এগুলোকে তারা 'কাযমা' বলতো। সেগুলোতে ছাদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো শুধু গাছের ডাল ও পাতার উপর প্লাস্টিকের কৃত্রিম ডাল। কুঠুরির অবশিষ্ট কাঠামো পুরোটা হতো পাহাড়ের। এভাবেই আলজেরিয়াতে অনেক ভূগর্ভস্থ কুঠুরি ছিলো যা ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিলো। আবার কিছু কিছু পরিখা মুজাহিদরা নিজেরাই খনন করেছিলো। ❞

বনজঙ্গল

❝সেখানে বন কয়েক রকমের ছিলো। কিন্তু পাইন বনগুলো যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ছিলো না। কারণ পাইন গাছে দেয়াশলাইয়ের মতো আগুন ধরে যেতো। সেনাবাহিনীর লোকেরা পাইন গাছ টার্গেট করেই আক্রমণ করতো। আর এটা তো জানা কথাই যে, তাগুতগোষ্ঠী সর্বত্র বন-জঙ্গল পুড়িয়ে ছারখার করে থাকে। আজ পর্যন্ত প্রতিটি তাগুত সরকার এ কাজই করে এসেছে। যেহেতু শীতের মৌসুমে আগুন ধরত না এজন্য মুজাহিদীন তুলনামূলকভাবে নিশ্চিন্ত থাকতো। আর গ্রীষ্মের সময় সারাক্ষণ ভয় কাজ করতো, কখন উড়োজাহাজ এসে বম্বিং করে বন জ্বালিয়ে দেয়। আর মনে রাখতে হবে, জঙ্গলে এবং মরুভূমিতে কখনই এ কথা বলা যাবে না, আমি তো ভালোভাবে এসব জায়গা চিনি না;আমি হারিয়ে যাবো। ❞

বড় সামরিক অপারেশন

❝পরবর্তীতে তল্লাশি অভিযানে সেনাবাহিনী কোনো বিশেষ এলাকা ঠিক করে সেখানে প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার সৈন্যকে ট্যাংক, সাঁজোয়াযান ও হেলিকপ্টারের নিরাপত্তায় প্রেরণ করতো। এ পরিস্থিতিতে মুজাহিদরা কি করতো?

নিজেদের আসবাবপত্র একত্রিত করে লুকিয়ে ফেলতো এবং নিজেরাও আত্মগোপন করতো। ❞

প্রোপাগান্ডা

❝এ জাতীয় অভিযানগুলোতে সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারতো না। কিন্তু মিডিয়াতে তারা বলতো, আমরা সন্ত্রাসীদের এতটা কেন্দ্র জ্বালিয়ে দিয়েছি;এতজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছি। আল্লাহর কসম! তাদের এসব বক্তব্য পুরোপুরিই মিথ্যা। আমরা নিজেরা সেই এলাকায় থাকতাম;যে এলাকার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, অমুক এলাকায় আমরা ৫০জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছি। এমনিতেও তাদের মিথ্যাচার বাস্তবে সত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না যে, এক অভিযান ও তল্লাশিতে এত সংখ্যক সন্ত্রাসী তারা হত্যা করবে। ❞

❝সেনাবাহিনীর অপারেশনের জবাবে মুজাহিদীন ওঁৎ পেতে থাকতো এবং অধিকাংশ সময় ১০জন ১২জন করে সৈন্য গ্রেপ্তার হতো, আর বাকিরা পালিয়ে যেতো। সর্বদা এমনটাই হতো। তারপর জেট বিমান আসতো এবং পাহাড়ের উপর এলোপাথাড়ি বম্বিং করে বন-জঙ্গল জ্বালিয়ে দিতো। মুজাহিদীনদের কোন কেন্দ্র যদি তারা দেখতে পেত, তখন অনেক খুশি হত অথচ মুজাহিদীনরা সে কেন্দ্র ছেড়ে আগেই চলে গেছে। ❞

গেরিলা যুদ্ধ

❝আমরা গেরিলা যুদ্ধ এবং এ বিষয়ে মাও সেতুঙের কিতাবাদি পড়েছিলাম। গেরিলা যোদ্ধারা যা লিখেছে, আপনি সর্বদাই দেখবেন, তা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। এমনকি আপনার মনে হবে যে, অক্ষরে অক্ষরে যেন তাদের প্রতিটি কথা ফলে যাচ্ছে। আমি হতবাক হতাম যে, সুবহানাল্লাহ! অক্ষরে অক্ষরে কীভাবে সবকিছু মিলে যেতে পারে! শত্রুরাও তাই করতো এবং গেরিলা যোদ্ধারাও। অথচ আলজেরিয়ার মুজাহিদীনদের গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না। কিন্তু বাস্তব ময়দানে দেখা গেলো, আল্লাহর-কুদরতি ফায়সালা নেমে আসতো। কাজের ধরন ও পরিস্থিতি আপনাকে বলে দেবে এখন কি করতে হবে, কীভাবে করতে হবে। ❞

শক্তির-ভারসাম্যের পর্যায়

❝এভাবেই গেরিলা মুজাহিদীন এই স্তরে পদার্পণ করে। গেরিলা যুদ্ধ-শাস্ত্রে একে শক্তির-ভারসাম্যের পর্যায় বলা হয়। প্রথম প্রথম শত্রু সেনারা দুইটি কি তিনটি গাড়ি নিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারতো না, আর এখন পুরো কাফেলা নিয়ে আসা সত্ত্বেও মুজাহিদীনের কোন ক্ষতি করতে পারে না। ❞

জনসাধারণের উপর সরকারি জুলুম-নির্যাতন

❝এভাবে আমি থাকাকালেই আনাচে-কানাচে তল্লাশি অভিযানের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম বোমেরডেসে হয়েছিলো। কিন্তু সেনাবাহিনী মুজাহিদীনে পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হতো না;বরং জনসাধারণ পর্যন্তই তাদের তল্লাশি কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকতো। জনসাধারণকে তল্লাশি করার অধিকার সেনাবাহিনীর ছিলো না। এজন্য নিজেদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত পুলিশ ও মিলিশিয়াদেরকে নিয়ে নিতো, যাতে জনসাধারণকে তল্লাশি করা যায়।

এই তল্লাশি অভিযানে পুরো এলাকা অবরোধ করে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালানো হতো, ঠিক যেমন, ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে করে থাকে। কারণ বেসামরিক যুবকদেরকে মুজাহিদীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হতো;এজন্য অপারেশন শুরুর আগে মুজাহিদীনরা পালাতো, আর স্থানীয় অধিকাংশ যুবকও তাদের সঙ্গেই যেতো। শুধু বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাই গৃহে থাকতো।

ঘরের লোকদেরকে যখন যুবকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তারা যুবকদের কাজে যাওয়ার কথা বলতো। সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে নিরাপত্তা সংস্থার লোকেরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। ন্যূনতম এতটুকু তো ছিলোই যে, তাদেরকে হেনস্তা করতো, মারপিট করতো, ঘর তল্লাশি করতো, অন্দরমহলের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করতো এবং নারীদের সঙ্গে অনেক বাড়াবাড়ি করতো।

যখন সেনাবাহিনীর অনাচারে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং তাদের কাজে-কর্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখন এই জনগণই আমাদেরকে সহায়তা দিতে থাকে;ওয়াজিরিস্তানের কাবায়েলি লোকদের মতোই।

তারা আমাদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করতো, আমাদের জন্য রুটি বানাত ইত্যাদি।”

বড় বড় কিছু অপারেশন

যখন একদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ চলছিলো, অপরদিকে মুজাহিদীনরা নগর এলাকায় সামরিক ক্যাম্পগুলোর উপরও বড় কিছু অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনা করে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপঃ

প্রেসিডেন্ট বৌদিয়াফকে হত্যা (জুন ১৯৯২ সাল)

১৯৯২সালের জুন মাসের ২৯তারিখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল বৌদিয়াফকে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তাইয়েব বু মিরাফী লুমবারাক হত্যা করে। এই অপারেশনটি জিহাদী গ্রুপগুলোর সরাসরি পরিকল্পনার ফলাফল ছিলো না;বরং মুজাহিদীনের প্রতি সহানুভূতিশীল তাইয়েব বু মিরাফী'র ব্যক্তিগত অপারেশন ছিলো। আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করুন!

কিন্তু এই অপারেশনের কারণে সরকার শঙ্কিত হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। বৌদিয়াফের স্থানে সেনাবাহিনীর অধীনে পরিচালিত সুপ্রিম স্টেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কাউন্সিলের রুকন জেনারেল আলী কাফিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করে। সরকার সালভেশন ফ্রন্টকে হত্যার জন্য দায়ী করে। সালভেশন ফ্রন্টের গ্রেফতার দুই নেতা শাইখ আব্বাসী মাদানী এবং শাইখ আলী বালহাজকে ১৩বছরের কারাদণ্ড শোনানো হয়। তবে সালভেশন ফ্রন্ট এই দায় পুরোপুরি অস্বীকার করে।

ফরাসি দূতাবাস কর্মীদেরকে হাইজ্যাক (অক্টোবর ১৯৯৩ সাল)

১৯৯৩সালের অক্টোবর মাসের ২৪তারিখে মুজাহিদীনরা তিনজন ফরাসি দূতাবাসকর্মীকে হাইজ্যাক করে এবং তারপর আবার ছেড়েও দেয়। এ উদ্দেশ্যে, মুক্তি পাওয়া ফরাসি নাগরিকেরা যেন তাদের সরকারকে জামাআতের দাবিগুলোর ব্যাপারে অবগত করে। এসব দাবি দুই অংশ সংবলিত ছিলো:

প্রথম অংশ হলো, ফ্রান্স আলজেরিয়ার তাগুতি সরকারকে সাহায্য করা থেকে বিরত হবে।

দ্বিতীয় অংশ ছিলো, আলজেরিয়াতে ফ্রান্স তার সমস্ত সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা বন্ধ করে দেবে।

এই দাবি পূরণে ফরাসি সরকারকে একমাস সময় দেয়া হয়। অর্থাৎ ১৯৯৩সালের পহেলা ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। এই দাবি না মানলে আলজেরিয়ার ভূখণ্ডের সর্বত্রই ফরাসি, পশ্চিমা ইউরোপিয়ান নাগরিকদেরকে টার্গেট করে হামলা করার হুমকি দেয়া হয়। পেশকৃত দাবি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চার্ল বাস্কোয়া সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে ফ্রান্সে বসবাসরত আলজেরিয়ান যুবকদেরকে পাকড়াও করতে আরম্ভ করে দেয়। এর পরপরই আলজেরিয়াতে মুজাহিদীনও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদেরকে টার্গেট করে হামলা করতে আরম্ভ করে। ফলে ৭০জন কাফির নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই ছিলো ফরাসি।

সেনা ক্যাম্প দখল (অক্টোবর ১৯৯৩ সাল)

আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, অ্যামবুশ এবং বড়ো বড়ো সরকারি অফিসারদেরকে টার্গেট কিলিংয়ের পাশাপাশি মুজাহিদীনরা কয়েকটি সেনাক্যাম্প দখল করতেও সক্ষম হয়। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

• জিজাল প্রদেশের শহর আততহীরের সেনাক্যাম্প দখল করা হয় ১৯৯৩সালের অক্টোবরে।

• সিদি বেল আব্বেস প্রদেশের ইতলাগ শহরের সেনাক্যাম্প দখল করা হয় মে ১৯৯৪সালে।

• ট্লেমসান প্রদেশের সাবদৌ শহরের সেনা ক্যাম্প,

• বনি মাররাদ এলাকার সেনা ক্যাম্প,

• রাজধানীর শহরতলী এলরগায়া'র সেনা ক্যাম্প,

এছাড়াও আরও বিভিন্ন সামরিক এরিয়ায় অপারেশন পরিচালনা করে মুজাহিদীনরা।

তাজল্ট জেলের অপারেশন (মার্চ ১৯৯৪ সাল)

এই পর্যায়ে এসে অর্জিত বিশাল সাফল্যের মাঝে শাইখ আবু ইব্রাহিম মোস্তফা[৩২]রহিমাহুল্লাহ'র নেতৃত্বে পরিচালিত অপারেশনটি অন্যতম। এরই ফলে ২৭ই রমজান ১৪১৪হিজরী মুতাবেক ১০ই মার্চ ১৯৯৪সালে তাজল্ট জেল থেকে ১২০০জন বন্দি মুক্তি পায়।

স্মরণ রাখা চাই, কেউ কেউ বলেন যে, এই ঘটনাটি তাগুতি সরকারের পরিকল্পনায় হয়েছে। একথা পুরোপুরি ভুল। যারা এরকম বলে তারা এ সম্পর্কে সরেজমিনে অবগত নয়। এই অপারেশন মুজাহিদীনের পরিকল্পনায়ই হয় এবং তারাই ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহই জেলের ভেতর থেকে এই অপারেশনে শরীক ছিলেন এবং সাতজন কারারক্ষী গোপনে মুজাহিদীনের সঙ্গে কাজে অংশ নেয়।

ফরাসি সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি ফাঁদ (অ্যামবুশ) (১৯৯৪ সাল)

১৯৯৪সালে ফ্রান্সের দূতাবাসের অধীনে কর্মরত ফরাসি সৈন্যদের উপর রাজধানী আলজিয়ার্সের মধ্যভাগে অবস্থিত দালি ইব্রাহিম এলাকায় অ্যামবুশ করা হয়। অতর্কিত সেই আক্রমণে পাঁচজন ফরাসি সৈনিক নিহত হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো গনীমত হিসেবে হস্তগত হয়। সে অপারেশনে নেতৃত্বদান করেন আবু আব্দুর রহমান আমীন অর্থাৎ জামাল যাইতুনী। তখন তিনি আল-মুওয়াককিউন বিদ-দাম নামক একটি গ্রুপের আমীর ছিলেন। তিনি শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাতের পর GIA-এর আমীর নিযুক্ত হন।

---

[৩২] শাইখ আবু ইব্রাহিম মোস্তফার প্রকৃত নাম নাবিল সাহরাবী। বাটনা শহরে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শহরের কলেজ থেকেই থার্মাল এনার্জিতে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলেন। নিজ শহরে ১৯৯২ সালে জিহাদ সূচনাকারীদের তিনি একজন ছিলেন। অতঃপর তাঁকে পঞ্চম এলাকার আমীর বানিয়ে দেয়া হয়। জমাদিউস সানি ১৪২৪ হিজরী মুতাবেক আগস্ট ২০০৩ সালে 'আল-জামায়াতুস সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল'-এর নীতি নির্ধারণী মজলিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান। অতঃপর ২০০৩ সালের শরৎকালে তিনি আল-জামায়াতুস সালাফিয়া'র আমীর নিযুক্ত হন। জুন ২০০৪ সালে বিজায়া প্রদেশের ওয়াড-এল-কুসুরে তিনি শহীদ হন।

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে হামলা পরিচালনা

যেহেতু ফ্রান্স আলজেরিয়ান তাগুতি সরকারকে সহায়তা করে যাচ্ছিলো, এজন্য আলজেরিয়ার মুজাহিদীনরা ফ্রান্সের ভূখণ্ডে হামলার পরিকল্পনা করে। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহিমাহুল্লাহ দেশের বাইরে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কয়েকজন সঙ্গীকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাদের শীর্ষে ছিলেন ব্রাদার মাহাদী। আল মাহাদি ফ্রান্সের ভূগর্ভস্থ মেট্রোতে ধামাকাসহ আরও কয়েকটি সফল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো যদিও দুর্বল ছিলো কিন্তু সেগুলো মিডিয়ার শিরোনাম হয়, যা ফরাসি রাজনীতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। তখন ফ্রান্স বাধ্য হয়ে ইন্টেলিজেন্সের অফিসারদের মাধ্যমে সরাসরি 'GIA'র সঙ্গে আলোচনায় বসার চিন্তা-ভাবনা করে। এই ঘটনায় আলজেরিয়ান সরকার অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু এসব অপারেশন দীর্ঘসময় চালু রাখা যায়নি। কারণ এই সঙ্গী গ্রেফতার হয়ে যান এবং এখনও তিনি ফরাসি জেলে আবদ্ধ রয়েছেন।

সামুদ্রিক জাহাজের উপর হামলা (১৯৯৪ সাল)

১৯৯৪সালে রাজধানীর উপকূলে অবস্থিত আলজেরিয়ান নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের উপর হামলা হয়। এই ঘটনা ঘটে সেই সময়;যখন ভূমধ্যসাগর থেকে ইউরোপের দিকে ও অপরদিক থেকে পাঁচ পাঁচটি দেশের মাঝে আলজেরিয়া থেকে ইউরোপে অগ্রসর হতে চলা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পঞ্চপক্ষীয় বৈঠক চলছিলো। ঐ বৈঠকে ইতালি একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র ছিলো। এছাড়াও ইতালি কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই নিজ ভূখণ্ডের আলজেরিয়ান যুবকদেরকে গ্রেপ্তার করে যাচ্ছিলো। এর জবাবে মুজাহিদীন জিজেল শহরের উপকূলে অবস্থিত ইতালির নৌজাহাজে ৭ই জুলাই ১৯৯৪সালে হামলা করে এবং সেখানে থাকা সাতজন সেনা প্রহরীকে হত্যা করে জাহাজের সরঞ্জামাদি গনীমত হিসেবে নিয়ে যায়।

ফরাসি ইন্টেলিজেন্সের উড়োজাহাজ হাইজ্যাক (১৯৯৪ সাল)

২৪ডিসেম্বর ১৯৯৪সালে এ অপারেশন পরিচালিত হয়। এই উদ্দেশ্যে, যদি তাদের দাবি না মানা হয়, তাহলে ইলিজি মহলে মেরে উড়োজাহাজটি উড়িয়ে দেয়া হবে।

আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য সরকার (১৯৯৪ সাল)

এতদিনে যতো অপারেশন পরিচালিত হয়েছে, সবগুলোর সামষ্টিক ফলাফল এই ছিলো যে, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী মুরতাদ সংস্থাগুলোর ৩০০জন করে সদস্য প্রতি সপ্তাহে নিহত হচ্ছিলো। এ কারণে সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে জানুয়ারি ১৯৯৪-এ প্রেসিডেন্ট আলী কাফীর স্থানে এমন একজনকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসায়, জনসাধারণের মাঝে যার কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা ছিলো এবং যিনি মুজাহিদীনদের সঙ্গে সহিংস কার্যক্রম বন্ধের জন্য আলোচনা করতে সক্ষম হবেন। এজন্য জেনারেল ইয়ামিন যারবালকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। যিনি ফরাসিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৬বছর বয়সে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হোন।

ইয়ামিন যারবাল ১৯৯৪সালের বসন্তকালে সালভেশন ফ্রন্টের কারাবন্দি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু ১৯৯৪সালের শেষের দিকে আলোচনা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েই ১৯৯৫সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আত্মঘাতী হামলা (১৯৯৫ সাল)

রাজধানী আলজিয়ার্সের মাঝামাঝি অবস্থিত সেন্ট্রাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারটি ১৯৯৫সালে ফিদায়ী হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এটি ছিলো আলজেরিয়ার প্রথম ফিদায়ী হামলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইউরোপ থেকে আলজেরিয়ার জিহাদে সহায়তা

যখন আলজেরিয়ার অভ্যন্তরে জিহাদী কার্যক্রম জোরালোভাবে চলমান, অপরদিকে রাষ্ট্রের বাইরের বিভিন্ন দিক থেকেও মুজাহিদীনকে সাহায্য-সহায়তা দানের জন্য মুসলমানরা উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন এবং সেখানকার মুজাহিদীনদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যার আলোচনা সামনে করবো।

এমনিভাবে মিশরের জামাআতুল জিহাদের আমীর ডক্টর আইমান আল-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ ওই সময় GIA-এর আমীর যাইতুনীর সঙ্গে জিহাদে সাহায্যের জন্য পত্রবিনিময় করেন।

আর লিবিয়ার 'আল-জামাআত আল-মুকাতিলা' সেদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদীনদেরকে আলজেরিয়ার জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য প্রেরণ করে।

আলজেরিয়ার পূর্বদিকের তিউনিশিয়া এবং পশ্চিমের মরক্কোর মুজাহিদীনরা গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক সাহায্য সরবরাহ করেন।

আফ্রিকার পর আলজেরিয়ার জিহাদের জন্য আসা সাহায্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসাঞ্চল ছিলো খোদ ইউরোপ। এখন আমরা প্রথমে ইউরোপের কথা আলোচনা করবো।

আলজেরিয়ার জিহাদে ইউরোপ থেকে আসা সাহায্য-সহায়তা

আফগানিস্তানে রাশিয়ার ভরাডুবির পর যখন আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলো গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন আরব মুজাহিদীন আফগানিস্তান থেকে বের হতে আরম্ভ করে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের ধর্মহীন সরকারের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অগণিত যুবক ইউরোপের দেশগুলোতে হিযরত করতে বাধ্য হয়। এভাবেই বিভিন্ন জিহাদী চিন্তাধারা ইউরোপের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাছাড়া ইউরোপে পূর্ব থেকেই ইসলামী জাগরণের বিভিন্নধারা নিজেদের কেন্দ্র ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম চালু করেছিলো। তৎকালে পুরো ইউরোপে প্রায় চার কোটি(৪০ মিলিয়ন)মুসলমান বিদ্যমান ছিলো। এমনিভাবে সে সময় ইউরোপ এবং বিশেষত লন্ডন ইসলামপন্থিদের কার্যক্রম ও সক্রিয়তার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রিটেন সরকার আলজেরিয়ার মুজাহিদীন এবং অন্যান্য ইসলামপন্থিদের থেকে বাহ্যত দৃষ্টি সরিয়ে রাখে; বরং সরকারের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো, যেন তাদেরকে সমর্থন করে। এ কারণে বহু আলজেরিয়ান মুজাহিদীন ভেবেছিলো, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার ঐতিহাসিক শত্রুতার কারণে ব্রিটেন সরকার তাদের পিছু লাগবে না। অথচ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সবকিছুই গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলো।

তৎকালে লন্ডনে তিনটি জিহাদী গ্রুপের সদস্য বিদ্যমান ছিলো:মিশরের জামাআতুল জিহাদ, লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলাহ এবং শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে সম্পৃক্ত কতক ব্যক্তি।

সে সময় এটা সম্ভবপর ছিলো যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সীমিত পরিসরে যে সুযোগ দেয়া রয়েছে, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে। কিন্তু শর্ত হলো ইসলামপন্থিদের পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতার মূলনীতি ও শর্তগুলো পুরোপুরি পাবন্দি করতে হবে। তারা এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, যা বৃটেনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ ছিলো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ এসব কাজে যেকোনো রকম ভুলের আশঙ্কা ছিলো বহুমাত্রায়। তবুও জিহাদী প্রচারণার জন্য সুযোগ হিসেবে এটাও একেবারে খাটো ব্যাপার ছিলো না।

টনি ব্লেয়ার আসার আগ পর্যন্ত এই সুযোগ অত্যন্ত অনুকূল ছিলো। কিন্তু সে এসে ব্রিটিশ রাজনীতিকে মার্কিন দক্ষিণপন্থি রাজনীতির তাবেদার বানিয়ে দেয়। আর অপরদিকে মুজাহিদীন এবং তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীদের কিছু ভুল পদক্ষেপ শর্তসাপেক্ষের ঐ সীমিত স্বাধীনতার পথ বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার পর লন্ডনে সাধারণভাবে জিহাদের সঙ্গে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত তিন শ্রেণির লোক অবশিষ্ট থাকে:গ্রেপ্তার মুজাহিদীন, জিহাদ পরিত্যাগকারী অথবা গুপ্তচর।

আল-আনসার ম্যাগাজিন, লন্ডন

শর্তসাপেক্ষ ও সীমিত স্বাধীনতা থাকাকালে GIA ব্রাদার আবু ফারেস রশিদ রামাদাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়, যেন সেখানে গিয়ে তিনি মিডিয়া দপ্তর আল-আনসার অফিস দেখাশোনা করেন। সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং GIA-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

পূর্ব আলজেরিয়ার টেবেস্সা প্রদেশের মুজাহিদ আবু ফারেস। তিনি আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র জামআতের সঙ্গে সংযুক্ত হন। সে সময়ই কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ তাঁকে মিডিয়ার দায়িত্ব সামলানোর জন্য নিযুক্ত করেন। আবু ফারেস লন্ডন থেকে এবং আলজেরিয়ার মুজাহিদীনকে পুরোপুরি সমর্থন করে আল-আনসার ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। আল-আনসার ম্যাগাজিনের আলজেরিয়ান গ্রুপ সেসময় লন্ডনে অবস্থানকারী প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও জিহাদী স্বপ্নদ্রষ্টা শাইখ আবু মুসআব সূরী রহিমাহুল্লাহ এবং ফিলিস্তিনি মুজাহিদ, আলিমে দ্বীন শাইখ আবু কাতাদাহ হাফিযাহুল্লাহ—উভয়ের কাছ থেকে ভরপুর ফায়দা হাসিল করেন। ১৯৯৫সালের

মাঝেই আনসার ম্যাগাজিন ইসলামী জাগরণের ধারাগুলোয় গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করে।

লন্ডনে মুজাহিদীনরা যখন কোণঠাসা হতে থাকে, তখন ১৯৯৫সালের গরমের মৌসুমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশফোর্স আল-আনসার ম্যাগাজিনের দপ্তর ঘেরাও করে আবু ফারেসকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি বৃটেনে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের নকশাকারী। এভাবে অভিযুক্ত করে তাঁকে দশ বছর বৃটেনের জেলে আটকে রাখা হয়। ২০০৬সালে ব্রিটেনে তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফরাসি সরকারের কাছে সোপর্দ করে দেয়। আর তিনি সেই ব্যক্তি;যার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে ঘটমান কয়েকটি ধামাকা ও সহিংস অপারেশনের অভিযোগ ছিলো। সেখানে তাঁকে ১৫বৎসরের কারাদণ্ড শোনানো হয় এবং এখন পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের কারাগারে রয়েছেন। আল্লাহ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন!

শাইখ আবু মুসআব আস-সূরীর (আল্লাহ তাআলা তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন!) বিশাল ভূমিকা

আফগানিস্তানের জিহাদ চলাকালে শাইখ আবু মুসআব সূরীর সঙ্গে কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ'র সাক্ষাতের পর তাঁদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়াতে জিহাদ আরম্ভ করার ব্যাপারে যখন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তখন শাইখ আবু মুসআব সূরী তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয় এবং মুজাহিদদের মাঝে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শাইখ আবূ মুসআব সূরী স্পেনে চলে যান। সেখানে থাকাকালে কারী সাঈদ রহিমাহুল্লাহ ফোন করে লন্ডনে GIA-এর মিডিয়া সেলের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেন।

এভাবেই ১৯৯৩সালের শেষের দিকে শাইখ আবু মুসআব সূরী আলজেরিয়ার জিহাদে সাহায্যের জন্য লন্ডন চলে যান। সে সময়ের মধ্যে GIA আলজেরিয়াতে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলো। শাইখ আবূ মুসআব ১৯৯৪ ও ১৯৯৫সালের সময়টাতে আল-আনসার ম্যাগাজিনের জন্য বিরাট অবদান রাখেন। তাঁর সশরীরে আলজেরিয়ায় যাওয়ার অভিপ্রায় ছিলো। কিন্তু যাদের সঙ্গে তিনি প্রোগ্রাম সাজান, তাঁরা সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যান।

১৯৯৭সালে যখন একদিকে আলজেরিয়ার জিহাদে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, অপরদিকে মুজাহিদীন লন্ডনে কোণঠাসা হতে আরম্ভ করে, আবার তৃতীয়দিকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সুসংহত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন শাইখ আবু মুসআব আফগানিস্তানে চলে আসেন। শাইখ আবু মুসআব লিখেন যে, যখন তিনি GIA-এর মিডিয়া সেলের সঙ্গে কাজ করার উদ্দেশ্যে লন্ডনে পৌঁছান, তখন সেখানে কয়েকটি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত পেরেশান/চিন্তিত হন। কাজের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন দশা ও নিরাপত্তা-অনুভূতির অভাব এবং মিডিয়া সেলকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অন্যান্য জিহাদী কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। এসব বিষয় দেখে প্রথমদিকে শাইখ কাজ করার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন, কিন্তু কল্যাণকামিতা এবং কল্যাণের পথে সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা তাকে ঐ সকল ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করে।

শাইখ আবু কাতাদাহ হাফিযাহুল্লাহ'র কীর্তি

যে সময়ে শাইখ আবূ মুসআব সূরী লন্ডন থেকে দ্বিতীয়বারের মত স্পেনে চলে যান;সেখানে থাকা তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে লন্ডনে পূর্ণ প্রস্তুতিসহ ফিরে আসার জন্য, ঠিক সেসময় জর্দানের নাগরিকত্বের অধিকারী প্রসিদ্ধ ফিলিস্তিনি মুজাহিদ আলিমে দ্বীন শাইখ আবু কাতাদাহ লন্ডনে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯৯১সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় শাইখ আবু কাতাদাহ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের বিরোধিতা করেন। সেসময় জর্ডান সরকার কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলো। জর্ডান সরকারের পক্ষ থেকে চাপের মুখে শাইখ আবু কাতাদাহ ১৯৯২সালে আফগানিস্তানে চলে যান। কিন্তু তখন অধিকাংশ মুজাহিদ খোদ আফগানিস্তান ত্যাগ করছিলো। তাই ১৯৯৪সালে শাইখ আবু কাতাদাহও লন্ডনে চলে যান।

লন্ডনে পৌঁছে তিনি সেখানকার একটি হলকে মসজিদ বানান এবং অন্যান্য দাওয়াতী কার্যক্রমের পাশাপাশি জুমআর খুতবাও প্রদান করতে থাকেন। তাঁর মসজিদটি মুজাহিদীন এবং তাদের ভক্ত-সহযোগীদেরসহ ইসলামী জাগরণের অন্যধারাগুলোর জন্য দাওয়াতী ও কল্যাণমুখী কার্যক্রমের এবং পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মারকায হিসেবে সামাজিক ভূমিকা পালন করে।

শাইখ আবু কাতাদার ইলম, আবেগঘন বক্তৃতা এবং জিহাদের সমর্থনে তাঁর আশপাশে অগণিত যুবক একত্রিত হয়। এমনিভাবে শাইখ আবু কাতাদাহ ঐ সময় আল-আনসার ম্যাগাজিনে সমকালীন বিভিন্ন ইস্যুর পাশাপাশি আলজেরিয়ার জিহাদ বিষয়ে সমর্থনমূলক লেখালেখি করেন।

১৯৯৫সালে আবু ফারেস গ্রেফতার হওয়ার পর কার্যত আল-আনসার ম্যাগাজিনের দায়িত্বাবলী শাইখ আবু কাতাদাহর হাতে চলে আসে। GIA-এর গুমরাহী ও বিভ্রান্তি এবং সে বিভ্রান্তির পথ বন্ধ করার জন্য লন্ডনে আল-আনসার ম্যাগাজিন, ঐ দুই শাইখ এবং লন্ডনে অবস্থানকারী অন্যান্য জিহাদী ব্যক্তিত্ব ও গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিলো, যা আমরা সামনে বর্ণনা করবো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ আফ্রিকা থেকে আলজেরিয়ার নুসরত

মরক্কো সরকারের ভূমিকা

প্রথমদিকে বহিরাগত মুজাহিদীনরা মরক্কোর গোপন পথ ব্যবহার করে আলজেরিয়াতে প্রবেশ করতো। যখন মরক্কোর বাদশাহী হুকুমত আলজেরিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক শত্রুতার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি সরিয়ে রাখতো, তখনই মুজাহিদীনের জন্য এই সুযোগটি খোলা ছিলো। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি আলজেরিয়ায় নেয়া হতো। কিন্তু ফরাসি চাপের মুখে শীঘ্রই মরক্কো এই পথ বন্ধ করে দেয়;বিশেষত GIA-এর আমীর আবদুল হক লিইয়াদা ১৯৯৩সালে মে মাসে মরক্কোতে গ্রেফতার হওয়ার পর।

ঘটনা হলো, তিনি সেসময় আলজেরিয়ার বাইরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়-বিষয়ে বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। সেই বৈঠকে আলজেরিয়ার ভিতরেরও ক'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন শাইখ **আবু আইমান মুসআব**, শাইখ **আবু আব্দিল গাফফার রিজওয়ান উশায়র**[৩৩] এবং শাইখ **আবু ফাতেমা সুলাইম কায়িম**[৩৪]—রহিমাহুল্লাহুম।

---

৩৩ উভয় শাইখের পরিচিতি সামনে আসবে।

৩৪ সুলাইম কায়িমের জিহাদী সারসংক্ষেপ বলতে গেলে তিনি ছিলেন আবু ফাতেমা বেলাল। তিনি ১৯৬১ সালে কনস্টানটিনে জন্মগ্রহণ করেন। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে আফগানিস্তানের জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনিও আলজেরিয়ায় জিহাদ সূচনাকারীদের একজন। কনস্টানটিনে সামরিক কমান্ডার ধরা হত তাঁকে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কয়েকটি সফল সামরিক অপারেশনে

সুদানে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ (১৯৯৩ সাল)

মরক্কোর পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন GIA-এর পক্ষ থেকে শাইখ আবুল লাইস আল-মুসাইলী রহিমাহুল্লাহ বাইরের সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এ কাজের জন্য শাইখ আবুল লাইস আল-মুসাইলী ১৯৯৩সালের গরমের মৌসুমে সুদানে গমন করেন, যাতে সুদানে থাকা তৎকালীন অন্যান্য জিহাদী গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে প্রোগ্রাম সেট করা যায়। শাইখ আবুল লাইস আল-মুসাইলী শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র মিডিয়া দপ্তরে GIA-এর একটি শাখা সফলভাবে দাঁড় করান। অতঃপর তিনি সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য পেশোয়ারে গমন করেন।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র অবদান ও কীর্তি (১৯৯৪ সাল)

আল-কায়েদার প্রসিদ্ধ মুরুব্বী শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র আলজেরিয়াতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। তাঁর অবদান অনেক পুরানো। তিনি আলজেরিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র লিবিয়া থেকে এসেছেন। সর্বপ্রথম শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ নিজ উদ্যোগে আলজেরিয়াতে ১৯৮৯সালে গমন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহকর্মী শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-ফকীহ বলেন-

"১৯৮৯সালে লিবিয়ার তাগুত সরকার দ্বীনদার যুবকদেরকে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে। তখন শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ অপর কিছু সঙ্গীকে নিয়ে আলজেরিয়া অভিমুখে হিযরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময় সালভেশন ফ্রন্ট নিজের সেরা সময়টা পার করছিলো। আলজেরিয়ায় আমরা এক মাস অবস্থান করি। সে সময় শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ, শাইখ আলী বালহাজ এবং ডক্টর আব্বাসী মাদানীর লেকচার ও বক্তৃতাগুলো আমরা গুরুত্বের সঙ্গে শুনতাম। ইসলামী আন্দোলনের যুবকদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতাম। এরই ধারাবাহিকতায় শাইখ আতিয়াতুল্লাহ প্রবীণ শাইখ আহমদ সাহনূনের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন।"

নেতৃত্বদানের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁর মধ্যে একটি ছিলো জিজেল শহরের আত-তাহিরে সেনা ক্যাম্পের ওপর হামলা। সে অপারেশনের হালকা অস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গনীমত হিসেবে হস্তগত হয়েছিলো। অতঃপর তিনি স্কিকদা প্রদেশে আমীর নিযুক্ত হন। স্কিকদা ও কনস্ট্যানটাইন প্রদেশের মাঝামাঝি এক স্থানে ডিসেম্বর ১৯৯৪সালে শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু পরেরবার শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র নির্দেশনা অনুযায়ী আলজেরিয়ার জিহাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি আলজেরিয়ায় গমন করেন। যেমন শাইখ আল-ফাকীহ-শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আত্মস্মৃতিচারণকালে বলেন,

"আমি দুইবার আলজেরিয়ায় প্রবেশ করেছি। প্রথমবার প্রবেশ করেছি ১৯৯৩সালে এবং ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে বের হয়ে এসেছি। অতঃপর দ্বিতীয়বার ১৯৯৪সালের শেষের দিকে প্রবেশ করি এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি। দ্বিতীয়বার যখন আমি সেখানে প্রবেশ করি, তখন কারী সাঈদ জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। এ ছিলো ঐক্যের সময় এবং শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদের শেষ দিনগুলোর কথা। আর যখন বের হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সালভেশন ফোর্সের তরফ থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতির সময় চলছিলো।

প্রথমে আমরা ব্রিটেনে অবস্থানকারী শাইখ আবুল মুনযির এবং আল-জামাআতুল লিবিয়া আল-মুকাতিলা'র সঙ্গে ফোনালাপ করতাম। তিনিই আমাদের এবং সুদানের সঙ্গীদের মাঝে (শাইখ উসামা এবং অন্যরা) যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন। আমি তাঁকে ফোন করে বলতাম, ভাইদেরকে ওখানে এ সংবাদ জানিয়ে দিন। তখন তিনি সুদানে লিবিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ব্রাদার আনাস সাবিঈকে অবহিত করতেন। কারণ তিনি সেসময় শাইখ উসামার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। "

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, পরবর্তীতে যখন GIA-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠে, তখন তিনি একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে পত্রপ্রেরণ করেন। তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে-

"আমি শাইখ উসামার জন্য পত্রপ্রস্তত করে প্রতিনিধির মাধ্যমে সুদানের ভাইদের কাছে পৌঁছে দিতাম। সেইসূত্রে আমি আলজেরিয়ায় কিছুদিন অবস্থানের অনুমতি চাই। তখন তিনি জবাব দেন:ঠিক আছে, থাকুন, কোনো অসুবিধা নেই। "

নাইজারের মরু অঞ্চল এবং শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র পত্রবাহক (১৯৯৪ সাল)

মরক্কোর পথ বন্ধ হওয়ার পর নাইজারের মরু অঞ্চলে প্রথমবারের মতো আলজেরিয়ান মুজাহিদীন ১৯৯৪ সালে প্রবেশ করে। তখন ব্রাদার খালিদ আবুল

আব্বাস[৩৫] আমীর হয়ে একটি গ্রুপ নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি আশ-শাহাদা ব্রিগেডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এই ব্রিগেড ঘরডাইয়া প্রদেশের মরু অঞ্চলে সক্রিয় ছিলো। তাতেই ব্রাদার আলহাজ্ব, নাজির এবং ইসমাইল ছিলেন। তাদেরকে ১৯৯৬সালে শহীদ করে দেয়া হয়।

মরু অঞ্চলে ব্রাদার খালিদ আবুল আব্বাসের সাক্ষাৎ হয় হাসান আল্লাম রহিমাহুল্লাহ'র[৩৬] সঙ্গে। তিনি সাহারা অঞ্চলে কাজ করার জন্য আগে থেকেই পথ

---

[৩৫] খালিদ আবুল আব্বাসের প্রকৃত নাম মুখতার ইবনে মুহাম্মাদ বিল-মুখতার। ঘরডাইয়া শহরে ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খোরাসানের ভূখণ্ডে হিযরত করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২০ বছরেও গড়ায়নি, তখন থেকেই তিনি আপন মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যুদ্ধে যার একটি চোখ শহীদ হয়ে যায়। এ কারণেই আলজেরিয়ার প্রচারমাধ্যমগুলো তাঁকে কানা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। যখন আলজেরিয়ায় জিহাদ শুরু হয়, তখন তিনি জিহাদের ঝাণ্ডাবাহী কাফেলায় প্রথম কাতারের ঘোড়সওয়ারদের একজন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আল-জামাআহ সাময়িকীর সপ্তম সংখ্যায় রয়েছে, যা 'আল জামায়াতুস সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল' প্রকাশ করতো। এই সামরিকীর সঙ্গে তাঁর একটি আলাপচারিতার রেকর্ড রয়েছে। মহান এই নেতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য এই উৎসগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি তানযীম আল-কায়েদা ইসলামী মাগরিব শাখার পক্ষ থেকে মালি ও নাইজার সংলগ্ন সাহারা মরুভূমির এক অংশে কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

[৩৬] শাইখ হাসান আল্লাম আলজেরিয়ার সাহারা অন্তর্গত শহর 'আলমানীয়া' থেকে এসেছেন। যেখানে তিনি সালভেশন ফ্রন্টের একজন প্রতিনিধি বলে গণ্য হতেন। তিনি মুত্তাকী, পরহিজগার এবং নীরব স্বভাবের লোক ছিলেন। আলজেরিয়া ও নাইজারের মাঝে তিনি বাণিজ্য করতেন। ১৯৯১ সালের হরতালের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং নির্বাচনের কিছুদিন আগে যখন তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়, তখন তিনি নাইজারে চলে যান। সেখানে তিনি দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করার পাশাপাশি নিজেকে জিহাদের খিদমতে ওয়াকফ করে দেন। বাণিজ্যের পাশাপাশি সাহারায় তিনি একটি কল্যাণ সংস্থায় কাজ করতেন। তারই সূত্র ধরে শাইখ উসামা'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, শাইখ উসামাকে ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মের সময়টায় সাহারা মরুভূমিতে আশ্রয় দেবেন, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি। শাইখ হাসান ১৯৯৪ সালে ব্রাদার খালিদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত সাহারায় থাকেন। অতঃপর যখন GIA-এর মধ্যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়ে যায় এবং শাইখগণ ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মের সময় GIA-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেন, তখন শাইখ হাসান আলাদা হয়ে নাইজেরিয়া অভিমুখে গমন করেন। ২০০০ সালে পুনরায় আলজেরিয়ায় আসেন, যখন আল-জামাতুস সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতালের মুজাহিদীনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর ২০০২ সালে অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে পঞ্চম অঞ্চল (টেবেস্সা প্রদেশ) -এ অসুস্থ ও দুর্বল বয়সের হওয়া সত্ত্বেও একটি ব্রিগেডে শামিল হয়ে যান। আব্দুর রাযযাক আবু হায়দারাহ ওরফে আল-বারা (আল্লাহ তাআলা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন!)-'র সঙ্গে ২০০৩ সালে শাইখ হাসান জার্মান নাগরিকদের হাইজ্যাক সহ অন্য সঙ্গীরা যতো রকম কঠিন অবস্থা অতিক্রম করছিলো, সবগুলোতেই অংশ নেন। অতঃপর একই বছর দ্বিতীয়বার

প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এবং নাইজার ও নাইজেরিয়ার বিভিন্ন শ্রেণির লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, যেন আলজেরিয়ার সীমানার ভেতর অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছানোসহ সেখানকার মুজাহিদীনকে সবদিক থেকে সাহায্য করা যায়। সাহারায় মুজাহিদীনরা এই শাইখের অধীনে আলজেরিয়ান সরকারের অনুগত কোম্পানিগুলোর গাড়ি লুট করত এবং সেগুলো বিক্রি করে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলির মজুদ ক্রয় করত।

ওই সময়ই শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে GIA-এর নেতৃবৃন্দের জন্য একজন পত্রবাহক পয়গাম নিয়ে আসে[৩৭]। শাইখ উসামার বার্তা GIA-এর নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্রাদার খালিদ আলজেরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং ব্রাদার আহমদ আল-জাযায়েরি আফগানী রহিমাহুল্লাহ[৩৮] কে শাইখ হাসানের সঙ্গে রেখে আসেন, যেন তিনি নাইজেরিয়ায় অতিথিকেন্দ্র স্থাপন করেন, মরু সাহারায় নিজ সক্রিয়তা অব্যাহত রাখেন এবং বাইরের সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বহাল রাখেন;বিশেষত ব্রিটেনে আল-আনসার ম্যাগাজিনের অফিসের সঙ্গে।

সাহারায় যান এবং সেখানেও আব্দুর রাযযাকের সঙ্গে সক্রিয় থাকেন। তিনি সর্বপ্রথম নাইজেরিয়ার আমীর ইউসুফের মাধ্যমে (যিনি প্রসিদ্ধ শাইখ মুহাম্মদ ইউসুফ নন) মরু অঞ্চলের সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্বহাল করেন। যাতে তিনি সাহারায় অবস্থানকারী মুজাহিদীনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

আনুমানিক ৬৫ বছর বয়সে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী আমীর ইউসুফ, এছাড়াও টেবেস্‌সা'র শাদ্দাদ নামক অপর একজন আলজেরিয়ান ভাই ২০০৪ সালে শান্টা বারডীন নামক মরু অঞ্চলের একটি শহরে নাইজার বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রহম করুন!!

[৩৭] খুব সম্ভবত এটা সে সময়ের কথা, যখন কিছুদিনের জন্য শাইখ আতিয়াতুল্লাহ'র যোগাযোগ আল-কায়েদার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। নয়তো তিনি আলজেরিয়ায় থাকা অবস্থায় অপর কোন প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়টা বুঝে আসে না।

[৩৮] বারাদার আহমদ আল-জাযায়েরি আফগানী ঘরডাইয়া প্রদেশ থেকে এসেছেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে আফগানিস্তানের জিহাদে ব্যাপৃত ছিলেন। একটি মাইন বিস্ফোরণে তাঁর পায়ের নিম্নাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আফগানিস্তান থেকে ইয়েমেন এবং ইয়েমেন থেকে ১৯৯৫ সালে তিনি নাইজেরিয়ার সাহারায় পৌঁছেন। সেখানেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। অবশেষে নাইজারের সাহারায় নাইজারিয়েন সরকারি বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে তিনি শহীদ হয়ে যান।

শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে GIA-এর নামে পয়গাম

ব্রাদার খালিদ শাইখ উসামার পত্রবাহককে সঙ্গে নিয়ে আলজেরিয়ায় প্রবেশ করেন। সেখানেই তিনি নিজ আমীর আব্দুল বাকি[৩৯]'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যিনি গোটা নবম অঞ্চলের আমীর ছিলেন। আব্দুল বাকি পত্রবাহকের কাছ থেকে শাইখ উসামার পত্র গ্রহণ করেন এবং তা GIA-এর নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিজেও খালিদ সাহেবের সঙ্গে কেন্দ্র অভিমুখে রওয়ানা হন। পত্রের সারসংক্ষেপ এই ছিলো যে, শাইখ উসামা আলজেরিয়ার জিহাদে সাহায্যের উদ্দেশ্যে GIA-এর সঙ্গে কাজে অংশ নিতে এবং সহযোগিতা করতে উৎসাহী আছেন। সে সময় GIA-এর আমীর জামাল যাইতুনী ছিলেন। যাইতুনী ব্রাদার আব্দুল বাকিকে এ বিষয়টি দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেন এবং পত্রের লিখিত জবাব নিয়ে রওনা দেন।

সেই উত্তরপত্রের সারসংক্ষেপ ছিলো, GIA-ও একইসঙ্গে কাজ করতে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে আগ্রহী ও সম্মত। আব্দুল বাকি এবং খালিদ সাহেব নবম অঞ্চলে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে খালিদ সাহেব শাইখ উসামার পত্রবাহককে সঙ্গে নিয়ে নাইজারের সাহারা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর সেখান থেকে পত্রবাহক পত্রের জবাব নিয়ে সুদানে চলে যায়।

---

[৩৯] আব্দুল বাকী এসেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম আলজেরিয়ার প্রদেশ লেঘাউট থেকে। তিনি ইবাদতগুজার, মুত্তাকী, বিনয়ী এবং আপন সঙ্গীদের মাঝে খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে খুলদুন ও বারী সেনা প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁর যাতায়াত ছিলো। অতঃপর আলজেরিয়ায় জিহাদের সূচনাকালে তিনি আলজেরিয়ায় চলে আসেন এবং নিজ এলাকায় (লেঘাউট) সক্রিয় থাকেন। অতঃপর আবু তালহা আল জুনুবী'র নেতৃত্বে আন্নাবা এলাকায় সক্রিয় হন। কিন্তু এরপর দ্বিতীয়বার নিজ এলাকা অর্থাৎ নবম অঞ্চলে চলে আসেন এবং আমীর নিযুক্ত হন। GIA-এর বন্টন অনুযায়ী জেলফা, লেঘাউট, ঘরডাইয়া এবং মালি, মৌরিতানিয়া ও নাইজারের সীমান্ত পর্যন্ত সাহারা অঞ্চল ছিলো তাঁর দায়িত্বে। তিনি শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটি বড় অপারেশন পরিচালনা করেছেন। নিজ এলাকার নামের দিকে সম্বন্ধিত তাঁর ব্রিগেড মূল জামাআতের অন্য সকল ব্রিগেডের মধ্যে সক্রিয়তায় শীর্ষে ছিলো।

আব্দুল বাকী মুরতাদ সরকারের হাতে এক মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানির জবাবে লেঘাউট শহরের ঠিক মাঝের দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে একটি বড় অপারেশনে শহীদ হয়ে যান। সেই অপারেশনের আগে তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিরা মউতের বাইয়াত সম্পন্ন করেছিলেন। এই অপারেশন ১১ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। তাতে একশ'র অধিক সেনা নিহত হয়। এটি ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকালের ঘটনা।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ কর্তৃক শাইখ উসামার নামে পত্র প্রেরণ

কিন্তু পত্রবাহক পত্রের জবাব নিয়ে সুদানে পৌঁছাবার আগেই শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি শাইখ উসামার কাছে পৌঁছে যায়। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ সে সময় GIA-এর সঙ্গে আলজেরিয়াতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি শাইখ উসামাকে GIA-এর গুমরাহী এবং কট্টরপন্থা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি অবহিত করেন। এরই প্রেক্ষিতে শাইখ উসামা GIA-এর সঙ্গে কাজ করা থেকে পিছিয়ে আসেন।

জিহাদী মাশাইখ কর্তৃক আলজেরিয়ায় প্রবেশের প্রয়াস

এই সময়টাতে জিহাদী গ্রুপগুলোর কতক নেতা আলজেরিয়ায় প্রবেশের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাইয়াতের ব্যাপারে GIA-এর কঠোর অবস্থানের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। তাদের মাঝে শাইখ আবুল ওয়ালিদ আলগাজী আনসারী (আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুক্তি দান করুন), আবুল ফারাজ আল মাসরি রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ আবু ইয়াসির আল মাসরি উল্লেখযোগ্য।

বহিরাগত সাহায্যের পথ বন্ধ (১৯৯৬ সাল)

১৯৯৬সালে আব্দুল বাকি একটি অপারেশনে শহীদ হলে খালিদ সাহেব নিজের গ্রুপসহ নাইজারে চলে যান। এরই মধ্যে নবম অঞ্চল আমীর নিযুক্তির জন্য একটি প্রতিনিধি দল যাইতুনীর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি খালিদ সাহেবকেই নবম অঞ্চলের আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

যখন শাইখ উসামা এবং অন্যান্য জিহাদী জামাআতগুলোর তরফ থেকে সাহায্যের আর কোনো আশা রইল না, তখন GIA নতুন আমীর খালিদ আবুল আব্বাসকে অর্থ দিয়ে এ বিষয়ে দায়িত্ব নিশ্চিত করতে বলেন যে, তিনি সাহারার মধ্য দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আলজেরিয়ার সীমানায় প্রবেশ করাবেন। কিন্তু জিহাদী শাইখদের তরফ থেকে GIA-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার পর শাইখ খালিদের সঙ্গী আহমদ জাযায়েরি আফগানী এবং শাইখ হাসান কাজ ছেড়ে দেন। এভাবেই বহিরাগত সাহায্যের একেকটি পথ বন্ধ হতে থাকে।

লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলাহ'র ভূমিকা

লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলাহ তার দেশের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদীনকে পাঠিয়েছিল, যেনো তারা আলজেরিয়ান মুজাহিদীনকে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত GIA-এর নেতৃবৃন্দ তাদের সামরিক প্রতিভা কাজে লাগানোর পরিবর্তে তাদের কতককে হত্যা করে আবার কতককে দূরবর্তী এলাকায় সাধারণ মুজাহিদীনদের মতো করে রাখে। তাদের সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ'র 'আ'মালে কামেলা'র 'আনাল মুসলিম' ফোরামের সঙ্গে আলাপচারিতায়। এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ'র আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ক অডিও ফাইলে থাকা লিবিয়ার মুজাহিদীন সম্পর্কিত কিছু কথা উদ্ধৃত করছি। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"যে সময় যাইতুনী আমাকে এবং আব্দুর রহমান আল-ফাকীহকে হত্যা করার চিন্তা-ভাবনা করছিলো, তখন আমি আব্দুর রহমান, আসিম এবং সখরের কাছে যাই। আমরা চারজন ছিলাম। তার আগেই অবশিষ্ট ছয়জন লিবিয়ান সঙ্গী পূর্বদিকে বের হয়ে যান, যেখানে আল-জামাআতুল মুকাতিলা'র কিছু সদস্য পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলো। আমি ছাড়া বাকী সকলেই মুকাতিলার সদস্য ছিলো।

সখর সামরিক লোক ছিলেন। ট্যাকটিকস ও অপারেশন পরিচালনার কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষক ছিলেন। মুকাতিলাহ তাঁকে আলজেরিয়ান মুজাহিদীনের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। এদিকে আসিম দলীল-দস্তাবেজ ও প্রমাণপত্র তৈরিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনিই আমার জন্য পাসপোর্টে নকল ভিসা লাগান। এক্সপ্লোসিভ বিষয়েও তার দক্ষতা ছিলো। আবার ওয়ার্কশপের কাজকর্মেও পারঙ্গম ছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করতেন আবার নিজেও তৈরি করতেন। তারা ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে সুদানে ভাইদের (আল-কায়েদার) পক্ষ থেকে বলার পরিপ্রেক্ষিতে আলজেরিয়ায় সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আলজেরিয়ান মুজাহিদরা তাদেরকে কোনো কাজে লাগায়নি। আসিম আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চলে আসেন কিন্তু সখর রাজী হননি। অবশেষে আনতারের আমলে GIA তাঁকে শহীদ করে দেয়। "

অপরদিকে আব্দুর রহমান আল-ফাকীহের ব্যাপারে বলেন-

“আব্দুর রহমান আল-ফাকীহ সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেনে কারারুদ্ধ। তিনি লিবিয়াতেও আমার বন্ধু, সহযোগী এবং জিহাদী কাজে সঙ্গী ছিলেন। আমরা ১৯৮৯সালে প্রথমবার জিহাদের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে আলজেরিয়ায় গমন করি। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আমরা আলাদা হয়ে যাই। এখন আবার ঘটনাক্রমে আলজেরিয়ায় আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা চার বছর এখানে এক সঙ্গে কাটাই। লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলাহ'র সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিলো। আর আমি সেখানে আল-কায়েদার দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। ”

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ জামাল যাইতুনি এবং চরমপন্থার যুগ (১৯৯৪—১৯৯৬ সাল)

এখান থেকে আলজেরিয়ার জিহাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে;যা আলজেরিয়াতে জিহাদ অবলুপ্তির কারণ হয়েছিলো। আর তা হলো- GIA কর্তৃক ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ ছেড়ে প্রান্তিকতা, বাড়াবাড়ি, অপাত্রে কঠোরতা ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার আলোচনা। এই চরমপন্থার প্রথম পর্যায় ছিলো জামাল যাইতুনী'র আমল আর দ্বিতীয় যুগ ছিলো সে নিহত হওয়ার পর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আনতার যাওয়াবেরী'র নেতৃত্বকাল। জামাল যাইতুনী ১৯৯৪সালের অক্টোবরে GIA-এর আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৯৬সালে জুলাই মাসে তাকে হত্যা করা হয়।

GIA-এর মাঝে খারিজী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ

জামাল যাইতুনী এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গুমরাহী ও বিভ্রান্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করার পূর্বেই বলবো, GIA-এর মাঝে খারিজী চিন্তাধারা কীভাবে অনুপ্রবেশ এবং বিস্তৃতি পায় সে বিষয়ে। এই ব্যাপারে শাইখ আসিম আবু হাইয়ান এক ইন্টারভিউতে ‘বিপথগামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরমপন্থা প্রতিহত করার আদৌ কোনো পন্থা ও উপায় রয়েছে কি-না’ এমন প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা সেসব ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরছি।

খারিজীদের খবরদারি থেকে জিহাদকে মুক্ত রাখার প্রাথমিক পলিসি (১৯৯৪ সাল)

“শরীফ কোসমি এবং তাঁরও পূর্বে GIA-এর নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন যে, খারিজী চিন্তা-ভাবনা ও মানহাজ কোনোভাবেই যেন জিহাদের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। তারা এমন চিন্তাধারার অধিকারী লোকদের ব্যাপারে শুধু সতর্ক থাকতে বলতেনই না, বরং আল-হিজরাহ ওয়াত-তাকফিরের মানহাজের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যেতো, জানা মাত্রই তাদেরকে বহিষ্কার করে দিতেন।

এ কারণেই পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে আমাদের ভাইয়েরা ১৯৯৪সালে তাজল্ট কারাগার থেকে মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে যাদের মাঝে খারিজী চিন্তাধারা কিছুটা হলেও অনুভব করেছেন, তাদেরকে জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হতে দেননি। তবে সেসব লোকের কথা ভিন্ন যারা তাকিয়ার ভিত্তিতে (মনের সংগোপনের আকীদা ও বিশ্বাস গোপন করা) তওবা প্রকাশ করে সংশোধিত হয়েছিলো। ”

নেতৃত্বে খারিজীদের অনুপ্রবেশ

“তাজল্ট কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আবুল বারা হুসাইন আরবাভী আল-আসিমী নামে একজন ছিলো। তার ব্যাপারে বিভিন্ন সঙ্গী সাক্ষ্য দেন যে, সে কারাগারের ভেতর খারিজী চিন্তাধারা প্রচার করতো। কিন্তু GIA-এর প্রাক্তন নেতৃবৃন্দের ভয়ে সে তাকিয়া অবলম্বন করে। মুক্তি লাভের পর মুজাহিদীনের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সে GIA-এর মারকায জিবালুশ শরীয়ায় জামাল যাইতুনির কাছে পৌঁছে যায়। জাইতুনী পরবর্তীতে তাকে শরঈ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়। ”

খারিজীদের গ্রুপ

“অপরদিকে খারিজী চিন্তাধারার অধিকারী সশস্ত্র একটি গ্রুপ ১৯৯৪সালের শুরুর দিকে বুমারদাস প্রদেশের বুযকারাহ পাহাড়ে কিছুটা শক্তি লাভ করে। সে সময়ে GIA-এর মুজাহিদীন তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেই গ্রুপের সদস্যরা পশ্চিমাঞ্চলে

হিযরত করে চলে যায়, যেখানে তাদের সমমনা আরও একটি গ্রুপ এল্ডফলা প্রদেশের আফরিনা পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করছিলো।

কাতাইবুত-তাওহীদ অথবা জামাআতুত-তাকফীর ওয়াল হিযরাহ

এই দুই গ্রুপ মিলে আফরিনা পাহাড়ে কাতাইবুত-তাওহীদ নামে একটি জামাআত প্রতিষ্ঠা করে। জামাআতের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৫০ থেকে ৭০-এর মাঝামাঝি। তারা মেদিয়া প্রদেশের কাসর এল বুখারী এলাকার আবদুল আযীম নামক এক লোককে নিজেদের আমীর হিসেবে নির্বাচিত করে। লোকটি পেশায় ছিলো একজন শিক্ষক। দায়িত্ব লাভের পর আব্দুল আযীম নিজের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে থাকে, যার দরুন আরও কিছু যুবক তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের দলে যোগ দেয়।

আল-খাদরা ব্রিগেডে খারিজীদের উত্থান

আল-বালিদাহ (ব্লিডা)-এর জিবালুশ-শরীয়াহ-তে GIA-এর অধীনে তাদের একটি সেনাদল ছিলো আল-কাতীবাতুল-খাদরা।

“আবদুল আযীমের দ্বারা প্রভাবিত যুবকদের মাঝে আহমদ বালহুত এবং মুস'আব আইন কারাদ নামে দুই যুবক ছিলো। আহমদ বালহুত পরবর্তীতে কাতীবাতুল-খাদরা'র শরীয়াহ দায়িত্বশীলের পদ লাভ করেন। আর মুস'আব আইন কারাদ একই ব্যাটালিয়নের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এল্ডফলায় এই পথভ্রষ্ট গ্রুপ খারিজী মানহাজ প্রকাশ্যে প্রচার করতো। এই গ্রুপের সংশ্লিষ্টরা জনসাধারণ এমনকি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত তাকফীর (কাফির আখ্যায়িত করা) করতো।

এই গ্রুপ কখনই তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, বরং দরিদ্র জনসাধারণকে তারা নিজেদের নিশানা বানায়। এল্ডফলায় বরযাত্রীদের একটি অনুষ্ঠানে এই গ্রুপ হামলা চালিয়ে অগণিত লোককে গুলি করে হত্যা করে। এমনিভাবে একই প্রদেশের একটি গ্রামের কফিশপে এই গ্রুপ হামলা চালায় এবং কমপক্ষে ৩০জন বেসামরিক লোককে গুলি করে হত্যা করে। ”

খাদরা'য় খারিজীদের চিন্তাধারা

"১৯৯৫সালের মে মাসে কাতীবাতুল-খাদরা'র প্রধানের সঙ্গে সিপাহিদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন GIA-এর পক্ষ থেকে বিচারক প্রেরণের আগে আমিও (শাইখ আসিম আবু হাইয়ান) সংশোধন-কমিটির একজন সদস্য হিসেবে সেখানে গিয়ে খারিজী মতাদর্শের বাস্তব উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি। এর পুরোভাগে ছিলো রেজিমেন্টের প্রধান ও শরীয়াহ দায়িত্বশীল এবং তাদের সঙ্গে ছিলো মোট ১৪০জন সদস্যের মধ্যে ৩০জন মুজাহিদ।

যেসব বিভ্রান্তি আমি নিজে দেখেছি এবং শুনেছি সেগুলো কিছুটা নিম্নরূপ:

১. শরীয়াহ দায়িত্বশীল এবং তার সমমনা সদস্যরা জামাআতের সমস্ত পদস্থ নেতাকে খলীফার মর্যাদা দিতো। এ কারণেই তারা যেকোনো প্রতিপক্ষকে হত্যার উপযুক্ত মনে করতো।

২. মালিকী মাযহাবের অনুসারী মুজাহিদীনকে তারা শাস্তি দিতো।

৩. জনসাধারণের কয়েকটি গ্রুপকে তারা ঢালাওভাবে তাকফীর করতো, যাদের মাঝে নিম্নোক্ত শ্রেণি উল্লেখযোগ্যঃ

ক) পাহাড়ে বসবাসকারী গ্রাম্যলোকদেরকে এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা তাকফীর করত যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন—

الأعراب أشد كفرا ونفاقا—

অর্থ: "বেদুইনরা কঠোর রকমের কুফুরি ও মুনাফেকিতে লিপ্ত। " (সূরা তাওবা-৯৭)

অথচ তারাই মুজাহিদীনের সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী ছিলো।

খ) জমিয়াতুল উলামা আল-মুসলিমীনের সকল সদস্যকে।

গ) উম্মাহ'র সাধারণ উলামায়ে কিরামকে।

ঘ) বনী মীযাব গোত্রের ইবাদী মাযহাবের অনুসারীদেরকে।

চ) নিজেদেরকে ছাড়া মুসলমানদের অন্যসকল জামাআতকে।

৫. তারা বলতো, আমরা মুরতাদ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনবছর পর্যন্ত যুদ্ধে জড়াব না, যাতে জিহাদকে বিদআতী মুক্ত করা যায়।

৬. সুন্নতে নববীর সকল প্রকারকে তারা ওয়াজিব পর্যায়ের মনে করতো।

এছাড়াও আরও অনেক বিভ্রান্তি ও গুমরাহী ছিল তাদের মাঝে। আমি তো কেবল সেগুলো বর্ণনা করলাম, যেগুলো আমি নিজে দেখেছি এবং শুনেছি। ”

আল-কাতীবাতুল-খাদরায় মুজাহিদীন-হত্যাকাণ্ড (মে ১৯৯৫ সাল)

“আল-কাতীবাতুল-খাদরায় ব্রিগেডের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সিপাহিদের মতবিরোধ মীমাংসা করার জন্য জামাল যাইতুনী প্রধান শরীয়াহ-তত্ত্বাবধায়ক আবুল-বারা হুসাইন আরবাভীকে বিচারক হিসাবে পাঠায়। (তার ব্যাপারে আমরা পূর্বেও বলেছি যে, সে খারিজী চিন্তাধারার ধারক-বাহক ছিলো, কিন্তু তাকিয়া অবলম্বন করে রেখেছিলো)। বিচারক হিসেবে সে ব্রিগেডের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধানের পক্ষকে সমর্থন করে। কারণ তারা তো এই বিচারকের মানহাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এরপর সে ব্রিগেডের কতক মুজাহিদকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং অগণিত মুজাহিদকে সেখানেই হত্যা করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৪জনকে বন্দি করে জামাল জাইতুনীর কাছে পাঠায় আর সে তাদেরকে হত্যা করে। একই সঙ্গে ব্রিগেডের অবশিষ্ট বিরোধী সদস্যদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এই বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক মুজাহিদ আমাকে বলেন যে, এক ব্যক্তি কাজী হুসাইন আরবাভীকে সাধারণ জনগণের স্ত্রী-কন্যাদেরকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম জিজ্ঞেস করে। তখন সে জবাবে বলে, এটা জায়েয আছে এবং ইনশাআল্লাহ, অচিরেই তা হতে চলেছে। ”

বিভ্রান্তির বিস্তার

“সাধারণ মুজাহিদীনের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো, কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকা মেদিয়া ওযারা'র ‘আস-সুন্নাহ ব্রিগেড’ এবং আশ-শরীয়াহ এলাকায় ‘আল-কাতীবাতুল-খাদরা’র বিভ্রান্তিকর খারিজী চিন্তাধারা প্রচার আর তাদের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়কদের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিভিন্ন ফতোয়া। ”

ব্যক্তি মূল্যায়নে জামাল যাইতুনী

আবু আব্দির রহমান আমীন উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলো জামাল যাইতুনী। রাজধানীতে ১৯৬৮সালে তার জন্ম। জিহাদের আহ্বানে সাড়া দানকারীদের প্রথম সারির একজন জামাল যাইতুনী। প্রথম দিকে সে বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও গ্রুপের আমীরও হয়। আবু আব্দুল্লাহ আহমদের শাহাদাতের পর ১৯৯৪সালের অক্টোবরের ২৭ তারিখে সে GIA-এর আমীর নিযুক্ত হয়।

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ জামাল যাইতুনীর ব্যাপারে বলেন-

পূর্ব জীবনের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা

"১৯৮৫সালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্র হলো, সে আমার অবস্থানস্থলের মসজিদে অনুষ্ঠিত দ্বীনি মজলিসে আসতে আরম্ভ করেছিলো। মসজিদের সেই মজলিস ছাড়াও সে বির খাদেম জেলার মুবারক নামক মহল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত আকীদা ও ফিকহের বিভিন্ন আলোচনায় যোগদান করতো। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিলো। অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৯২সালে সরকারি গ্রেপ্তারি অভিযানের পর সাহারার প্রসিদ্ধ মরু কারাগার আমাদেরকে পৃথক করে দেয়। তার আগ পর্যন্ত আমরা একসঙ্গেই ছিলাম।

যাইতুনি দ্বীনদার ও সমঝদার পরিবার থেকে এসেছিলো। তার পিতা শেখ মাসুদ বির খাদেমের সড়কে পল্টি মুরগির কারবার করতেন। সে তখন স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতো এবং পিতার সঙ্গে দোকানে কাজ করতো। "

সালভেশন ফ্রন্টে যোগদান

"১৯৮৯সালে যখন সালভেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়, তখন যাইতুনী প্রথম দিকেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ব্লিডার বির খাদেমে রাজনীতিক দপ্তরের সদস্যপদ পায়। ব্লিডার প্রধান থেকে যখন কিছু ভুল প্রকাশ পায়, তখন তাকে দপ্তরের প্রধান পদে নির্বাচিত করা হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২সালে তামানরাসেট প্রদেশের আইন সালেহ এলাকায় অবস্থিত মরু কারাগারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ১৯৯২সালের শরৎকালে যখন জেল থেকে মুক্ত হয়, তখন সোজা আমার গৃহে চলে আসে। কিন্তু তখন সেখানে আমাকে না পেয়ে পিতার দোকানে আমার

জন্য এই বার্তা রেখে যায় যে, আমি মুজাহিদীনের সঙ্গে শামিল হয়ে গিয়েছি। তাই আমাকে খোঁজ করে পেরেশান হবেন না। ”

সামরিক কমান্ডার

“এভাবেই জামাল যাইতুনী বির খাদেম ও সাহাবিলা-এ আল-মুআক্কিঊন বিদ্দাম সংগঠনে শরীফ কোসমী'র অধীন একজন সৈনিক হয়ে যায় এবং তারই সঙ্গে সাহাবিলা-এ টহলরত পুলিশদের ওপর একটি অ্যাম্বুশ অভিযানে শামিল থাকে। GIA যখন ১৯৯৪সালে শরীফ কোসমীকে কেন্দ্রে ডেকে পাঠায়, তখন জামাল যাইতুনী সাহাবিলায় গ্রুপের আমীর হন। এ সময় সে সামরিক কার্যক্রমে বিপুল সক্রিয়তা দেখায়।

১৯৯৫সালে রাজধানীর ডালি ইব্রাহিম এলাকায় অবস্থিত ফরাসি দূতাবাস থেকে বের হতে থাকা ফরাসি সেনাবাহিনীর টহল গাড়ির ওপর এম্বুশ করে। সে অভিযানে পাঁচজন ফরাসি কমান্ডো নিহত হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে হস্তগত হয়। এই অভূতপূর্ব অপারেশনের পরিপ্রেক্ষিতে GIA-এর মাঝে তার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং ব্লিডা ও রাজধানীর নেতৃবৃন্দ তার উপর আস্থা রাখতে আরম্ভ করে। আর এভাবেই শরীফ কসমী'র শাহাদাতের পর তার আমীর হবার পথ তৈরি হয়ে যায়। ফলে সে আমীর হয়ে যায়।

ধর্মীয় অবস্থান ও ত্যাগ-তিতিক্ষা

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“জামালকে আমি যতটুকু জানি, এটা প্রায় অসম্ভবপর যে, আলজেরিয়ার তাগুতগোষ্ঠী সম্পর্কে নিজের পূর্বের আকীদা থেকে সে ফিরে আসবে। সে তো সালভেশন ফ্রন্টের ঘটনারও পূর্বে শাইখ মুস্তফা বু ইয়ালা'র আন্দোলনের সঙ্গ দিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদেরকে তাকফীর করতো। ১৯৯১সালের জুন মাসে রাজধানীতে একটি বিক্ষোভের সময় সে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রথম সারিতে ছিলো। শত্রুরাও তাকে ভালোভাবে চিনতো। এ কারণে যখন নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করা হয়, তখন তাকেই সর্বপ্রথম রাতারাতি সরকারি লোকেরা নিজ গৃহ থেকে তুলে নিয়ে যায়। সে এতটাই ধৈর্যশীল ছিলো যে, সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র নির্যাতন-নিপীড়নের মুখেও সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করেনি।

তার কিছুদিন পর যখন আমি ১৯৯২সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হই, তখন রাজধানীর আল মোহাম্মদিয়া এলাকায় ডেমোক্রেটিক গার্ডের ক্যাম্পে অন্য বন্দিদের পাশাপাশি তার সঙ্গেও আমার দেখা হয়। টর্চারের কারণে সে সময় তার চেহারা এতটাই বিকৃত হয় যে, আমি ঠিকভাবে তাকে চিনতে পারছিলাম না। আল্লাহ তাআলা তাকে দৃঢ়পদ রেখেছিলেন যে, সে আমার ও তার মাঝে মসজিদে সম্পাদিত হওয়া অস্ত্র চুক্তি সম্পর্কে একটা কিছু বলেনি। আর না তার মুখ থেকে এ কথা বের করা গেছে, শরীফ কোসমী এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিরা কোথায় আত্মগোপন করে আছে।

পথভ্রষ্ট গ্রুপ

"যেহেতু জামাল যাইতুনী দ্বীনদার পরিবার থেকে এসেছিলো, এ কারণে সে সময় পর্যন্ত সে দ্বীনদারী ও আদব-আখলাকে খুবই অগ্রসর ছিলো। সুন্নতের প্রতি ভালোবাসা এবং বিদআতের প্রতি ছিলো তার ঘৃণা। যার দ্বীনদারীর ব্যাপারে সে আশ্বস্ত হতো, তার নসীহত অনায়াসে সে কবুল করে নিতো। শুধু তাই নয়, বরং সে উপদেশ প্রদানকারীদের হাতে মুরীদের মতো হয়ে যেতও। এতটা তাঁবেদারি ও আগ্রহের একটি বিশেষ কারণ এই ছিলো যে, সে নিজে শরীয়াহ জ্ঞানে তেমন পাকাপোক্ত ছিলো না। আর আমার দৃষ্টিতে এটাই তার বিভ্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ ছিলো। দ্বীনি ইলমের অভাবই তাকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সে এমন সব লোকের উপর অন্ধভাবে আস্থা রাখতে আরম্ভ করেছিলো, যারা নিজেরাই ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ছিলো না;উল্টো ছিলো চরম উগ্রবাদী। যেমন- তার সঙ্গী আবু আদলান, রাবী গনীমাহ, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বূ কাবূস আল-বুলাইদী এবং আবু তালহা আনতার যাওয়াবেরী। পরবর্তীতে এদের মতো আরও অনেকে তার পাশে এসে জড়ো হয়। এই লোকেরাই তার পূর্বের ধ্যান-ধারণাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং তাকে প্রতারিত করে। ওই গ্রুপ নিজেরাই নিজেদেরকে জামাআতের আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ মনে করতে থাকে এবং অন্যান্য তালিবুল ইলম ও মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দকে খাটো করে দেখতে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস—"মানুষ তার বন্ধুর মতাদর্শ দ্বারাই প্রভাবিত হয়" জামালের ব্যাপারে যেন পুরোপুরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলো।

এমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন — "কট্টরপন্থিরা ধ্বংস হয়েছে " এটিও তার ব্যাপারে পুরোপুরি ফলে যায়। এ হাদীসে উপর্যুক্ত বাক্যটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেন। "

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি জামাল যাইতুনী, আনতার যাওয়াবেরী, মাকাদুর, আবু রাইহানাহ এবং আবুল-ওয়ালিদ কারাদিয়াহ-কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন।

মাকাদুর দেশের বাইরের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলো। আবু রাইহানাহ আর আবুল-ওয়ালিদ কারাদিয়াহ ছিলো শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক।

গুপ্তচরবৃত্তির অপবাদ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

"যেসব লোক শুধু ফলাফল দেখে জামালের ওপর এজেন্সির চর হওয়ার অপবাদ আরোপ করে, তারা বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয়। তারা ভুলে যায় যে, মূর্খ লোকেরা অনেক সময় নিজের সঙ্গে এবং নিজের কাছের লোকদের সঙ্গে এমন কিছু করে বসে, যা শত্রুর পক্ষেও করা সম্ভবপর হয় না। জামাল লড়াইয়ে খুবই সাহসী ও বিক্রমের অধিকারী ছিলো। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তার ছিলো অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু পাশাপাশি তার মাঝে এই দুর্বলতা ছিলো, যে কেউ তাকে কোনো ফতোয়া দিলে সে তা বিশ্বাস করে বসতো। এই সুযোগেই চরমপন্থিরা তাকে বেষ্টিত করে। ফলে নিজের অজ্ঞাতেই সে এমন বিষয়কে হক মনে করতো, যা তার পথভ্রষ্ট গ্রুপ তাকে বোঝাত। "

নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েন

যাইতুনী'র নিযুক্তি (অক্টোবর ১৯৯৪ সাল)

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদের দুইজন সহকারী ছিলেন। একজন হলেন প্রাক্তন জামাআত আল-জাযআরার সঙ্গে সম্পৃক্ত **আবু খলীল মাহফুজ তাজীন**। আর অপরজন হলেন **আবু খালীদ সুহাইব।** GIA-এর একটি দলীয় নিজীয় নিয়ম ছিলো। তারা সেটিকে 'আল-কানুন আল-আসাসী' তথা মৌলিক ফর্মুলা বলতো। এই ফর্মুলা অনুযায়ী যদি আমীর মারা যায়, তাহলে তার প্রথম সহকারী

স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমীর হবেন। মজলিসে শুরা'র সদস্যরা একত্রিত হয়ে তাকে অপসারিত করা অথবা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগ পর্যন্ত প্রথম সহকারী ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবে। এ কারণেই প্রথম সহকারীকে ‘মুসতাখলাফে আউয়াল’ তথা ফার্স্ট ডেপুটিও বলা হতো। প্রথম সহকারী হওয়ার সূত্রেই বোঝা যাচ্ছিলো, আবু খলীলই আবু আবদুল্লাহ্'র স্থলাভিষিক্ত হবেন। এ কারণেই মজলিসে শুরার কয়েকজন সদস্য তাকে সাময়িকভাবে আমীর হিসেবে মেনে নেয়। এখন যতোদিন পর্যন্ত মজলিশে শুরার সকল সদস্য একত্রিত হয়ে তাকে বহাল রাখা অথবা অপসারিত করার কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবে, ততোদিন তিনিই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কিন্তু অপরদিকে ব্লিডার চরমপন্থি গ্রুপ মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত এবং জামাআতের নিজস্ব নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেরাই আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ বনে গিয়ে জামাল যাইতুনীকে আমীর হিসেবে নির্বাচিত করেন। তারা এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, আবু খলীল একজন বিদআতী, সে আল-জাযআরাহ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজধানী ও ব্লিডার এই গ্রুপ শুরু থেকেই আল-জাযআরাহ'র লোকদের সঙ্গে খুবই কঠোর আচরণ করে আসছিলো। আর তখনই আলজেরিয়ার জিহাদ একটা বিপদজনক বাঁক অতিক্রম করেছিলো এবং বোঝা যাচ্ছিলো, এর পরিণাম কখনই ভালো হবে না।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“মাহফুজ আব্দুল খলীলের বিরুদ্ধে ঠিক সেই কায়দায় অভ্যুত্থান করা হয়, যেভাবে আজকাল বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীনদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। যাইতুনি, মাকাদোর, বোকাবুস, আদনান, আনতার এবং আরও এক ব্যক্তি যার নাম ছিলো আবু মারিয়াম, তারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমরা একটি বিবৃতি প্রচার করবো। আবু মারিয়াম সে সময় মিডিয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলো। এই সিদ্ধান্ত শুনে সে বলে উঠলো, আমরা কীভাবে এমন কাজ করতে পারি অথচ মজলিসে শুরা এখন পর্যন্ত বৈঠক করেনি? কিন্তু মজলিসের অবশিষ্ট সদস্যরা তাকে বিবৃতি তৈরি করতে বাধ্য করে। কারণ তার কাছে কম্পিউটার প্রিন্টারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি বিদ্যমান ছিলো। তখন বিবৃতি প্রচার করা হয় যে, অমুক দিন মজলিসে শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মাহফুজ খলীলকে

অপসারিত করে জামাল যাইতুনীকে আমীর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে তখন পর্যন্ত মজলিসে শুরা কোনো বৈঠকই করেনি। আরও মজার বিষয় হচ্ছে জামাল যাইতুনী ও আনতার মজলিসে শুরার সদস্যদের অন্তর্ভুক্তই ছিলো না। যাহোক, অবশেষে সেই বিবৃতির শত শত কপি বিতরণ করা হয়।

এই ঘোষণাপত্র প্রচার করার পর মাহফুজ আবু খলীল শাইখ আবুবকর যারফাবী'র কাছে আসেন। আমি স্বয়ং সে এলাকায় উপস্থিত ছিলাম। আমাকে শেখ মোস্তফা কারতালী এ ঘটনা শুনান যিনি আল-আরবিয়া এলাকার আমীর ছিলেন এবং সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল-আরবিয়া এলাকায় উপস্থিত হয়ে তারা বলাবলি করছিলো, বিবৃতি কারা প্রচার করেছে এবং কেন? তারা আশ্চর্য হচ্ছিলো যে, আমরা মজলিশে শুরার সদস্য অথচ আমরা কিছুই জানি না। যাই হোক, পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন, আনতারের সঙ্গে কিছু লোক মিলে এ কাজ করেছে। সেখানে দু'পক্ষের মাঝে তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটি হয়, এমনকি যুদ্ধের উপক্রম পর্যন্ত হয়ে যায়। তখন কিছু লোক মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসেন যাদের মাঝে শাইখ মুস্তফা কারতালী, তাঁর সহকারী ইয়াহিয়া আলকারমূহ, শাইখ ইউসুফ অততীবীসহ অপর কয়েকজন অভিজাত ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। এরা সকলেই আমাদের পরিচিত ছিলেন কারণ তাদের সঙ্গে আমরা পূর্বে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি।

মাহফুজ যখন দেখলেন, ফিতনা হতে চলেছে, তখন তিনি দায়িত্ব থেকে সরে আসেন এবং পৃথক হয়ে যান। অতঃপর রাজধানীর এক প্রান্তে নিজের এলাকা বারাকীতে গমন করেন এবং সেখানে গোপনে জীবনযাপন করতে থাকেন। এ অবস্থায় সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি ইস্তফা দেন এবং সবকিছুই পরিত্যাগ করে চলে আসেন। আর এভাবেই জামাল যাইতুনী আমীর হয়ে যায়। ”

এটা ১৯৯৪সালের অক্টোবরের ২৭তারিখের ঘটনা। জামাল যাইতুনীকে আমীর বানানোর সময় উপদেষ্টা পর্ষদ থেকে এই শর্তারোপ করা হয় যে, আবুল বারা আসাদ আল-জীজলি, যিনি তৃতীয় অঞ্চলের শারঈ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তাঁকে জামাল যাইতুনীর কাছে শারঈ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে। কিন্তু কট্টরপন্থিদের গ্রুপ পরবর্তীতে এ শর্তের কোনো পরোয়া করেনি এবং আবুল বারাকে জামালের কাছে ডেকে পাঠায় নি।

ষষ্ঠ অঞ্চলের আমীর আবু তালহা আল-জুনুবী[৪০]১৯৯৬সালে রেকর্ডকৃত তাঁর একটি সাক্ষ্য বাণীতে বলেন-

"আবু খলীল মাহফুজকে জামাআতের নির্বাহী আমীর এজন্য বানানো হয়েছে যে, তিনি মূল আমীরের প্রধান সহকারী ছিলেন। কথা ছিলো, আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ বৈঠক করবে এবং তাকে স্থায়ী আমীর হিসেবে নির্বাচিত করার ব্যাপারে পরামর্শ করবে। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু কিছু গ্রুপে আবু খলীল মাহফুজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, সে তো আল-জাযআরাহ'র চিন্তাভাবনা লালনকারী। শুধু তাই নয় বরং একথা পর্যন্ত বলা হয় যে, সে শিয়াগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত। কারণ ইতোপূর্বে সে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর[৪১] কাছে ট্রেনিং নিয়েছিলো। এসব সন্দেহের ভিত্তিতে প্রথম অঞ্চলের একটি গ্রুপ দলীয় রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রথমেই জামাল যাইতুনীকে আমীর নির্বাচিত করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আবু খলীলের আমীর হওয়ার পথ বন্ধ করা। নিজেদের এমন কাজের পক্ষে তারা এই যুক্তি দাঁড় করায়, জিহাদ ও জিহাদী মানহাজকে আমরা নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। এই গ্রুপটাই পরবর্তীতে যাইতুনীর সহযোগী হয়েছিলো। দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরমপন্থা প্রচারে এরাই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলো।

ইত্যবসরে আহলে-হাল্লি-ওয়াল-আকদ-সদস্যবৃন্দকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিলো। তাই জামাআতের সামরিক আমীর কমান্ডার আবু সাবিত আলী আফগানী পূর্ব আলজেরিয়ার এক এলাকায় গমন করেন এবং সেখান থেকে কতক নেতাসহ প্রথম অঞ্চলে এসে পৌঁছেন। তাদের মাঝে ছিলেন পূর্ব আলজেরিয়ার

---

[৪০] তার নাম ছিলো হালিস মুহাম্মদ। দক্ষিণ আলজেরিয়ার লেঘাউট শহরে ১৯৬৪ সালে তার জন্ম। জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম গমনকারীদের কাতারে তার অবস্থান। অতঃপর আলজেরিয়ায় জিহাদ-সূচনাকারীদের মাঝেও ছিলেন তিনি। যেহেতু উত্তম একজন নেতা ছিলেন, এজন্য নিজের শহরের মুজাহিদীনের আমীর মনোনীত হন। নিজ শহরে দায়িত্ব পালনের পর আন্নাবা প্রদেশে অতঃপর দ্বিতীয় অঞ্চলে এবং ১৯৯৫ সালের আগস্টে ষষ্ঠ অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত হন। বাটনায় আরেস পর্বতমালার কোথাও ১৯৯৮ সালের আগস্টে এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

[৪১] এটি ফিলিস্তিনের জিহাদী তানযীম। আহলে সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ইরান বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত। ইরানের সঙ্গে এ সংগঠনের সুসম্পর্ক রয়েছে।

আমীর শাইখ আবু আইমান মুসআব[৪২], কনস্টানটিন প্রদেশের আমীর শাইখ আবু রায়হানাহ ফরিদ আশী[৪৩] এবং বাটনা প্রদেশের এলাকাগুলোর কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন রকম। তাই শাইখ আবু রায়হানাহ ব্যতীত বাকী সকলেই বাটনার কোনো একটি পাহাড়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পরিচালিত অ্যাম্বুশ অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন।

আমি নিজে (আবু তালহা জুনুবী আন্নাবা প্রদেশের আমীর থাকাকালে) জিজেলের আমীর শাইখ আবু আব্দিল গাফফার রিজওয়ান উশায়র[৪৪] সহকারে এই উদ্দেশ্যে প্রথম অঞ্চলে যাই। ”

নির্বাচিত নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐক্যমত (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ সাল)

সামনে গিয়ে তিনি বলেন-

“অতঃপর যখন আনুমানিক ১৯৯৫সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্যাঞ্চলে আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ-সদস্যবৃন্দ একত্রিত হয়, তখন আমীর নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনায় আসে। শাইখ রেজওয়ান উশায়র ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি জামাল যাইতুনীর আমীর হবার যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ সময় জামাল যাইতুনীকে বৈঠক থেকে বাইরে যেতে বলা

---

[৪২] শাইখ আবু আইমান খুছাইর রহিমাহুল্লাহ ১৯৬৫ সালে আলজেরিয়ার আইন টিমাউচেন্ট প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। কনস্টান্টিনোপলের জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। বাকী উচ্চতর পড়াশোনা শামে শেষ করেছেন। ১৯৯১ সালে সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন। কনস্টান্টিনোপলের মসজিদুল আনসার-এ ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। জিহাদের ময়দানে যারা অগ্রগামী ছিলেন, শাইখ তাদের অন্যতম একজন।

জিহাদের কাজে আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে শরৎ কালের শেষ দিকে বাটনা শহরে শাহাদাত বরণ করেন। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ শহীদ হবার পর নতুন আমীর নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য GIA-এর কেন্দ্রীয় মারকাযে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। শাইখ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে-

ومضات البرق في سيرة مصعب أمير الشرق নামক রিসালাটি দেখা যেতে পারে।

[৪৩] তার সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি সামনে আসবে।

[৪৪] শাইখ রেজওয়ান উশায়র আবু আব্দিল গাফফার রাজধানী আলজিয়ার্স থেকে এসেছেন। তথায় তিনি একটি মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন। আলজেরিয়ায় জিহাদ সূচনাকারীদের অন্যতম তিনি। জিজেল প্রদেশের আমীর ছিলেন। অতঃপর শাইখ আবু আইমান মুসআব শাহাদাত বরণ করলে তিনি ষষ্ঠ অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সতীফ প্রদেশের বাবুর জেলার একটি পুলিশ পোস্টে হামলার সময় তিনি শহীদ হন।

হয়। যাতে তার ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে সবদিক থেকে আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা যায়।

ফলাফল এই দাঁড়ায়, যদিও যাইতুনীকে আমীর নির্বাচন করাটা জামাআতের অভ্যন্তরীণ নীতির বিরুদ্ধ একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে হয়েছিলো, যদিও সে আহলে হাল্লি ওয়াল আকদের তোয়াক্কা ছাড়াই নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলো, কিন্তু এখন কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এই রায় প্রদান করেন যে, বারংবার আমীর পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। তাছাড়া এ সময় আমীর পরিবর্তন না করার আরও একটি যুক্তি হলো, যাইতুনী আমীর থাকা অবস্থায় ছয় মাস অতিক্রান্তও হয়েছে। পাশাপাশি এই পরামর্শ সভায় আবু খলীলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সংশয় সন্দেহগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষার ব্যাপারেটিকেও বিবেচনায় রাখা হয়। যাহোক, শেষ পর্যন্ত যাইতুনীকেই আমীর হিসেবে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জন্য কয়েকটি অবশ্য পালনীয় মূলনীতি তৈরি করা হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, সে নিজের সঙ্গে একাধিক উপদেষ্টা রাখবে;উপদেষ্টাদের সম্মতি ছাড়া সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

এ পর্যায়ে এটিও আলোচনায় আসে যে, নেতৃত্ব এককভাবে নির্ধারিত হয়;সামষ্টিকভাবে নয়। শুরা সর্বাবস্থায় আমীরকে যেকোনো কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না।

এইসব ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পর শুধু একটি পয়েন্ট থেকে যায়, আর তা হলো, যাইতুনীর উপদেষ্টা কারা হবে? এ ব্যাপারে তেমন কোনো ফয়সালা তখন হয়নি। যাইহোক, সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে দায়িত্বশীলগণ আসেন, তাদের কারও কারও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জামাল যাইতুনীকেই আমীর হিসাবে মেনে নেয়া হয়। ”

বিভ্রান্তির উৎপাত

চরমপন্থিদের কেন্দ্রীয় গ্রুপ

GIA-এর কেন্দ্রে ব্লিডা প্রদেশের চরমপন্থি ও পথভ্রষ্ট গ্রুপের (আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বূ কাবূস, আবু আদলান রাবীহ গানীমাহ, আবু তালহা আনতার জাওয়াবরি, আবু বসির রিজওয়ান মাকাদুর, বুফারিস এবং অন্যান্য) দৃষ্টিভঙ্গি

আরও কয়েকটি প্রদেশে সাধারণ মুজাহিদীনের মাঝেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলো। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত সদস্যদের অধিকাংশেরই অবস্থান ছিলো ইমারতের কেন্দ্র অর্থাৎ ব্লিডার জিবালুশ-শরীয়াহয়। এই সদস্যরা মুজাহিদীনের উপর কঠোর নজরদারি করতো। যেন মনের সংগোপন কথা ও রহস্যগুলোও তারা খুঁজে নিতে চাইত।

অতঃপর মুজাহিদীনকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে GIA-এর নেতৃবৃন্দের কাছে রিপোর্ট পাঠাতো। সে সব রিপোর্টে কোনো কোনো গ্রুপের ব্যাপারে ইতিবাচক বলা হতো, আবার কোনো কোনো গ্রুপের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করা হতো। বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগে ভরপুর হতো সেসব রিপোর্ট।

মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সাধিত হওয়ার আগে যখন মুজাহিদীনের বিভিন্ন জামাআত পৃথক অবস্থায় ছিলো, সে সময়েও এমন ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা মুজাহিদীনের মাঝে ছড়িয়ে পড়েনি;বরং পারস্পরিক একটি কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বমূলক আবহ বিদ্যমান ছিলো সর্বত্র। কিন্তু ঐক্য সাধিত হওয়ার পর একটি বড় সমস্যা এই দেখা দেয় যে, শাইখ শাবূতী ও শাইখ মাখলূফী'র হরকাতুদ দাওলা এবং আল-জাইশ আল-ইসলামী'র শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের ধারার কিছু সদস্য জামাআতের মজলিসে শুরার অন্তর্ভুক্ত হন, যাদেরকে চরমপন্থি ও অপাত্রে কঠোরতাকারী ব্যক্তিরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না।

যদিও অধিকাংশ সমস্যা কেন্দ্রের এই গ্রুপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন যে,

“আমি দেখেছি, চরমপন্থা শুধু জামাআতের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের আশেপাশের লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; বরং কেন্দ্র থেকে দূরে বিভিন্ন ছোটো ছোটো গ্রুপ এবং রেজিমেন্টের পরিচালক, নেতৃবৃন্দ, সাধারণ মুজাহিদীন, এমনকি কতক শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়কের মাঝেও এসব বিভ্রান্তির দেখা দেয়। ”

যাইতুনীর মাঝে গুমরাহী ও চরমপন্থার লক্ষণসমূহ

আমীর হওয়ার পরপরই যাইতুনীর মাঝে চরমপন্থা ও বিভ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়নি। সে তখন বিভিন্নজনের বক্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতো এবং নসীহত কবুল করতো। উলামায়ে কিরামকে সম্মান করতো এবং তাঁদের মতামতকে প্রাধান্য

দিতো। কিন্তু যে সহযোগীরা তাকে প্রথমে আমীর নির্বাচিত করেছিলো, তারাই তাকে বিভ্রান্ত করে। সেসব লোকের প্রভাব তার মাঝে এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাদের সামনে সে নিজেকে খাটো ভাবতে আরম্ভ করে। এসব সহযোগীর কথা ও পরামর্শ ছাড়াও যাইতুনীর পথভ্রষ্ট হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা। কারণ ব্লিডার এলাকাগুলোতে মুজাহিদীনের মাঝে চরমপন্থা ও প্রান্তিকতা ছিলো অন্য জায়গাগুলোর তুলনায় বেশি। এ কারণেই সামরিক অঙ্গনের সাফল্যকেই আমীর হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা হিসেবে তারা ধরে নেয়, যদিও রণাঙ্গনে সফল সে ব্যক্তির মাঝে ইলম ও জ্ঞানের অভাব থাকুক না কেন। এভাবেই সে এলাকা চরমপন্থা সংক্রমণের এবং উগ্রবাদী উৎপাতের জ্বালামুখ হয়ে উঠে।

কমান্ডার খালীদ আবুল আব্বাস যখন যাইতুনীর সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন, তখন তাকে পরামর্শ দেন, সে যেন ব্লিডার এসব এলাকা থেকে বের হয়ে আলজেরিয়ার অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করে। যেসব জায়গায় নেককার পুণ্যবান ব্যক্তিদের অধিক উপস্থিতি রয়েছে, সে সব জায়গায় যেন সে যাতায়াত করে।

তারও পূর্বে যাইতুনীকে শাইখ আবু রায়হানাহও পরামর্শ দেন, সে যেন আনতার যাওয়াবেরী ও বূ ফারিসের মতো গ্রুপ লিডার ও অসৎ লোকগুলোকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু জামাল সে কথা আমলে নেয়নি। এভাবেই সে নিজের ভুলের কারণে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে যায় এবং উগ্রবাদ ও চরমপন্থার সাগরে নিমজ্জিত হয়। এই উপদেশের কারণেই বদমাশ আনতার যাওয়াবেরী GIA-এর আমীর হওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম শাইখ আবু রায়হানাহকে হত্যা করে।

কট্টরপন্থিদের পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রুপ

একদিকে যখন চরমপন্থি একটি গ্রুপ ছিলো GIA-এর কেন্দ্রে, অপরদিকে তাদেরই মতো ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার অধিকারী কট্টরপন্থি অপর একটি গ্রুপ চতুর্থ অঞ্চলে বিদ্যমান ছিলো। এই চতুর্থ অঞ্চলের মাঝে রয়েছে বেল আব্বেস, ট্লেমসান, ওহরান, সাইদা, আইন টেমুচেন্ট প্রদেশের এলাকাগুলো। এই অঞ্চল সামরিক দিক থেকে অন্যসব অঞ্চল অপেক্ষা অধিক মজবুত ছিলো। তথায় তেলাঘ (উত্তর-পশ্চিম আলজেরিয়ার সিদি বেল অ্যাবস প্রদেশের একটি শহর) ও সেবদু (উত্তর-পশ্চিম আলজেরিয়ার ট্লেমসেন প্রদেশের একটি শহর এবং যাতায়াত।)

সেনাক্যাম্প থেকে বড়ো পরিমাণ গনীমত হস্তগত করা হয়। এই অঞ্চল এবং সেখানকার জামাআতুল আহওয়ালের কট্টরপন্থি আমীর আব্দুর রহীম কাদা ইবনে শাইহা বিল-খালীদ গনীমত বণ্টনের ব্যাপারে এই অজুহাতে টালবাহানা করছিলো যে, GIA তো সালাফী মানহাজ থেকে সরে গিয়েছে। এই অভিযোগ নতুন কিছু ছিলো না বরং প্রাক্তন আমীর আবু আব্দুল্লাহ আহমদের সময়কাল থেকেই GIA-এর নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছিলো। বলা হচ্ছিলো আমীর সাহেবের মজলিসে শুরায় শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং শাইখ আব্দুর রাযযাক রাজ্জামের মত আল-জাযআরাহ'র লোকেরা কীভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? যেহেতু উপর্যুক্ত ব্যক্তিরা চরমপন্থিদের তৈরিকৃত সালাফী মানহাজ থেকে দূরে ছিলো, সেজন্য তাদের ব্যাপারে এমন অভিযোগ ওঠাই স্বাভাবিক।

আব্দুর রহীম এবং তার সঙ্গীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি মাদখাল-সালাফী দৃষ্টিভঙ্গির নিকটতর ছিলো। তাদের মাঝে সালাফী হওয়ার জন্য দলান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং বাহ্যিক সুন্নত ও নববী অভ্যাসগুলোর ব্যাপারে তেমন কঠোরতা ও বাড়াবাড়িমুলক অবস্থান লক্ষ্য করা যেতো, যেমনটা মাদখালীদের মধ্যে রয়েছে। এই মানহাজের কারণে এ জাতীয় গ্রুপ হকপন্থা ও সত্যকে নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ মনে করতো এবং অন্যদেরকে কখনই মেনে নিতে পারতো না।

কট্টরপন্থিদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ (গ্রীষ্মকাল ১৯৯৫ সাল)

কেন্দ্রের চরমপন্থিদের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের কট্টরপন্থিদের বিরোধ

আলজেরিয়ার সমস্ত এলাকায় গনীমত ও অস্ত্র বণ্টনের দায়িত্বের ব্যাপারটি আবু আব্দুল্লাহ আহমদের সময়কাল থেকেই ঝুলন্ত ও অমীমাংসিত ছিলো। এমনকি আবু আব্দুল্লাহ এই ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলোর মিটিং ডাকেন, যেখানে খোদ যাইতুনীও উপস্থিত ছিলো। আবু আব্দুল্লাহ আহমদের শাহাদাতের পরেও GIA-এর নেতৃত্বের সঙ্গে আব্দুর রহীমের কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে বিরোধ থেকে যায়, যদিও উভয় পক্ষেরই দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো চরমপন্থি।

যাইতুনী আমীর হবার পর GIA-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল আব্দুর রহীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং অমীমাংসিত ব্যাপারগুলো মীমাংসা করার জন্য তদঞ্চলে গমন করে। এছাড়াও সালভেশন ফ্রন্টের অধীনে কাজ করা এবং আলজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় পাহাড়গুলোকে কেন্দ্র বানিয়ে রাখা

দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, GIA-এর নেতৃবৃন্দের অধীনে কাজ করার জন্য তাদের সম্মুখে যুক্তি উপস্থাপন করা এবং শেষবারের মত তাদেরকে আহ্বান জানানোই ছিলো GIA-এর এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি আবু জাফর মুহাম্মদ আল-হাবশি

এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রথম অঞ্চলের আমীর আবু জাফর মুহাম্মদ আল-হাবশি, শারঈ তত্ত্বাবধায়ক কমিটির সদস্য শাইখ আবুল ওয়ালিদ হাসান, মজলিসে শুরার সদস্য শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ ছাড়াও আরও ক'জন ব্যক্তি। আব্দুর রহীমের সঙ্গে হাবশির সাক্ষাৎ হয় পশ্চিম আলজেরিয়ার প্রধান প্রবেশদ্বার দারা-ই-ভানশ্রিসে, যা মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলীয় পাহাড় সারিগুলোর মাঝামাঝে অবস্থিত। ওই সাক্ষাতে আব্দুর রহীম জানতে পারে, হাবশি যাইতুনীকে আমীর বানাতে রাজী নয় এবং তিনি যাইতুনীর নেতৃত্বকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের নেতৃত্ব বলে। তখন দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, যাইতুনীর নেতৃত্ব নিয়ে তারা পুনরায় আলোচনা ওঠাবে এবং যাইতুনীকে অপসারিত করে হাবশিকে তার স্থানে জামাআতের আমীর বানানো হবে।

হাবশি এ ঘটনার পর যখন কেন্দ্রে পৌঁছে, তখন যাইতুনীর কাছে এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে যায় এবং সে হাবশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করে। বিচারকেরা হাবশিকে ঐক্য বিনষ্ট করা, মুজাহিদদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি, ফিতনা বিস্তার এবং শরীয়তসম্মত আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাই ১৯৯৫সালে গরমের মৌসুমে হাবশির ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

১৯৯৪সালের মে মাসে সম্পাদিত ওয়াহদাতুল-ইতিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ'র (কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার অঙ্গীকার নামক ঐক্য চুক্তি) পর এটাই ছিলো প্রথম ফিতনা, যার মাধ্যমে ফাটলের অবতারণা হয়। এই ঘটনাটি GIA জামাআতের ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং জামাল যাইতুনীর মানহাজে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়। তখন থেকেই GIA মধ্যমপন্থার সমতল অবস্থান থেকে চরমপন্থায় ঢালু হয়ে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে।

আব্দুর রহীমের বিদ্রোহ

হাবশিকে হত্যা করার পর যাইতুনীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আব্দুর রহীম নিজের অঞ্চলে ফিরে আসেন। যাইতুনী গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান না করা এবং জামাআতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে আব্দুর রহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। এরপর চতুর্থ অঞ্চলের সামরিক গ্রুপগুলোর মাঝে লড়াই বাঁধে। একদিকে যাইতুনীর বাইয়াতপ্রাপ্ত উমর গরীবের নেতৃত্বে একপক্ষ, অপর দিকে আব্দুর রহীমের অনুসারীরা, যারা পরবর্তীতে GIA-এর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ধরে রেখে হুমাতুদ-দাওয়াহ্ আস-সালাফিয়্যাহ (সালাফি দাওয়াতের প্রহরী বাহিনী) নামে নতুন একটি দলগঠন করেছিলো, যা আজ পর্যন্ত টিকে আছে। এভাবেই পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে একটা বড় ফিতনা বিস্তৃতি পায়, যাতে বহু মুজাহিদ নিহত হয়। এরপরই শক্তিশালী এই চতুর্থ অঞ্চল অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুজাহিদীনের কাতার পবিত্রকরণের আয়োজন তথা শুদ্ধি অভিযান (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সাল)

যেখানে একদিকে কট্টরপন্থিদের মাঝে নেতৃত্ব, বিদ্রোহ ও গনীমত বিষয়ে বিরোধের জের ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়, অপরদিকে GIA-এর মাঝে বিদ্যমান অন্যান্য ইসলামীধারাগুলোর বিরুদ্ধে ভ্রান্ত আকীদা, বিদাআতপন্থা ও কুফুরি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়।

আব্দুর রহীম নিজেকে একজন সাধারণ সালাফী হিসেবে বিবেচনা করতো, আর আল-জাযআরাহপন্থিদেরকে বিদআতী মনে করতো। সে আফগান ফেরত মুজাহিদীনকে কুতুবি বলে আখ্যায়িত করতো, অথচ জামাআতের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলো আল-জাযআরাহ এবং আফগানিস্তানের জিহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই, যাদের মাঝে কতক অঞ্চলের আমীরগণ এবং বিভিন্ন রণকুশলী সামরিকগ্রুপের নেতৃবৃন্দ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

আব্দুর রহীমের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যাইতুনী এবং তার আশপাশের লোকেরা নিজেদের মানহাজ ও সালাফীপন্থার ওপর আরোপিত অপবাদ হিসাবে গণ্য করে। তখন তারা নিজেদেরকে খাঁটি সালাফীরূপে প্রমাণ করার জন্য আল-জাযআরাহ'র সঙ্গে পূর্ব সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে ছাঁটাই করতে আরম্ভ করে।

শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং শাইখ আব্দুর রাজ্জাক রাজ্জামের হত্যাকাণ্ড

এরই ধারাবাহিকতায় শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং তাঁর সঙ্গী মিডিয়ার দায়িত্বশীল শাইখ আব্দুর রাযযাক রাজ্জামকে ১৯৯৫সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুধু এই অভিযোগ তুলে প্রতারণা করে হত্যা করা হয় যে, তারা নিজেদের পূর্বের চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসেনি। প্রতারণামূলক এমন অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের দায় সরকারের উপর চাপিয়ে GIA সরাসরি দায় অস্বীকার করতো। শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং শাইখ আব্দুর রাযযাক রাজ্জামের হত্যাকাণ্ডে ঠিক এমনটাই করা হয়। GIA-এর অফিশিয়াল বিবৃতি ছিলো:

"মুজাহিদ মুহাম্মদ সাঈদ মেডিয়া প্রদেশের তাবলাত শহরের কাছে ঈসাবিয়ায় চৌরাস্তার কাছাকাছি তাগুত সরকারের সঙ্গে এক সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন"

ওই বিবৃতিতে জামাআত অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে শাইখের জন্য শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রকৃত বাস্তবতা সকলের সামনে চলে আসে, তখন তারা বলে, 'যুদ্ধ তো হলো ধোঁকা'।

ডক্টর আব্দুল ওহায়াব আম্মারাহ'র হত্যাকাণ্ড

কিন্তু লোকেরা শাইখ মুহাম্মদ সাঈদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জামাআতের অসত্য দাবি মেনে নেয়নি। কারণ সরকার যদি হত্যা করে থাকে, তাহলে এতো বড়ো মাপের ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা কেন ঘোষণা করছে না এবং তার লাশ কেন দেখাচ্ছে না? আর যেখানে তার জন্য ওৎঁপাতা হয়, সেখানেও সংঘর্ষের কোনো আওয়াজ আশপাশের লোকেরা কেন শুনতে পায়নি?

তখন GIA দাবি করে যে, আল-জাযআরাহ'র লোকেরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যাতে জামাআতকে তারা নিজেদের প্রভাব বলয়ে আনতে পারে এবং জামাআতের মানহাজ পরিবর্তন করে জিহাদের ফলাফল নিয়ে সওদা করতে পারে।

এই দাবি প্রমাণ করার জন্য GIA একটি অডিও প্রচার করে যেখানে ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব আম্মারাহ[৪৫] ওরফে আল আরাবী'র স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য ছিলো। আল-আরাবী শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের আল-ফিদা ব্রিগেডের দায়িত্বশীল ছিলেন। শোনা যায় তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁকে যাইতুনী নিজের কাছে ডেকে পাঠায়। অতঃপর গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেয়, যেমনটা তাগুতগোষ্ঠীর কারাগারে হয়ে থাকে। শাস্তি দেয়া হয়, তিনি যেন মিথ্যা স্বীকার করে নেন, এই উদ্দেশ্যে। শাস্তির কবলে তিনি এই স্বীকারোক্তি দেন যে, জামাআতের মাঝে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পিত বিপ্লবের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। স্বীকারোক্তি নেয়ার পর বিদআতী ও ফাসিক হওয়ার অভিযোগ তুলে তাকে হত্যা করা হয়।

অপরদিকে,'আত-তোহফাতুস সানিয়্যা আল-মুনাক্কাহা বিত-তারীফ বিল-জামাআতে ইসলামী আল-মুসাল্লাহ' নামে তারা একটি অডিও প্রচার করে। তাতে GIA-এর নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আল-জাযআরাহ'র লোকদের পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয় যে, তারা কীভাবে আলজেরিয়ার জিহাদকে নিজেদের দখলে নিতে চাচ্ছিলো।

শুদ্ধি অভিযান

এভাবে বিভিন্ন অজুহাতে মুজাহিদেরকে বেছে বেছে হত্যা করার মাধ্যমে মুজাহিদীনের মাঝে শুদ্ধি অভিযান আরম্ভ হয়ে যায়। কখনও প্রতারণা, কখনও ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে যোগ-সাজশ, কখনও কুফুরি ও বিদআত সম্পৃক্ততা আবার কখনও বিভাজন তৈরির প্রচেষ্টা ইত্যাদি নানা ধরনের অভিযোগ এনে সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে তারা। এমনকি কোনো কোনো মুজাহিদকে শুধু ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার কারণেই তারা হত্যা করে।

অন্যান্য উচ্চপদস্থ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যাদেরকে তারা হত্যা করেছে তাদের মাঝে একজন হলেন, ইজ্জুদ্দীন বাআ। আরেকজন হলেন, টিপাজা প্রদেশের আলেমে দ্বীন শাইখ আবু বকর আব্দুর রাযযাক যারফাবি। তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির

[৪৫] শাইখ আসিম ফিদা ব্রিগেডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডক্টরের নাম মুহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, যাকে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে হত্যা করা হয়।

মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করা হয়। এদিকে আব্দুল লতিফ;যিনি তৃতীয় অঞ্চলের আমীর ছিলেন, তাঁকে কুতুবী হওয়ার অপরাধে বরখাস্ত করা হয়। [৪৬]

হত্যার পর নির্মমতা

যাইতুনীর পর নেতা হিসেবে সামনে আসা আনতার যাওয়াবেরীও বিরোধীদেরকে হত্যা করার পলিসি জারী রাখে, বিশেষত বিরোধীদের মাঝে যাদেরকে সে আল-জাযআরাহ'র লোক বলতো। এমনকি GIA চরমপন্থায় লিপ্ত হওয়ার পর অল্প কয়েক মাসের মাথায় প্রায় এক হাজার মুজাহিদকে হত্যা করে।

প্রথমদিকে যাইতুনীর গ্রুপের কাছে শুধু আল-জাযআরাহ'র লোক হওয়াটাই বিদআতী আখ্যা পাওয়ার জন্য এবং কেবল বিদআতী হওয়াটাই হত্যার উপযুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তখনও হত্যা করার পর নিহতদের জানাজার সালাত আদায় এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু আনতার যাওয়াবেরী'র আমলে মুজাহিদীনকে কুফরিমুলক বিদআতে লিপ্ত বলে আখ্যা দেয়া হতো এবং এ কারণেই হত্যা করার পর তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া হতো। কেবল আল-জাযআরাহ'র লোকেরাই নয় বরং সাধারণ কর্মী ও সদস্যরাও এই নির্মমতার শিকার হতে থাকে। এমনকি ধীরে ধীরে মুজাহিদীনকে যারা সাহায্য করতো তাদেরকেও হত্যা করা আরম্ভ হয়ে যায়। আর এভাবেই ওই পথভ্রষ্ট গ্রুপের শাসনামলে বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে তাদের স্বরচিত সালাফী মানহাজ এমন উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে যায়, যেকোনো বিদআতের কারণেই, যে মানহাজে মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর যেকোনো বিদআতই সরাসরি কুফরি হয়ে যায়;এমনিভাবে যেকোনো সুন্নতই ওয়াজিব হয়ে যায় এবং যেকোনো ওয়াজিব পরিত্যাগকারীই শাস্তি ও হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পানাহ! !

সরকারের সাহায্যে তৈরি জনসাধারণের মিলিশিয়া বাহিনী (১৯৯৫ সাল)

১৯৯৫সালে ইয়ামিন যারবাল নিজের ঘরোয়া নির্বাচনে জয় লাভ করে এবং নতুন সংবিধান রচনা আরম্ভ করে দেয়। সেসময় পথভ্রষ্ট মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার রেওয়াজ এতটা ব্যাপক হয় যে, সরকার তাদের

[৪৬] মুজাহিদ আবু আকরাম হিশামের ইন্টারভিউর ফুটনোটে এসেছে, “অতঃপর তাকে ১৯৯৮ সালে ট্রেলমসানে হত্যা করা হয়”।

মুকাবেলার জন্য জনসাধারণের মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে সফল হয়। এই পরিকল্পনার অধীনে সরকার মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জনসাধারণকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিতে আরম্ভ করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ শরীয়তের অপব্যাখ্যা এবং আলিমদের ভূমিকা

বিভ্রান্তিকর বক্তব্যসমূহ (জানুয়ারি ১৯৯৬ সাল)

পূর্বোক্ত ঘটনা সত্ত্বেও GIA-এর বিভ্রান্তি নেতৃত্ব-পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিলো। এত কিছুর পরেও সাধারণ সদস্যদের মাঝে এ গুমরাহী তখনও ব্যাপক হয়নি। কিন্তু যখন থেকে বয়ান ও বক্তৃতার ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়, তখন এসব বিভ্রান্তি সাধারণ সদস্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যাইতুনীর বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের পক্ষে দলীল উপস্থাপনের জন্য অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তালিবুল ইলম ও উলামায়ে কিরামের পরিবর্তে এমন অপরিপক্ক যুবকদেরকে ফাতওয়া ও বিচারের দায়িত্ব পালনের জন্য অগ্রসর করে দেয়, যাদের না ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কোনো পূর্ব নজির ছিল, আর না তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাঙ্গনে কোনো অবদান ছিলো। এসব অর্ধশিক্ষিত আলিমরা এমনসব ফাতওয়া ও বয়ান জারী করতে থাকে, যা দলের নেতৃবৃন্দের প্রবৃত্তির অনুগামী হয়। উদাহরণস্বরূপ তেমনই কিছু ফাতওয়া নিম্নরূপঃ

- স্কুলে ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদেরকে হত্যা করা বৈধ।
- সিভিল ডিফেন্সের অগ্নিনির্বাপণকারীদেরকে হত্যা করা বৈধ।
- কর বিভাগের লোকদেরকে হত্যা করার বয়ান।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"যদিও তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হত্যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ছিলো, কিন্তু শরীয়াহ রাজনীতির আলোকে সেটা কখনই সমীচীন ছিলো না। "

তাদের এমন বিভ্রান্তিকর সিরিজ বক্তব্যের মাধ্যমেই অনুমান করা যায়, জামাআতের মাঝে গুমরাহী কতটা গভীরে পৌঁছায়? এসব বক্তব্যের ধারা ১৯৯৬ সাল থেকেই আরম্ভ হয়।

আল-জাযআরাহ'র লোকদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিবৃতি

শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদের হত্যাকাণ্ডের খবর যখন ফাঁস হয়ে যায় এবং লন্ডনে অবস্থানকারী মুজাহিদ গ্রুপগুলোও যখন প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করে দেয়—যাদের মাঝে শাইখ আবু কাতাদাহ, শাইখ আবূ মুসআব সূরী, আবুল ওয়ালিদ এবং জামাআতে মুকাতিলা'র সঙ্গীরা ছিলো, তখন অগত্যা যাইতুনী ১৫ই শাবান ১৪১৬ হিজরী মুতাবেক ৪ই জানুয়ারি ১৯৯৬সালে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিলো, আসসওয়াইকুল হারিকা ফী বায়ানি হুকমিল জাযআরাতিল মারিকা (দ্বীন ত্যাগী আল-জাযআরাহ'র বিধান বিষয়ক জ্বলন্ত প্রমাণ)। আল-আনসার ম্যাগাজিনের ১৩১নং সংখ্যায় এ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে GIA-এর নেতৃত্ব আল-জাযআরাহ'র বিরুদ্ধে অগণিত অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ এনে আল-জাযআরাহ্পন্থিদেরকে হত্যা বৈধ হওয়ার ফাতওয়া দেয়।

সাধারণ নেতৃত্ব এবং বিদ্রোহীদেরকে হত্যার ব্যাপারে বিবৃতি

যাইতুনী নিজের নামে অপর একটি বিবৃতি প্রচার করে। তার শিরোনাম ছিলো— 'হিদায়াতু রব্বিল আলামীন ফী মানহাজিস সালাফিয়্যীন ওয়ামা য়াজিবু মিনাল আহদি আলাল মুজাহিদীন (সালাফী মানহাজ এবং মুজাহিদীনের ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে রব্বুল আলামীনের নির্দেশনা)। এই বিবৃতিও আল-আনসার ম্যাগাজিনের খুব সম্ভবত ১৩৪নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই বিবৃতির ব্যাপারে শাইখ আসিম আবু হাইয়ান বলেন যে, বিবৃতিটি GIA-এর খারিজী পথভ্রষ্ট অর্ধশিক্ষিত আলিম আবুল মুনযির তৈরি করেছিলো। এই বিবৃতি অনুযায়ী নেতৃত্বের ব্যাপারে জামাআতের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়ে যায় যে, GIA-এর বর্তমান নেতৃত্বকে তারা যুদ্ধকালীন নেতৃত্বের পরিবর্তে স্বাভাবিক সময়ের নিরঙ্কুশ ইসলামী নেতৃত্ব বলে মনে করে। আর তাই এই নেতৃত্ব থেকে কেউ বিমুখ হয়ে গেলে কিংবা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে।

এই আকীদার ভিত্তিতে GIA দলের অভ্যন্তরীণ বহু মুজাহিদকে বিদ্রোহের অভিযোগে হত্যা করা ছাড়াও (যাদের আলোচনা পূর্বে গিয়েছে) সালভেশন ফোর্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, যাইতুনী এরপরই আমীরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করে এবং নিজের দখলে থাকা অঞ্চলগুলোতে

খিলাফতের বিধি-বিধান জারী করার ঘোষণা দেয়। অবস্থা এমনই চলতে থাকে যে, মুজাহিদীনের মাঝে যখনই কেউ বাইয়াত দিতে অস্বীকৃতি জানাতো, বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাকেই হত্যা করা হতো।

এরই ধারাবাহিকতায় লিবিয়ার শ্রেষ্ঠ মুজাহিদীনের একটি গ্রুপকে হত্যা করা হয়। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 'নাসরুল জাওয়াহের বিযিকরি মান উসতুশহিদা মিন আবনায়ি লিবিয়া ফিল জাযায়ের' (আলজেরিয়ায় লিবিয়ার শহীদ সন্তানদের সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা ও তথ্য প্রমাণ) নামক প্রবন্ধ দেখে নেয়া যেতে পারে।

প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যার ব্যাপারে বিবৃতি

৩১শে জানুয়ারি ১৯৯৬সালে যাইতুনী 'রাফউল আযার ওয়াশ শুবুহাত আন শারিকাতিল মাহরুকাত' (জ্বালানি কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে সংশয় নিরসন) শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেই বক্তব্যে GIA আলজেরিয়ায় জ্বালানি বিক্রয়কারী ফরাসি সোনাত্রাক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে এই হুকুম জারী করে যে, তাদের সেই কোম্পানিতে কাজ ছেড়ে দিতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। কারণ এই কাজ যদি না ছাড়ে, তাহলে তারা মুরতাদদের সাহায্যকারী বলে বিবেচিত হবে। আর বাস্তবেও তারা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে দেয়, যাদের অধিকাংশই ছিলো এমন সাধারণ ও দরিদ্র লোক;যারা পেট্রোলপাম্পে শুধু গাড়িতে তেল রিফুয়েলিংয়ের কাজ করতো।

দীর্ঘ ভ্রমণকারী যুবকদের হত্যার ব্যাপারে বিবৃতি

যাইতুনী ১৮ই জানুয়ারি ১৯৯৬সালে 'ঈযাহুস সাবীল লিমানয়িশ শাবাব মিনাস-সাফারিত তবীল' শিরোনামে আরও একটি বিবৃতি জারী করে। তার বিষয়বস্তু হলো, GIA এমন সকল যুবকের ব্যাপারে দীর্ঘ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারী করছে, যারা সেনাবাহিনীতে ভর্তির বয়সে উপনীত হয়েছে অর্থাৎ ১৯ থেকে ২২ বছর বয়সী যুবকেরা। দীর্ঘ ভ্রমণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা একে অপরের অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে না। আর যাকেই নিজের বসতবাড়ি থেকে দূরে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা হবে, এমতাবস্থায় তার কোন ওজর-আপত্তি গৃহীত হবে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হলেও যেতে পারবে না। চাকরি-বাকরি অথবা শিক্ষা-দীক্ষা যেকোনো কারণই হোক,

কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু তাই নয় বরং যে পরিবহনে করে এমন যুবকদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই পরিবহন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

যাইতুনী এবং তার গ্রুপের নিকট এই বিবৃতি প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুবকেরা যেন কলেজ শিক্ষা সমাপনের পর সরকারি চাপে পড়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি না হয়, যাকে LIS (Logistic Information System) Army বলা হয়। কিন্তু GIA কর্তৃক জারীকৃত এই আইনেও বহু নিরাপরাধ যুবক জুলুমের শিকার হয়।

মুরতাদ গোষ্ঠীর নারীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে বিবৃতি ও ফাতওয়া

মুজাহিদীনের সামরিক অঙ্গনের সাফল্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে মুরতাদ তাগুত শাসকরাও জনসাধারণ এবং বিশেষত মুজাহিদীনের ঘরের লোকদের উপর যারপরনাই জুলুম-অত্যাচার চালাত। তাগুত শাসকগোষ্ঠী মুজাহিদীনের মা-বোনদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মাধ্যমে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতো। এরই ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত নির্দয়, নৃশংস, পাশবিক ও লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হতো।

এমন পরিস্থিতিতে GIA একটি নির্দেশনা জারী করে। তাতে মুরতাদগোষ্ঠীর নারীদেরকে বিশেষ স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনায় টার্গেট বানাবার কথা বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মুরতাদগোষ্ঠী মুসলিম মুজাহিদীন এবং তাদের মা-বোনদের সম্মান ও সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নির্দেশনা জারী থাকবে বলা হয়।

আর সেনাবাহিনীর লোকদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে তাদের পুরুষদের সঙ্গত্যাগ করার জন্য এক মাসের আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এই বিবৃতির সঙ্গে জামাআতের অভ্যন্তরে তাদের আলিম শাইখ আবু রায়হানাহ ফরীদ এশা'র আরও একটি ফাতওয়া প্রচার করা হয়, যার শিরোনাম ছিলো—'তাবসীরুল মুজাহিদীন বি-আহকামি কাতলি

নিসায়িল মুরতাদ্দীন’(মুরতাদগোষ্ঠীর স্ত্রী-কন্যাদের হত্যার বিধান সম্পর্কে মুজাহিদীনের প্রমাণ নির্ভর নির্দেশনা)। [৪৭]

শুরুর দিকে সীমিত পরিসরে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় এই ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা হয়। পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের এলাকাগুলোতে মুরতাদগোষ্ঠীর স্ত্রী-কন্যাদের মাঝে খুব কমই আছে যাদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু বিপথগামিতা ও অন্যায়ের শিকড় দিন দিন শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিসর আরও বিস্তৃত হতে থাকে। কিছুদিন পর ঠিক এই ফাতওয়ার মতই শাইখ আবু কাতাদাহ হাফিজাহুল্লাহ'র দিকে সম্বন্ধিত আরও একটি ফাতওয়া সামনে আনা হয়, যা নিয়ে তখন অনেক কথা হয়েছিলো।

মুরতাদ সেনাবাহিনীর নারীদেরকে হত্যা করা জায়েয হওয়ার ফাতওয়া নিঃসন্দেহে বাতিল ছিলো এবং সে সময়ও মুজাহিদীনের মাঝে উলামায়ে কিরামের অনেকেই সে ফাতওয়া খণ্ডন করেছিলেন। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এই ফাতওয়ায় মৌলিক দুটো ভুল চিহ্নিত করেছেন। একটা হলো, যদি স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করার ফাতওয়া এ কথার ভিত্তিতে দেয়া হয় যে, এই স্ত্রী-সন্তানরা তাদের পুরুষদের মতোই মুরতাদ, তবে একথা ভুল। কারণ পুরুষদের বিপরীতে স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে মূলগতভাবে ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্ট কোনো মহিলা অথবা বাচ্চার ব্যাপারে কুফরীতে লিপ্ত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার কথা ভিন্ন। কিন্তু শুধু সেনাবাহিনীর লোকদের স্ত্রী অথবা সন্তান হওয়ার কারণেই কাফিরগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করার বিধান সাব্যস্ত হয় না এবং এর ভিত্তিতে মুরতাদ ফাতওয়া দেয়া যায় না। এ হলো একদিকের ভুল।

অপরদিকে, যদি বলা হয়, সেনাবাহিনীর লোকদের স্ত্রী-সন্তানেরা মুরতাদ নয়, কিন্তু যেহেতু সেনাবাহিনী মুজাহিদীনের মা-বোন ও স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করছে, এজন্য তার কিসাস হিসেবে তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে—এই দ্বিতীয়দিক মূল্যায়ন করে, শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করেছেন—

[৪৭] শাইখ আসিম আবু হাইয়ানের বর্ণনা মুতাবেক- এই ফতোয়া ১৯৯৫ সালে জারী করা হয়। সেটা এভাবে সম্ভবপর হতে পারে, ফতোয়া অনেক পুরানো কিন্তু তা প্রকাশ এবং তদনুযায়ী আমল হয়েছে ১৯৯৬ সালে।

এটাও ভুল। কারণ, কোনো ব্যক্তির জুলুমের কিসাস তার নিরপরাধ মুসলমান আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নেয়া যেতে পারে না। শরীয়তে কোনোভাবেই এটা জায়িয নয়। কোনো আলিম ইতোপূর্বে কখনই এমন কিছু বৈধ হওয়ার কথা বলেননি।

এ কারণে যদি স্ত্রী-সন্তানদেরকে মুসলমান ধরে নেয়া হয়, তাহলে তাদের স্বামী ও পিতাদের অপরাধের শাস্তি তাদেরকে কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না। এ দুই বিষয় যখন সাব্যস্ত হয়ে গেলো, এখন আমাদের কাছে প্রমাণিত যে, না সেনাবাহিনীর লোকদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করা জায়িয আছে, আর না স্ত্রী-সন্তানদেরকে দাস-দাসী বানানো জায়িয আছে।

নারীদেরকে দাসী বানানো

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“এরা শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম স্পর্ধা দেখাত। মুসলিম নারীদেরকে দাসী বানাবার চিন্তা নিয়ে তারা শুধু অপেক্ষায় ছিলো, কখন এর উপর আমল করবে। আল-কাতীবাতুল খাদরা'র মুজাহিদীন আমাকে বলেছে যে, তারা কাজী আবুল বারা হুসাইন আরবাভীকে জুন ১৯৯৬সালে অভ্যন্তরীণ কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে আলাপকালে প্রশ্ন করে যে, জনসাধারণের স্ত্রী-কন্যাদেরকে দাসী বানাবার বিধান কি? তখন সে জবাব দেয়:“এটা জায়িয আছে এবং অচিরেই তা হতে চলেছে। ”

এমনিভাবে GIA-এর হিসাবরক্ষক আবু জামাল সাঈদ বূ খানা আল-বুলাইদী, আল-কাতীবাতুল খাদরা'র শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক আহমদ বালহূত, এই জামাআতের প্রধান মুসআব আইন কারাদ এবং মেদিয়া প্রদেশের ওয়াযারায় আসসুন্নাহ ব্রিগেডের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বাগদাদী সকলেরই একই রকম অবস্থান ছিলো। অবশ্য যাইতুনীর বদলে আনতার যাওয়াবেরী'র সময়ে এই ফাতওয়া তারা আমলে আনতে পারে।

দ্বীনের ব্যাপারে ভুল ধারণা ও মূল্যায়ন

পূর্বোক্ত ভুলভ্রান্তিগুলো ছাড়াও তাদের ইসলামিক মূল্যবোধের মাঝেও নানান গলদ ছিলো। এই ব্যাপারে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"এই অজ্ঞ গ্রুপের কাছে দ্বীন ইসলামে কেবল দু'টি হুকুম রয়েছে:সুন্নত অথবা বিদআত। এই লোকেরা না হারাম সম্পর্কে জানে, আর না হালাল। শরীয়তের বিধি-বিধানের পাঁচপ্রকার, তথা ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত, মাকরুহ ও হারাম—ফুকাহায়ে কিরামের এসব পরিভাষা সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।

আমরা এমন এমন ঘটনা জানি, যেগুলো শোনাতে আমাদের ভয় হয়। কারণ আমাদের মনে হয়, বলার পরে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আমি আর আমার সঙ্গী আব্দুর রহমান আল-ফাকীহ পরস্পরে বলাবলি করতাম, যখন আমরা আলজেরিয়া থেকে বের হবো এবং আমাদের সঙ্গীদেরকে এখানকার ঘটনাগুলো বলবো তখন কি তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে, না অবিশ্বাস করবে?

এই লোকদের দৃষ্টিতে, যেকোনো রকমের বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতি বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। আর আক্ষরিক-পারিভাষিক সর্বপ্রকার বিদআত থেকে বাঁচা উচিত এবং সকল বিদআতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক। তাদের মতে,বিদআতের কোনো প্রকার নেই। এ বিষয়ক ফিকহের সঙ্গে যেন তাদের কোনোই পরিচিতি নেই। আল্লাহর দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে আজব ধরনের অলীক কল্পনা-সমষ্টির নাম। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমরা দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পাই।শুরুর দিকে আমাদের শিক্ষামূলক বৈঠক করার তৌফিক হয়েছিলো। "

সুন্নাহ'র ভুল মানদণ্ড

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আল-হিসবা ফোরামে বলেন-

"১৯৯৬সালের শুরুর দিকে যাইতুনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ততদিনে সে শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ এবং শাইখ আবদুর রাযযাক রাজ্জামকে হত্যা করে ফেলেছে। কিন্তু তখন দাবি করছিলো, সরকার তাদেরকে হত্যা করেছে;তখন পর্যন্ত তারা হত্যার দায় স্বীকার করেনি। যাহোক, সে তখন দ্বিতীয় অঞ্চলের একটি বৈঠকে এসেছিলো। সে সময় একটি বড় কেন্দ্রে এলে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে কাতিবাতুল খাদরা এবং তার কমান্ডার আনতারের সঙ্গে এসেছিলো। তখন হাসান হাত্তাব এবং ওই অঞ্চলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। আসরের সালাতের পর তাকে ঘিরে যুবকেরা জড়ো হয়ে যায়। আলাপচারিতার ভেতর যাইতুনী তাদের সলাত, অজু, অন্যান্য ইবাদত, আমল-আখলাক কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে এবং দ্বীন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরখ না

করে শুধুই জিজ্ঞেস করে সুন্নত সম্পর্কে। কেন্দ্রের আমীরকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে: তোমার পাগড়ি কোথায়? আমীর সাহেব বারবার হলপ করে বলতেন, আমার পাগড়ি ছিলো, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে। আমি ভাইদেরকে এনে দিতে বলেছি, কিন্তু তারা এখনও এনে দিতে পারেনি। তখন বেচারার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। মনে হচ্ছিলো, যেন সে বড়ো কোনো গুনাহ করে ফেলেছে”

পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম

“আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ঐ ব্যাটালিয়নের অধিকাংশ সদস্য এবং আরও বিভিন্ন গ্রুপে বহু মুজাহিদ পানি থাকা সত্ত্বেও এবং সুস্থ অবস্থায়ও তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতো। তাদের সামনে পানির উচ্ছল প্রবাহ থাকতো, কিন্তু না তারা জুনুবী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করতো, আর না সালাতের জন্য অজু করতো। কারণ তাদের ওখানে এরকম একটা ফাতওয়া প্রচারিত হয় যে, সফর অবস্থায় পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়িয রয়েছে। তারা যেন এই অনুমান করে বসে, সফরের কারণে যেহেতু সালাত কসর হয়ে যায়, তাই ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করাও জায়িয হবে। অনেক তালিবুল ইলম এ ব্যাপারটি ঠিকভাবে তাদের কাছে তুলে ধরে এবং তাদেরকে সতর্ক করে। আল্লাহ তাআলা প্রচেষ্টাকারীদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! তাদের চেষ্টার কারণে সাধারণ মুজাহিদীনের মাঝে এ সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু GIA-এর নেতৃবৃন্দের আশপাশে যারা থাকত, তারা বরাবরই এই ভ্রান্ত ফাতওয়ার উপর আমল চালিয়ে যায়। অবশেষে এই ফিতনা তখনই নির্মূল হয়, যখন তারা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়। ”

সিয়াম মাফ

“এমনিভাবে তাদের মাঝে আরও একটি ফাতওয়া ছড়িয়ে পড়ে। তারা মনে করত, খিলাফত কায়িম হওয়ার আগ পর্যন্ত রমজানের সিয়াম রমজান মাসে হোক কিংবা পরবর্তীতে কাযা হিসেবে হোক—কোনটাই জরুরী নয়। ”

আমার সাক্ষ্য

“এই সকল ফাতওয়া GIA-এর মাঝে প্রভাব বিস্তারকারী, চরমপন্থি, তালিবুল ইলম দাবিদার কিছু লোক জারী করে। এসব আলিমকে তাদের মাঝে শারঈ

অফিসার বলে ডাকা হতো। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এ ধরনের ঘটনা আসলেই কি ঘটেছিলো? আমি বলবো: আপনাদের যা ইচ্ছা মনে করেন, কিন্তু আমি সেখানে থাকা অবস্থায় নিজে যা কিছু শুনেছি ও দেখেছি সেগুলোই আপনাদের কাছে বর্ণনা করছি। ”

GIA-এর ঘাঁটিতে আহলে ইলম ব্যক্তিবর্গ

যাইতুনী নেতৃত্বভার সামলে নেয়ার আগে থেকেই কেন্দ্রে কিছু তালিবুল ইলম বিদ্যমান ছিলো। তাদের কেউ কেউ এসব গুমরাহীর ব্যাপারে আপত্তি জানাতো এবং নসীহত করতো, আবার কেউ কেউ নিজেরাই এগুলোর সৃষ্টি করতো। আমরা এখানে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবো।

শরীয়াহ বোর্ড

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“যাইতুনীর সময়ে GIA-এর নিজস্ব শরীয়াহ বোর্ড ছিলো। সেখানে কতক তালিবুল ইলম কর্মরত ছিলো। কিন্তু তাদের অধিকাংশই দুর্বল এবং কেউ কেউ তো একেবারে নির্বোধ পর্যায়ের ছিলো। তাদের মাঝে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন বোর্ডের দায়িত্বশীল আবু রায়হানাহ। ”

আবু বকর যারফাবী রহিমাহুল্লাহ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“আবু বকর আব্দুর রাযযাক যারফাবী জামাআতের নেতৃবৃন্দের ওখানে ইলমে দ্বীন চর্চাকারী একজন দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জিহাদের পূর্বে টিপাজা প্রদেশের এক মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। ১৯৯৪সালের শেষের দিকে জাবাল আল-লৌহে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে একজন সজ্জন ও সুপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি বলেই আমার মনে হয়েছে। তিনি ইমারত শাসিত এলাকায় কুতুবখানা, শিক্ষা এবং ওয়ায-নসীহতের মজলিসগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন।

শাইখ আবুল হাসান আল-বুলাইদীসহ আরও কতক ভাই বলেন যে, আবু বকর আব্দুর রাযযাক যারফাবী একতরফা ফয়সালা করা এবং শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়কদেরকে পৃথক রাখার ব্যাপারে জামাল যাইতুনীর কাছে অভিযোগ

উত্থাপন করে। তখন জামাল যাইতুনী একথা বলে উঠে দাঁড়ায় যে, আপনারা তো শরীয়াহ বিষয়ক দায়িত্বশীল;আপনারা কেন ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে নাক গলান? এর জবাবে শাইখ আবুবকর বলেন- সেকুলারিজম তো এটাকেই বলে। এ নিয়ে উভয়ের মাঝে তর্ক বেঁধে গেলে শাইখ আবুবকরের বিরুদ্ধে একদল দাঁড়িয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনে। অবশেষে জামাল যাইতুনীর নির্দেশে তার এক অনুসারী তাঁকে হত্যা করে। ”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“সে সময়ে GIA-এর নেতৃবৃন্দের ওখানে ইলমের ক্ষেত্রে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। ”

প্রথমে যে তারা শরীয়াহ বোর্ডের দায়িত্বশীল শাইখ আবু রায়হানাহকে উত্তম বলেছেন, তা খুব সম্ভবত আবুবকরের শাহাদাতের পরের ঘটনা হবে। বিশেষত আবুবকরের শাহাদাতের পর তিনি শরীয়াহ বোর্ডকে যাইতুনীর দিকে সম্বন্ধিত করতেন।

আবু রায়হানাহ ফরীদ আশী রহিমাহুল্লাহ

১৯৬০সালে কনস্টানটিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাঙ্গনে তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। মসজিদ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা'র ইমাম ও খতীব ছিলেন। আফগানিস্তানের জিহাদেও তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তো তিনি এমন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন যে, মুজাহিদীনকে ভর্তির কাজ করতেন। আলজেরিয়ার প্রদেশে জিহাদের ঘোষণাকারীদের মাঝে অপর কিছু মসজিদের ইমামসহ তিনি সামনের কাতারে ছিলেন। অতঃপর নিজ প্রদেশেই ১৯৯৫সালের প্রথম দিক পর্যন্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মধ্যাঞ্চলীয় এলাকায় বদলি হয়ে যান। সেখানেই GIA-এর তৎকালীন নেতৃত্বের অবস্থান ছিলো। ফিতনা আরম্ভ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন। তিনি জামাআতের বিভিন্ন শরীয়াহ ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য নসীহত করেন। একটি ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি যাইতুনীকে পরামর্শ দেন যেন সে আনতার যাওয়াবেরী ও বূ ফারিসের মতো নির্বোধ গ্রুপ লিডারদের সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু জামাল তাঁর সে পরামর্শ গ্রহণ করেনি। আনতার যাওয়াবেরী'র নেতৃত্বকালে এসব পরামর্শের কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“শরীফ কোসমী'র সময়ই তাকে জামাআতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তলব করে। তিনি কিছুদিনের জন্য GIA-এর শরীয়াহ বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কতক ভাই বলেন যে, জামাল যাইতুনীর গ্রুপ তার বিরুদ্ধে ইখওয়ানী হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। এই মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তার পিছু নেওয়া হয় এবং আনতার যাওয়াবেরী'র সময়ে হত্যা করা হয়। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, তাঁর ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ওয়ায-নসীহত শুনেছেন, তারা বলেন যে, ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর মোটামুটি ভালই যোগ্যতা ছিলো। আমি তাঁর আমল-আখলাক ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা শুনেছি। ”

তিনি সেই আলিমদের একজন, যারা মুরতাদগোষ্ঠীর স্ত্রী-কন্যাদেরকে হত্যা বৈধ হওয়ার ফাতওয়া জারী করেন। সামনে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

এই ব্যাপারে শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“যাইতুনীর নেতৃত্বকালে কয়জন শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর স্ত্রী-কন্যাদেরকে হত্যা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলো। তারা শাইখ আবু রায়হানাহ ফরীদ আশী'র নেতৃত্বে জামাআতের শরীয়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে ১৯৯৫সালে এ বিষয়ক একটি ফাতওয়া জারী করেছিলো। ”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এই ব্যাপারে বলেন-

“আবু রায়হানাহ্ যাইতুনীর আগে থেকেই মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। তবে ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর তেমন গভীরতা ছিলো না। দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল গভীর দৃষ্টিতে দেখার ক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাব ছিলো তার মাঝে। ”

শাইখ আবুল হাসান রশীদ আল-বুলাইদী রহিমাহুল্লাহ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“তিনি নিজের ব্যাপারে নিজেই বলেন যে, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তিনি শাইখ আবু বকর যারফাবী এবং আবু রায়হানাহ'র পক্ষাবলম্বন করতেন। এজন্যই ১৯৯৫সালে মুহাম্মদ হাবশির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি

জামাল যাইতুনীর আমীর হওয়ার ব্যাপারে আপত্তিকারীদের একজন। ইখওয়ানী হওয়ারও অভিযোগ ছিলো তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং বুয়াইরিয়া প্রদেশের এক ব্রিগেডে একেবারে পৃথক করে দেয়া হয়। ”

শাইখ আবুল হাসান আল-বুলাইদী'র কিছু কথা সামনে আবারও আসবে। যেখানে তিনি যাইতুনীকে দীর্ঘ ভ্রমণ ও সোনাত্রাক কোম্পানির শ্রমিকদের ব্যাপারে জারীকৃত ভুল বিবৃতির কারণে নসীহত করেছিলেন।

GIA থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর শাইখ আবুল হাসান আল-জামাআতুল সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং জামাআতের কাজী নিযুক্ত হন। অতঃপর যখন আল-জামায়াতুস সালাফিয়া আল-কায়েদার সঙ্গে বাইয়াত করে তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল আরাবী (আল-কায়েদা ইসলামী মাগরিব শাখা) নামে পুনর্গঠিত হয়, তখন শাইখ আবুল হাসান রশীদ আল-বুলাইদী তানযীমের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য এবং বিচার বোর্ডের আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন। অবশেষে তাঁকে আলজেরিয়ান বাহিনী শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন রহমতে চাদরে আবৃত করুন! !

উয়াইস রহিমাহুল্লাহ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“উয়াইস নামে আরও একজন তালিবুল ইলম ছিলেন। তিনিও প্রথমে ইমাম ও খতীব ছিলেন। অতঃপর বেল আব্বেস প্রদেশে আস-সুন্নাহ ব্রিগেডের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬সালে যাইতুনীর গ্রুপের কাছে বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এবং তাদেরকে নসীহত করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা থেকে সফর করে জাবালুল লাওহ-এ আর রব্বানিয়া ব্যাটালিয়নে আমাদের এখানে আসেন। এখান থেকে রওনা হয়ে যখন তিনি মেডিয়া প্রদেশের মোকর্নো এলাকায় একটি ব্যাটালিয়নের কাছে অবস্থান করেন, তখন জামালের সহযোগীরা তাঁকে হত্যা করে। তখন তাঁর সফর সঙ্গী নগ্নপায়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। ”

আবুল বারা আসাদ আল-জীজলি

এছাড়াও শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ আরও দু'জন আলিমের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইলমের অঙ্গনে তাদের স্তর এবং গুমরাহীর ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট নয়। তাদের মাঝে একজন হলেন, আবুল বারা আসাদ আল-জীজলি। তার ব্যাপারে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, যখন জামাল যাইতুনী জোরপূর্বক নেতৃত্ব দখল করে, তখন মজলিসে শুরার সদস্যরা এই শর্তে তার নেতৃত্ব মেনে নেয় যে, জামাল শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজের সঙ্গে আবুল আসাদ আল-জীজলিকে রাখবে। কিন্তু কট্টরপন্থিদের গ্রুপ এ শর্তের কোনো পরোয়া করেনি। ফলে আবুল বারা তৃতীয় অঞ্চলের আমীর আব্দুল লতিফের ওখানেই তিয়ারেত প্রদেশের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

আবুল ওয়ালীদ হাসান আগওয়াতী

অপরজন হলেন, আবুল ওয়ালীদ হাসান আগওয়াতী। তাঁর ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা হয় যে, যখন যাইতুনী আব্দুর রহীমের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠায়, তখন তাদের মাঝে শরীয়াহ বোর্ডের রুকন আবুল ওয়ালীদ হাসানও ছিলো।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"তিনি ঘরডাইয়া প্রদেশের আগওয়াত এলাকার আমাজিগ গোত্রের বনি মাজাত উপ-শাখার লোক ছিলেন। প্রথম দিকে ইবাদী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে সুন্নি হয়ে যান। মজলিসে শুরার তিনি একজন সদস্য ছিলেন। "

শাইখের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি গুমরাহীর পরেও যাইতুনীর মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন।

সংশোধনকারীদের সঙ্গে GIA-এর ব্যবহার ও আচরণ

হত্যা অথবা অন্যত্র পোস্টিং

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ নারীদেরকে দাস বানানোর ফাতওয়া সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন-

“ধরে নিচ্ছি কোনো আলিম এ জাতীয় কোনো ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু এরা এমন ছিলো যেকোনো আলিম বা কোনো মুফতি-ই তাদেরকে নিজেদের চিন্তা থেকে সরিয়ে আনতে পারতো না। এমন কতো আলিম রয়েছেন; যারা তাদেরকে নসীহত করেছেন অথবা তাদের কাজের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। বিনিময়ে তাদেরকে হত্যা করা অথবা এমনভাবে একঘরে করা হয় যে, সর্বপ্রকার দ্বীনি ওয়ায-নসীহতের পথ তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ”

গুপ্তচরবৃত্তি এবং পরীক্ষা

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ GIA-এর মূর্খ আলিমদের ব্যাপারে বলেন-

“তারা তো তালিবুল ইলম, আলিম এবং সকল মুজাহিদ থেকে একটি বিশেষপন্থায় পরীক্ষা নিতো। এ কাজের জন্য তারা আল-হিসবা ফোরামে বিশেষ কিছু লোককে দায়িত্ব দিয়েছিলো। এরই মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরে তারা নজরদারী করত এবং আপত্তিকারী ও অভিযোগকারীদের ব্যাপারে খবরদারি করত। সামান্যতম সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো বিচার বা আদালত ছাড়াই তারা দলের লোকদেরকে হত্যা করতো। ”

বিদআতী আখ্যাদান

GIA নিজের মানহাজ ভিন্ন অন্য সকল প্রাচীন ও সমকালীন উলামায়ে কিরামের কিতাবাদির ব্যাপারে বিধি-নিষেধ জারী করেছিলো। অন্যধারার সকল আলিমকে তারা বিদআতী ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করতো। যেখানেই তাদের কিতাবাদি পাওয়া যেতো, সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিতো। বিশেষ করে সাইয়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ 'র কিতাবাদি তারা পুড়িয়ে ফেলতো এবং তার উপর ঠিক তেমনি হুকুম আরোপ করতো, যেমনটা মাদখালী সালাফীরা করে থাকে। অতঃপর যখন জুন ১৯৯৬সালে অন্যান্য মুজাহিদ জামাআত ও মুজাহিদ ব্যক্তিত্বরা তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে, তখন GIA তাদেরকেও বিদআতী পথভ্রষ্ট এবং কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করে।

GIA-এর মূর্খ উলামা

শাইখ আবুল হাসান রশীদ আল-বুলাইদী রহিমাহুল্লাহ নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি যাইতুনীকে প্রচারিত একটা ভুল বিবৃতির ব্যাপারে নসীহত করেন। তিনি দীর্ঘভ্রমণ এবং সোনাত্রাক কোম্পানির শ্রমিকদের ব্যাপারে জারীকৃত ভুল বিবৃতি প্রসঙ্গে নসীহত করছিলেন। এর আলোচনা পূর্বে গিয়েছে।

তিনি বলেন-

"যাইতুনী নসীহতের এমন জবাব দেয়, যার দরুন সন্দেহের পরিবর্তে আমার মাঝে অস্থিরতা তৈরি হয়ে যায়। সে বলেঃ আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন! আমরা আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেই কাজ করি এবং আমাদের মাঝে শক্ত বন্ধন ও যোগাযোগ সূত্র রয়েছে। "

শাইখ আবুল হাসান বলেন-

"বিবৃতি ও ঘোষণাপত্রগুলোর দ্বারা সমাজে যেসব ভুল-ভ্রান্তি আরম্ভ হতো, সেগুলো দেখে আমি মনে মনে চিন্তা করতাম, এ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি, যার সঙ্গে যাইতুনী পরামর্শ করে কাজ করে? অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর খোদ সেই আলিম;যার সঙ্গে পরামর্শ করে যাইতুনী কাজ করতো, সে পালিয়ে আসে এবং আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আমরা যখন তার সঙ্গে কথা বলি তখন বুঝতে পারি, সে অত্যন্ত সহজ-সরল একজন মানুষ। এ লোক হত্যার ব্যাপারে কোনো ফাতওয়া দেয়া তো দূরে থাকুক, জামাআতকে সাধারণ কোনো বিষয়ে নির্দেশনা বা পরামর্শ দেয়ারও যোগ্য নয়। "

আবুল বারা হুসাইন আরবাভী আল-আসিমী

অপরিপক্ক ও পথভ্রষ্ট একজন আলিম। GIA-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেই তার অবস্থান ছিল। শাইখ আসিম আবু হাইয়ান দুজনের কথা আলোচনা করেছেন। তাদের মাঝে একজন আবুল বারা হুসাইন আরবাভী আল-আসিমী। GIA-এর মাঝে খারিজী চিন্তাধারা প্রচারের আলোচনায়ও তার নাম এসেছিলো এবং নারীদেরকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করার ফাতওয়ায়ও তার কথা এসেছে।

আল জুবায়ের আবুল মুনযির

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ আবুল বারা ছাড়াও জুবায়ের আবুল মুনযিরের কথা উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাপারে শাইখ বলেন-

❝যখন ইমারতের এলাকায় কোনো ইলমওয়ালা ব্যক্তি অবশিষ্ট রইলো না, তখন জামাআত আল যুবায়ের আবুল মুনযিরকে শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। জামাল যাইতুনী তাকে বিরে খাদেম এলাকা থেকেই চিনতো। আমি প্রথমে জুবায়ের নামেই তাকে জেনেছিলাম। কিন্তু যখন সে আবুল মুনযির উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন আমি মনে করি, এই লোক অন্য কেউ হবে। অতঃপর ১৯৯৯সালে যখন GIA-এর কাছ থেকে পালিয়ে আসা লোকদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করি, তখন তারা তার আসল নাম, শারীরিক গঠন এবং এলাকার কথা আমাকে বলে।

এই যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে বিরে খাদেমের কেন্দ্রীয় মসজিদে। আমার মনে পড়ে, সে মসজিদের কুতুবখানা, মসজিদের তাকে সাজানো পুস্তকাদি এবং মসজিদের ভেতর অনুষ্ঠিতব্য মজলিসগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলো। আর যেহেতু সে নিজেকে সালাফী বলত, এ কারণে ইখওয়ানীদের সঙ্গে তার প্রচুর ঝগড়া হতো।

নবম শ্রেণি পাস করার পর সে কিছু শরীয়াহ কিতাবের মূল টেক্সট মুখস্থ করে এবং কজন শাইখের সবক ধরে। কিন্তু বয়স অল্প হওয়ার কারণে ব্যবহারিক ফিকহের ব্যাপারে তার কোনো ধারণা ছিলো না;বরং চরমপন্থা ও কঠোরতার প্রতি তার ঝোঁক ছিলো। এ কারণে যাইতুনী ও আনতার যাওয়াবেরী'র জামাআতে অন্য কারও অংশগ্রহণ ছাড়া একাই সে শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বনে যায়।

GIA-এর পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসা এক ভাই বলেন যে, সে আন্তার যাওয়াবারীর সামনে খুবই দুর্বল ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ ছিলো। সে এমন ফাতওয়া দিতো, যেটা আন্তার যাওয়াবারীর পছন্দসই হবে। উলামায়ে সূ' সবসময় এমনটাই করে থাকে। আনতার মুজাহিদীনের সামনে তার সঙ্গে অসদাচরণ করত এবং তাকে ধমকাধমকি করতো।

রাজনীতি, কূটনীতি ও স্বার্থ বিবেচনার কথা বলে কোনো মূলনীতি বা নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে ঢালাও মৃত্যুদণ্ডের পথ খুলে দেয়া, শিশুদেরকে হত্যা

করা, নারীদেরকে দাসী বানানো ইত্যাদি এমন অনেক ফাতওয়াই ছিলো তার দেয়া, যেগুলোর ভিত্তিতে GIA মুসলিম শিশুদেরকে হত্যা করা এবং নারীদেরকে দাসী বানানোর মতো আরও বহু ভয়ানক কাজ করেছে। এমনকি যে সমস্ত সৈন্য বার্ধক্য, জখম অথবা অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার কারণে পালিয়ে যেতে পারতো না, তাদেরকেও দাস বানিয়ে ফেলা হতো। তার অন্যান্য বিচ্ছিন্ন ও আমল-অযোগ্য ফাতওয়াগুলোর মধ্যে কিছু নিম্নরূপঃ

• বিদআতীর তওবা কবুল না হওয়ার ফাতওয়া।

• এমন মুজাহিদকে শিরশ্ছেদ করার ফাতওয়া যার ব্যাপারে বিদআতের মিথ্যা অভিযোগ হলেও এসেছে।

• তার দৃষ্টিতে বিদআতীকে হত্যা করার পূর্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে আকৃতি বিকৃত করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

• কোনো মহিলাকে দাসী বানিয়ে যখন একের অধিক পুরুষ তার সঙ্গে পালাক্রমে শারীরিক সম্পর্ক করবে, তখন সে নারীকে হত্যা করে দেয়া হবে।

এই লোকের ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরোপুরি সত্য হয়ে যায়—

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلو وأضلو

অর্থ—"আল্লাহ তাআলা ইলমকে বান্দাদের অন্তর থেকে তুলে নেবেন না;বরং আলিমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন। অবশেষে এমন হবে, যখন কোনো আলিম থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে দায়িত্বে বসিয়ে দেবে। অতঃপর তাদের কাছে থেকে ফাতওয়া নেয়া হবে, আর তারা ভুল ফাতওয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। "

যখন GIA থেকে বেরিয়ে আসা সদস্যরা এই জামাআতকে খারিজী বলে আখ্যায়িত করে, আবুল মুনযির তখন নিজের জামাআতের মান রক্ষায় কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় এবং কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধের

শিরোনাম হলো-হিদায়াতু রব্বিল আলামিন...(যার আলোচনা পূর্বে গিয়েছে। জামাল যাইতুনী সে প্রবন্ধ নিজের নামে প্রকাশ করেছিলো)। এ প্রবন্ধে আবুল মুনযির GIA-এর মানহাজ বর্ণনা করতে গিয়ে একে সুন্নি ও সালাফী মানহাজ বলে অভিহিত করে। তার জামাআত এমনই সুন্নি ও সালাফী দাবিদার ছিলো যে, GIA-এর প্রতিটি বিবৃতি ঘোষণাপত্র ও নির্দেশনাপত্রের উপর লেখা থাকতো—তাওহীদিয়াহ, সুন্নিয়াহ, সালাফিয়াহ।

আবুল মুনযিরকে হত্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ২০০৮সালে তওবাকারী GIA-এর সর্বশেষ নেতৃবৃন্দের মাঝে একজন হলেন শাইখ সালেহ আবু ইয়াসিন। তিনি মুহাম্মদ গিলজানের উপস্থিতিতে আমাকে বলেন যে, তাগুত বাহিনী ব্লিডা প্রদেশের জিবালুশ শরীয়াহ পাহাড়ের শেরকহালিমা নামক একটি চূড়ায় ২০০৩সালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্বশীলসহ আবুল মুনযিরকে হত্যা করে। সে সময় সে নিজের কেন্দ্র অভিমুখে খচ্চর হাঁকাচ্ছিলো। অপর এক বর্ণনা মতে, আল-জামাআতুল সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতালের অনুগত মুজাহিদীনের সহায়তাকারী শাখার একজন সমন্বয়ক সদস্য তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায় এবং খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে। কিন্তু আমি (আসিম আবু হাইয়ান) প্রথম বর্ণনাই প্রাধান্য দিই। ”

নবম পরিচ্ছেদঃ শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ 'র ভূমিকা

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা বিষয়ক অডিও বক্তব্যে বহু ঘটনার পাশাপাশি এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেখানে, তিনি GIA-এর নেতৃবৃন্দকে নসীহত করছেন। আর সেসব নসীহতের কারণেই GIA তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা আল্লাহর দয়া ছিলো যে, তিনি বেঁচে যান এবং তাঁর সূত্রেই আজ আমরা GIA-এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারছি। সামনের ঘটনাগুলো তিনিই বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন-

আবু তালহা আল-জুনুবী র নিকটে

“যখন আমি তৃতীয়বার আলজেরিয়ায় প্রবেশ করি এবং GIA-এর কাছে পৌঁছি, তখন প্রথম বছর তুলনামূলক ভালোই কাটে। কারণ আমি বূ মারডেস এবং তার আশপাশের প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় অঞ্চলের আমীর আবু তালহা

আগওয়াতীর কাছে অবস্থান করেছিলাম। আলজেরিয়ার দক্ষিণে আগওয়াত এলাকা মরুভূমির শুরুর দিকে অবস্থিত ছিলো, যেখানে খুব খেজুর হত। সেটাই ছিলো আমাদের অবস্থানস্থল। যাহোক, তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড়ো ছিলেন। আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের সুবাদে তার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো, কিন্তু আফগানিস্তানে কাজের ব্যস্ততার কারণে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারিনি। ইতোপূর্বে তিনি ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু আফগানিস্তানে আসার পর নামও পরিবর্তন করে ফেলেন, আবার ইখওয়ানের সঙ্গে সম্পর্কও ত্যাগ করেন। পূর্ব পরিচয়ের কারণে তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

আবু তালহা মানুষ হিসেবে ভালো মানের এবং বাহাদুর সামরিক নেতা ছিলেন। সামরিক সক্রিয়তায় তাঁর অনেক নজির ছিলো। কয়েকটি অপারেশনে আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যেহেতু তিনি নিজে তালিবুল ইলম ছিলেন, এজন্য আমাকে সবক প্রদানে উৎসাহিত করতেন এবং সুযোগও করে দিতেন। আমি যুবকদের মজলিসে ইলমী আলোচনা করতাম। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমি শুরু থেকেই দাওয়াত দেয়ার এই সুযোগটি লাভ করেছিলাম। ”

কুস্তির সুন্নত

“একবার আমাদেরকে যাইতুনী নিজের কাছে ডেকে পাঠান। আমরা তার এলাকায় পৌঁছার পর সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত আমাদেরকে কেন্দ্রের কাছে একটি জঙ্গলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটিতে রাখা হয়। এটা মূলত নেতৃবৃন্দের রক্ষীদলের ঘাঁটি ছিলো। নেতারা পাহাড়ের উপরে অবস্থান করতো আর তাদের রক্ষীরা নিচে। রাত আমরা সেখানেই কাটাই। সকালে ওঠা মাত্রই দেখতে পাই, সাতজন অথবা আটজন রক্ষী পরস্পরে কুস্তি লড়ছে। পুরো সকাল তারা লড়াই চালিয়ে যায়। অতঃপর সন্ধ্যাবেলা সালাতের আগে দ্বিতীয়বার লড়াই আরম্ভ হয়। ঘুমানোর আগে আরও একবার!

দ্বিতীয় দিন আরম্ভ হলে তাদের মধ্যকার একজন বিশালদেহী হাট্টাকাট্টা যুবক আসে। তার দাড়ি ছিলো না। সে এসে বলতে থাকে:আপনাদের আজ কি হলো? সুন্নতের উপর আমল করছেন না কেন? এভাবে তো আপনারা বিদআতী হয়ে যাবেন। তখনই আমি বুঝতে পারি আসল ব্যাপার কি? ! কিন্তু আমরা তার সঙ্গে

কথায় জড়াই নি। কারণ আমরা অতিথি ছিলাম, আর সে ছিলো নিরাপত্তারক্ষী। আমাদের সামনে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনার প্রোগ্রাম ছিলো এবং সমীচীন এটাই ছিলো যে, আলাপচারিতা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে হবে। যাহোক, পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি, তাদের এখানে কুস্তি লড়া এমন সুন্নত, যা রোজ আদায় করা জরুরী ও বাধ্যতামূলক। যদি একদিন কেউ না করে তবে সে বিদআতে লিপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হয়। আর যদি নিয়মিত না করে, তাহলে সে পুরাদস্তুর বিদআতী হয়ে যায়। ”

GIA-এর মাঝে বিশৃঙ্খলা

“প্রথমদিকে আমাদের সময় ভালোই কাটছিলো। এরপর ধীরে ধীরে একটা সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। কিন্তু আবু তালহা আমার সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালো আচরণ করে যান। বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশের ধারা আরম্ভ হওয়ার আগেই আমি চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি অনুভব করি এবং নেতৃবৃন্দকে নসীহত করি। কিন্তু তারা আমার কথায় কান দেয়নি। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকগুলোতে প্রথমেই আমাদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয় এবং তারা আমার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু এমন অবস্থায় আমি ধৈর্য ধারণ করতাম।

বিভ্রান্তি বেশিরভাগ ছিলো নেতৃবৃন্দ, গ্রুপগুলোতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়কদের মাঝে। শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়কদেরকে তাদের ওখানে বলা হতো শরীয়াহ অফিসার, তারাও ফিতনায় শামিল ছিলো। তখন পর্যন্ত সাধারণ যুবকেরা নিতান্তই সাদাসিধে, ইলম-তৃষ্ণার্ত ও কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলো। অধিকাংশই লেখাপড়া জানতো না। তাদের মাঝে আত্মত্যাগী লোকও ছিলো। তাদেরকে বহু কল্যাণ ও পুণ্যের কাজে ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু কল্যাণের পরিবর্তে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তারা যা পেয়েছে, তা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

ইত্যবসরে আমি শাইখ উসামাকে পত্র লিখে সুদানে প্রেরণ করি এবং তাঁর কাছে আলজেরিয়ায় আরও কিছুদিন অবস্থানের অনুমতি চেয়ে নিই।

ওয়ায-নসীহতের ফলাফল

যখন আমার সঙ্গে নেতৃবৃন্দের সমস্যা আরম্ভ হয়ে যায়, তখন লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলা'র সঙ্গীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের মাঝে আমি পুরনো বন্ধু আব্দুর রহমান আলফাকীহকে পেয়ে যাই। এছাড়াও আসিম, সখর, ওবায়দুল্লাহ, ফারুক এবং সালমান প্রমুখ সঙ্গীবর্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারা আমি এখানে আসার কিছুকাল পরেই এসে পৌঁছেছিলেন।

তারা আমাকে এবং আমার বন্ধু আব্দুর রহমান আল-ফকিহকে কুতুবি হওয়ার অপবাদ দেয় এবং তা প্রচারের চেষ্টা করে। কিন্তু যাদের মাঝে আমরা এতদিন অবস্থান করে এসেছি, তারা আমাদেরকে ভালোভাবেই জানতো। তাই তাদের এই মিথ্যা অভিযোগ তেমন প্রচারিত হয়নি।

কিন্তু আমাদেরও চুপ থাকার উপায় ছিলো না। কীভাবে চুপ থাকবো, তাদের কথাবার্তায় বিভিন্ন শরীয়াহগত ভুল-ভ্রান্তি আমরা দেখতে পেতাম। উদাহরণস্বরূপ বলি, তারা বলতো, 'এটাই একমাত্র ঠিক বুঝ প্রাপ্তদের জামাআত। আমাদের এই জামাআত যেখানে চাইবে, যেভাবে চাইবে এবং যখন চাইবে, হামলা করতে পারবে। 'এই লেখাটা এক ভাই পড়ছিলো। তখন আমি বলে উঠি, যাকাল্লাহ অর্থাৎ এটা তো একমাত্র আল্লাহর শান ও মর্যাদা। আমি এ কথাটা হাদীসের অনুকরণে বলেছিলাম। হাদীসে এসেছে, এক বেদুঈন বলছিলো, আমার প্রশংসা ভালো বিষয় আর আমার নিন্দা মন্দ বিষয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠেন:এটাতো একমাত্র আল্লাহর শান। এভাবেই আমরা যখনই কোনো ভুল-ভ্রান্তি দেখতাম, কোনো-না-কোনোভাবে সংশোধনের চেষ্টা করতাম। আর আমাদের এই সংশোধন প্রচেষ্টার কথা নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে যেতো।

প্রথমবার পালানোর চেষ্টা

"যাইতুনীর কাছে অভিযোগের একটা ফিরিস্তি ছিলো। নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছিলো এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে যাচ্ছিলো। আমাদের মাথার উপর যেন সারাক্ষণই তরবারি ঝুলন্ত ছিলো। এ কারণেই আমরা লিবিয়ায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক হই। আমরা এখানে অতিথি ও প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলাম, তাই লিবিয়ায় আমাদের এমনিতেও ফিরে যেতে হতো। কিন্তু GIA-এর লোকেরা সফরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করছিলো না। তাদের জানা ছিলো, আমরা

যদি বের হতে পারি, তবে তাদের ভিতরগত অবস্থা, আচার-আচরণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলো সাধারণ মুজাহিদীনের কাছে পৌঁছে যাবে। এজন্য তারা চাচ্ছিলো না আমরা বের হয়ে যাই। অবশ্য আমাদের পীড়াপীড়ি ও চাপের মুখে তারা অনুমতি দিয়ে দেয়।

আমরা নিজেদের চেষ্টায় সফরের কাগজপত্র প্রস্তুত করি। আমার কাছে নিজের পাসপোর্ট ছিলো না;বরং অন্য একজনের পাসপোর্ট নিয়ে জঙ্গলে তার উপর নিজের ছবি এবং দবদবের চেকপোস্টের মাধ্যমে আলজেরিয়ায় প্রবেশের একটা নকল সিল লাগিয়ে নিয়েছিলাম।

এভাবেই আমি এবং আব্দুর রহমান আল-ফকীহ যখন রওনা হই, তখন সেনাবাহিনী ও টহলরত পুলিশদের হাত থেকে তো বেঁচে ফিরি, কিন্তু সীমান্ত পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাই। আমাদের কাগজপত্রে সমস্যা ছিলো। যার কারণে সীমান্ত পুলিশ আমাদেরকে ছাড়তে চাচ্ছিলো না। সমস্যাটা হলো, আমরা যে তারিখের কথা লিখে দবদবের চেকপোস্টের সিল দিই;ঐদিন চেকপোস্ট বন্ধ ছিলো, কিন্তু তা আমরা জানতাম না। পুলিশের লোকেরা বলছিলো, ঐদিন তো সীমান্ত বন্ধ ছিলো তাহলে আপনারা এলেন কেমন করে? আমরা অজুহাত দাঁড় করালাম যে, লিবিয়ার একটি বিশেষ প্রতিনিধি ও বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি। আল্লাহর শুকরিয়া, আমাদের অজুহাত কাজে লেগে যায়। পুলিশ তখন আর আমাদেরকে রাজধানীতে হ্যান্ডওভার করেনি। রাজধানীতে পাঠানো হলে ওখানকার প্রশাসন আমাদেরকে চিনে ফেলতো। কারণ আমি প্রথমবার যখন আলজেরিয়ায় আসার পর লিবিয়ায় ফিরে যাই, সেবার আলজেরিয়ার জেল থেকে এবং তারও পূর্বে রাজধানী থেকে পালিয়ে বের হই। তাই দ্বিতীয়বার যখন আলজেরিয়ায় আসি তখন শহর ও নগরীর পরিবর্তে সোজা মুজাহিদীনের কাছে পাহাড় অভিমুখে রওনা হই। আমার নিজের পাসপোর্ট নষ্ট হয়ে যায়। তাই সে অবস্থায় না রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধপন্থায় সফর করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিলো, আর না জাহাজে করে আসা সম্ভবপর ছিলো।

যাহোক, তখন পুলিশের একজন ভালো লোক বললো, আমি আপনাদেরকে ছেড়ে দেবো, কিন্তু আপনারা যদি আলজেরিয়া থেকে বের হতে চান, তাহলে দবদব এলাকা দিয়েই বেরোতে হবে। কারণ হলো আমাদের পাসপোর্টে দবদবের

চেকপোস্টের সিল লাগানো ছিলো। আলহামদু লিল্লাহ, সীমান্ত পুলিশ আমাদেরকে সারাদিন অর্থাৎ ১২ঘন্টা নিজেদের কাছে রাখার পর রাত হলে বললো: ঠিক আছে আপনারা চলে যান;যে পথে এসেছেন সে পথেই আপনারা ফিরে যাবেন। ”

পুনরায় GIA-এর কাছে

“ছাড়া পাওয়ার পর আমাদের সামনে GIA-এর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিলো না। GIA-এর কাছে ফিরে আসার পর আমাদের ৩বছরের আগে দ্বিতীয়বার বের হওয়ার সুযোগ মেলেনি। এই সময়ে ২বছর ৮ মাস আমার পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তারা মাত্র ৩৫কিলোমিটার দূরত্বে রাজধানীতে অবস্থান করছিলো, আর আমি ছিলাম পাহাড়ে। উপর থেকে আমরা নিচে রাজধানী দেখতে পেতাম, আর সামনের দিকে সমুদ্রের উপকূল। কিন্তু যুদ্ধের সময় বলে পরিস্থিতি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। ”

নজরবন্দি

“ততদিনে দ্বিতীয় অঞ্চলের আমীর আবু তালহার পরিবর্তে হাসান হাত্তাব নিযুক্ত হয়। (আবু তালহা জুনুবী ১৯৯৫সালের আগস্টে দ্বিতীয় অঞ্চলের পরিবর্তে ষষ্ঠ অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত হন)। হাসান খাত্তাব আমাদের বলেন, যাইতুনী আমাদের এখানে আসার আগ পর্যন্ত আপনারা এখান থেকে কোথাও যাবেন না। কয়েক মাস পর কিছু বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে যাইতুনীর নির্দেশ আসে যে, তারা যেন অমুক কেন্দ্রে চলে যায় এবং সেখানেই অবস্থান করে। এভাবে আমাদেরকে জঙ্গলের একটি ঘাঁটিতে নজরবন্দি করে রাখা হয়। সেই ঘাঁটির নাম ছিল মারকাজুল উবূর। এটা একটা অফিসের মতো ছিলো, যেখানে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও সামরিক গ্রুপের সদস্যরা প্রোগ্রাম সাজানোর জন্য আসতো। আমাদেরকে বলা হয়-আপনারা এখান থেকে কোথাও যাবেন না। এ সময় আমরা নেতৃবৃন্দকে ধারাবাহিকভাবে পত্র প্রেরণ করতে থাকি এবং নম্রভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে থাকি, কিন্তু কোনো কাজ হয় না।

যাইতুনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

“এভাবে চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাইতুনী তার নিজের গ্রুপ কাতীবাতুল খাদরা'র সঙ্গে আমাদের অঞ্চলে এসে পৌঁছে। এটা তার নিজস্ব ব্যাটালিয়ন ছিলো।

তাদের কাছে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ছিলো। যাইতুনীর সঙ্গে আনতারও এসেছিলো। সে সর্বদা তার আমীরের সঙ্গে থাকতো।

যখন সে আসে তখন আমার মনে আছে, আমরা তার সঙ্গে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা বলি, এখানে কতোদিন যাবত অপেক্ষা করে বসে আছি, আল্লাহ লাঞ্ছনা থেকে সকলকে হিফাযত করুন!

যাইতুনী তখন দম্ভ ভরে বলে:আমার কাছে সংবাদ এসেছে, এখানে কিছু লোক আমাদের ব্যাপারে বাইরের লোকদের কাছে তথ্য পাঠাচ্ছে, বিশেষ করে সুদানে। আমি নিজের মতো করে এই বিষয়টির তদন্ত করতে চাই। এরপর কোনো একটা সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

আমি জানতাম তার এই বক্তব্যেই একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিলো। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললামঃ আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই;আমাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। আর আসলেও ততদিনে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যাইতুনীর অবস্থান আমাদের আগে থেকেই জানা ছিলো। সাক্ষাতের পর আমরা তার সম্পর্কে পূর্ব ধারণার ব্যাপারে নিশ্চিত হই। সে আমাদের কথাবার্তা এবং তথ্যপাচারের ব্যাপারে ভয় করতো। বিশেষত এ কারণে যে, ব্রিটেনে অবস্থানরত ভাইয়েরা তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করে। আর ১৯৯৬সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই সার্বিক অবস্থা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। ”

হত্যার পরিকল্পনা

“আমরা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেই কেন্দ্রে অবস্থান করি। ওই কেন্দ্রে সেই এলাকার সেনাবাহিনীর আমীর জাকারিয়াও সময়ে সময়ে আসতো। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তার একটি কারণ এই ছিলো যে, সে ইতোপূর্বে আবু তালহা জুনুবীর অনুগত ছিলো। সে বারবার গোত্রীয়, পুণ্যবান ও শিক্ষিত লোক ছিলো।

যাইতুনী চলে যাওয়ার পর তার সঙ্গে জাকারিয়ার সাক্ষাৎ হয়। কারণ জাকারিয়া সামরিক কমান্ডার ছিলেন। এজন্য তিনি নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতেন। যাইতুনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি আমাদের কেন্দ্রে আসেন এবং গোপনে আমাকে বলেন যে, মজলিসে শুরার সদস্য এবং

শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক আবুল ওয়ালীদের কাছ থেকে জানতে পারি, মজলিসে শুরায় আপনাদের উভয়কে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা আপনাদের থেকে মুক্তি চায় এবং আশঙ্কা রয়েছে যে, আপনাদেরকে হত্যা করা হবে। এজন্য সতর্ক থাকবেন। জাকারিয়ার সততা ও নিষ্ঠার প্রতি আমার আস্থা ছিলো। আমি তখনই বিশ্বাস করি যে, সে আমার ভালো চাচ্ছে।

তখন আমি আব্দুর রহমান, আসিম ও সখরের কাছে যাই। অবশিষ্ট ছ'জন লিবিয়ান সঙ্গী পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় আল-জামাআতুল মুকাতিলা'র সঙ্গীদের কাছে যাওয়ার পর আমরা চারজন রয়ে যাই। আমাদের চারজনের মধ্যে আমি এবং আব্দুর রহমান ছাড়া বাকি দুজনের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের কোনো ঝামেলা ছিলো না। কারণ তারা দুজন সামরিক সঙ্গী ছিলেন। শুধু আমরাই শুরুতে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করার কাজ করতাম। সে সবের ভিত্তিতেই তারা আমাদেরকে সে সময়ে বিদআতী বলে এবং শুরুর দিকে এক পর্যায়ে আমরা তাদেরকে জবাব পর্যন্ত দেই।

পলায়নের সফল চেষ্টা

"ভাইদেরকে জাকারিয়ার কথা বলার পর আমি এবং আব্দুর রহমান সিদ্ধান্ত নিই যে, যেকোনো পন্থায় আমাদেরকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। কারণ যেকোনো সময়ে আমাদেরকে হত্যা করা হতে পারে। আমরা আছিমের কাছে পালানোর কথা বললে সেও রাজী হয়ে যায়। সে সমঝদার ও বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলো। কিন্তু সখরকে অনেক বোঝানোর পরেও সে পালাতে রাজী হলো না। অগত্যা আমরা তাকে বলি, তাহলে আমাদের কথা কাউকে বলে দিও না এবং যাইতুনী যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে ছিলে। বাস্তবেও যাইতুনী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, কিন্তু পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেয়। যদিও আনতারের সময়ে তাকে হত্যা করা হয়।

বসন্তের মৌসুম তখন সবেমাত্র শুরু হয়। সে রাতে আমরাই পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমাদের দুজনের সঙ্গে GIA-এর একজন সঙ্গী দায়িত্বে ছিলো, যাকে আমরা বুঝিয়ে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিই। আল্লাহর দয়া যে, তারা আমাদেরকে নজরদারিতে রাখলেও শিকল দিয়ে আটকে রাখেনি। তখন পর্যন্ত অপরাধীর মতো আচরণ না করে স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে থাকতে দেয়। এ কারণে প্রহরার

দায়িত্বেও আমরা অংশগ্রহণ করতাম। এভাবে রাত বারোটায় আমরা তিনজন পালিয়ে যাই।

আমার কাছে আছিমের নিজের তৈরি দেশীয় অস্ত্র ছিলো। সে সময়ে GIA-এর কাছে অস্ত্রশস্ত্র খুবই কম ছিলো। GIA-এর সাধারণ সঙ্গীদেরকে দেখা যেতো;দুবছর হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। প্রতি একশ'জন সদস্যের কাছে শুধু ২টা ক্লাসিনকভ বন্দুক থাকতো।

আমরা আরবিয়ার নিকটস্থ এলাকা পর্যন্ত সাধারণ পথে পায়ে হেঁটে চলি। তখন আমরা প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার হেঁটে অতিক্রম করি। আমি সে রাস্তা চিনতাম। জঙ্গল পথে গেলে দশ কিলোমিটার কম লাগতো;কিন্তু সে পথ আমার চেনা ছিলো না। এছাড়াও আশঙ্কা ছিলো, জঙ্গল পথে যদি একবার হারিয়ে যাই, তাহলে আবারও তাদের হাতে পড়তে হবে। প্রথমদিকে আমরা দীর্ঘপথ দৌঁড়ে অতিক্রম করি। ”

আরবিয়ার এলাকায়

“সে সময়ের কথা বলছি, যখন বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ছোট গ্রুপের পক্ষ থেকে GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিস্থিতি ছিলো এবং আরবিয়ার রেজিমেন্ট GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে যায়। GIA-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগের ব্যাপারে জানতাম বিধায় আমরা তাদের কাছেই যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এমনিতেও আমরা তাদের এলাকার কাছাকাছি ছিলাম। আর ইতোপূর্বে তাদের এলাকায় কিছু সময় যাপনের সুবাদে তাদের কতক দায়িত্বশীলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিলো।

পরবর্তীতে আমরা শুনি, হাসান হাত্তাব তার গ্রুপ নিয়ে পথিমধ্যে আমাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে ছিলো। কিন্তু পথে আমরা কোনো কিছু টের পাইনি। জানিনা এই সংবাদের সত্যতা কতটুকু?

আমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে আরবিয়ার এলাকায় পরেরদিন প্রায় যুহরের সময় এসে পৌঁছোই। GIA-এর সঙ্গে আরবিয়ার যুদ্ধ ততদিনে শুরু হয়ে যায়। এ কারণেই আরবিয়ার সৈন্যরা পথে মাইন নিয়ে বসেছিলো।

সে সময় আলজেরিয়ায় সাধারণত দেশি মাইন তৈরি হতো। তারের সাহায্যে যেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হতো। রিমোট সিস্টেম তখন পর্যন্ত আলজেরিয়ায়

আসেনি। আমাদেরকে দেখামাত্রই তারের ওপর বসে থাকা এক মুজাহিদ বলে ওঠে: টেনে দাও। কিন্তু অপরজন আমাদের আজব ধরনের বেশভূষা দেখে বললো, একটু থামুন। অতঃপর সে নিজের সঙ্গীদেরকে ডেকে নিয়ে আসে। সঙ্গীরা এসে আমাদেরকে চিনে ফেলে। এভাবেই আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা যাইতুনীর হাত থেকে রক্ষা পাই। সেখানে দু'বছর পর্যন্ত আমরা অবস্থান করি। এ সময়ের মাঝে আমি নিজের ঘরের লোকদের জন্য প্রোগ্রাম রাখতে পারি। অবস্থা তখন বেশ অনুকূল হয়ে যায়।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তাঁর অধিকাংশ সময় ওই আরবিয়া ও যাবারবারের গ্রুপগুলোতে অতিবাহিত করেন। আল-হিসবা ফোরামে প্রশ্নের জবাবে এ বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। তার ভাষায়ঃ

"ইয়াসার উপত্যকার পাশে আখদারিয়ার পেছনে যাবারবার পাহাড়ে"

আশার ভাঙ্গা-গড়া

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আল-হিসবা ফোরামে বলেন-

"ব্যক্তিগতভাবে আমি আলজেরিয়াতে এক জটিল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। সেখান থেকে কোনোমতে প্রাণে নিয়ে বের হয়ে আসি। সে সময় আমি মনে করেছিলাম, এখন মনে হয় আমার জীবনে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জিহাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না। আমি পুরোপুরি নিরাশ হয়ে যেতে বসি। দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, হতাশা ও বিরক্তি আমাকে ঘিরে ধরেছিলো।

কিন্তু আলজেরিয়া থেকে বের হওয়া মাত্রই পৃথিবীর পূর্বদিকে চেচনিয়ার ঘটনাপ্রবাহে দেখতে পাই যে, হাজার হাজার যুবক কীভাবে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। সে সময়ে সাইফুল ইসলাম খাত্তাব রহিমাহুল্লাহ 'র পৌঁছে যাবার পর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি চলছিলো। এদিকে আফগানিস্তানে তালেবানের অভ্যুত্থানের পর নতুন করে আশা জাগে। শাইখ উসামা এবং তাঁর সঙ্গীরা সুদান থেকে দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে পৌঁছান। মুজাহিদরা সেখানে একত্রিত হচ্ছিলো। এভাবে অল্প কিছুদিন পর আমার মাঝে জীবনের স্পন্দন ফিরে আসে এবং আমি আমার ভেতর থেকে হতাশা ঝেড়ে ফেলি। আমি তখন উপলব্ধি করি, কখনই আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়।

আমি তখন বাস্তবিকই উপলব্ধি অর্জন করি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর—

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا[৪৮]

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا [৪৯]

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا[৫০]

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْم[৫১]

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ[৫২]

অতএব, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! সাবধান! কখনই হতাশ হওয়া চলবে না!

আল্লাহর কাছে আশা করুন এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করুন!

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থঃ“মূসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।”(সূরা আল আরাফ; ১২৮)

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ -- فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ

---

[৪৮] অর্থঃ অচিরেই আল্লাহ প্রতিকূলতার পর আনুকূল্য দান করবেন। (সূরা আত তালাক: ০৭)

[৪৯] অর্থঃ হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন উপায় বের করে দেবেন। (সূরা আত তালাক: ০১)

[৫০] অর্থঃ আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্যে সহজ করে দেন। (সূরা আত তালাক: ০৪)

[৫১] অর্থঃ তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা: ২৬)

[৫২] অর্থঃ তিনি কতোই না উত্তম অভিভাবক এবং কতোইনা উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল আনফাল: ৪০)

وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ-- إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সঙ্গে মুকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জামসহ;তাদের ভয় কর। তখন তাদের ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট;কতই না চমৎকার কামিয়াবি দানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকেই ভয় করো।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩—১৭৫)

আমরা যখন আলজেরিয়াতে GIA-এর বিশৃঙ্খলা ও ভয়ানক পথভ্রষ্টতা দেখে ফেলি, এখন এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে জিহাদের পথে এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা ও বিপদের আশঙ্কা আর আমাদের নেই। [৫৩]

দশম পরিচ্ছেদঃ যাইতুনীর সময়কালের পরিসমাপ্তি

বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের GIA থেকে বিচ্ছিন্নতা

আবূ সুমামা সাব্বানের পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত (১৯৯৫ সল)

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

"১৯৯৫সালে খারিজীদের মানহাজ পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। GIA-এর নেতৃবৃন্দ এবং আশেপাশের বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ছোট গ্রুপ এসব খারিজী চিন্তায় জড়াতে থাকে। মুজাহিদীন ও সাধারণ গ্রাম্য লোকদেরকে তাকফীর করা এবং তাদেরকে

[৫৩] কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এরপর আইএসের নামে এর চেয়েও বড় ফিতনা জন্ম নেয় এবং গোটা পৃথিবীর জিহাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। আল্লাহ তাআলা এর অনিষ্ট থেকেও উম্মতকে এবং মুজাহিদদেরকে হিফাযত করুন! যেমনিভাবে GIA-এর অনিষ্ট থেকে হিফাযত করেছেন—আমীন।

হত্যা করার বায়বীয় ফাতওয়া ছড়াতে থাকে। সে সময় ‘মরিবার তরে’ যেন GIA-এর পাখা গজাচ্ছিল।

সর্বপ্রথম জাবালুল লাওহ-এর এলাকায় ‘জুন্দু উসমান ইবনে আফফানে’র আমীর **শাইখ আবু সুমামা আব্দুল কাদের সাব্বান** ১৯৯৫সালের শরৎকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তিনি GIA থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হবেন। তাঁর এলাকার আরও কিছু ছোটো গ্রুপ একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবেই ক্রমশই পৃথক অবস্থান অবলম্বনকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শাইখ আবূ সুমামা আব্দুল কাদের সাব্বান কাতীবাতুল খাদরায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মুজাহিদীনের মধ্যকার বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আরবাভীর সিদ্ধান্ত, এর পরিণতিতে মুজাহিদীন হত্যার ঘটনা এবং নেতৃবৃন্দের অবস্থান স্বচক্ষে দেখার পরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শাইখ আবু সুমামা আব্দুল কাদের সাব্বান জামাল যাইতুনীকে একটি পত্রের মাধ্যমে তাঁর পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অবহিত করে। সেই পত্রে জামাআতের পথভ্রষ্টতা তিনি চিহ্নিত করেন, মুজাহিদীনের মাঝে সংঘটিত নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহ এবং ভবিষ্যতে ঘটমান খুন খারাবির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেন। ”

শাইখ আবু সুমামা আব্দুল কাদের সাব্বান পরবর্তীতে আল-জামাআতুল সানিয়্যা লিদ দাওয়াত ওয়াল জিহাদ গঠন করেন এবং শাইখ আসিম আবু হাইয়ান তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন।

আলফিদা ব্যাটালিয়নের পৃথক হবার সিদ্ধান্ত

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“ব্যাটালিয়নগুলো'র বিচ্ছিন্নতার একটা বড়ো কারণ হলো শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ এবং শাইখ আব্দুর রাযযাক রাজ্জামের হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ডের পরই GIA বিদআতীদেরকে নির্মূল করার মাধ্যমে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনার কাজ আরম্ভ করে। GIA যখনই আল-জাযআরাহ'র বিরুদ্ধে ১৯৯৬সালে বিবৃতি জারী করে, তখন মেডিয়া প্রদেশের আল-ফিদা ব্যাটালিয়ন সর্বপ্রথম পৃথক হবার সিদ্ধান্ত

গ্রহণকারী গ্রুপ ছিলো। এরপরই পুরো আরবিয়া অঞ্চল পৃথক হয়ে যায়। মেডিয়া ও আরবিয়া উভয় অঞ্চল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াইকাল থেকেই স্ট্র্যাটেজিক এলাকা এবং মুজাহিদীনের জন্য মজবুত কেল্লা ছিলো। শেষ পর্যন্ত যাইতুনীকে মেডিয়ার বাহিনী হত্যা করে। ”

এই উভয় এলাকা ইমারতের কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকাগুলোর মাঝে গণ্য হত।

অন্যান্য ব্রিগেডের পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত

শাইখ আসিম হাফিযাহুল্লাহ বিবরণ দেনঃ

“একইভাবে আল-কাতীবাতুর রব্বানিয়া পুরোটা, আল-খাদরা'র অধিকাংশ মুজাহিদ, মেদিয়া প্রদেশের তেমুযিকদা এলাকার আল-ফিদা ব্রিগেড, জেলফা প্রদেশের বিসারা এলাকার কাতীবাতুল ফুরকান, জেলফারই অপর গ্রুপ কাতীবাতুল ফাতহের অর্ধেক, এল্ডফলা প্রদেশের খামীস-মিলয়ানা এলাকার কাতীবাতুর রহমান আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ”

এছাড়াও শাইখ আবু সুমামার পর হাসান হাত্তাবের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অঞ্চল, অতঃপর আবু তালহা জুনুবীর নেতৃত্বে ষষ্ঠ অঞ্চল, এরপর আবু ইব্রাহিম মুস্তফার নেতৃত্বে পঞ্চম অঞ্চল, অতঃপর খালিদ আবুল আব্বাসের নেতৃত্বে নবম অঞ্চল এবং তারপরে অবশিষ্ট অঞ্চল ও গ্রুপগুলো পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সাল শেষ হবার আগেই বহু এলাকা, বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ব্যক্তিত্বরা GIA থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অবশ্য মুজাহিদীনের মাঝে যোগাযোগের দুর্বলতা এবং অঞ্চলসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ার কারণে বহু এমন এলাকা ও রেজিমেন্ট ছিলো, যারা আরও পরে পৃথক হয়। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থার এই দুর্বলতা এবং অঞ্চলসমূহের পারস্পরিক দূরত্বের একটা ভালোদিক এই ছিলো যে, অধিকাংশ এলাকা চরমপন্থার ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে।

হাসান হাত্তাবের আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় অঞ্চলের আমীর হাসান খাত্তাব ১৯৯৬সালে নিজের সাক্ষ্য বাণীতে বলেন-

“আমি যাইতুনীর কাছে বসে তাকে পরামর্শ দিই। তার ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেই। এমন সময় দু'ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, আমরা শাইখ আবু সালেহকে হত্যা

করে এসেছি (হাসান খাত্তাব তখন বলেন-)তোমরা শাইখকে কেন হত্যা করেছ? তখন যাইতুনী এর জবাবে বলেঃ আমরা যদি তাকে হত্যা না করতাম, তাহলে মসীলা প্রদেশের পুরোটাই আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতো। কারণ ঐ প্রদেশে তিনি বড়মাপের মানুষ ছিলেন এবং সবাই তাঁর কথা মেনে চলতো। আর তাঁরও ইচ্ছা ছিলো, প্রদেশের সঙ্গীদেরকে জামাআতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করার। তখন আমি তাকে বলি, আপনি যা করেছেন, তাতে পুরো আলজেরিয়া আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে;শুধু মসীলা নয়। ”

এ ঘটনার পরপরই হাসান খাত্তাব তার পুরো এলাকাসহ জামাআতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর গ্রুপই পরবর্তীতে আল-জামাআতুল সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল গঠন করে।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাইতুনীর যুদ্ধ ঘোষণা

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বর্ণনা করেনঃ

“এভাবে কয়েক সপ্তাহ যেতেই জামাল যাইতুনীর গ্রুপ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমরা চাচ্ছিলাম, লড়াই আমরা আরম্ভ করব না। আমাদের চেষ্টা ছিল যথাসম্ভবপর লড়াই এড়িয়ে চলার। কিন্তু জামাল যাইতুনী মূর্খোচিত দলান্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর যেহেতু সে নিজেকে খলীফা মনে করতো, এজন্য বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কঠিন যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়, এমনকি বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর এলাকায় গিয়ে তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে। এ অবস্থায় মধ্যাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাগুলোর সেসব ব্যাটালিয়ন জামাল যাইতুনীকে সঙ্গ দেয়, যারা নিজেরাও এই পথভ্রষ্ট খারিজী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ”

আহলে হকের বিদ্রোহ (১৯৯৬ থেকে ২০০৩ সাল)

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বর্ণনা করেনঃ

“যখন GIA পুরোদমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন আমরা প্রতিরোধের শরীয়াহ দায়িত্ব পালন করি। খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তখন আমরা একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করি। সেই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন লেখালেখির

কাজও করি। সংশোধন ও দাওয়াতমূলক বিভিন্ন লেখা আমরা তাদের এগিয়ে আসার পথে ফেলে আসি, যাতে সেগুলো পাঠ করে তারা তাওবা করতে পারে। সেসব লেখায় আমরা তাদের বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করি। কিন্তু এতে তারা আরও ক্ষেপে যায় এবং ভয়ানক হয়ে ওঠে। এভাবেই উভয়পক্ষের মাঝে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধে আমাদের এবং তাদের বহু লোক নিহত হয়।

যতদিন পর্যন্ত খাদরা সংলগ্ন বারবাকিয়ায় তাওহীদ ব্যাটালিয়ন, মেদিয়ার ওয়ারাহ এলাকায় আস-সুন্নাহ ব্রিগেডসহ অন্যান্য এমন বিভিন্ন রেজিমেন্ট;যেগুলো সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সুবিবেচনাবোধ থেকে মুক্ত ছিলো এবং যাদের কারণে এতসব খুন-খারাপি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তারা GIA-এর অনুগত থেকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এসেছে, ততদিন পর্যন্ত এই ভয়াবহতা চলতেই থাকে। অবশেষে তাদেরও পালা এলে আনতার যাওয়াবেরী তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাদেরকে একেবারে মূলোচ্ছেদ করে দেয়। ”

শাইখদের GIA-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ-ঘোষণা (জুন ১৯৯৬ সাল)

ওদিকে লন্ডনে GIA-এর বিপথগামিতার সংবাদ আসার পরেও শাইখ আবু কাতাদাহ'র অবস্থান এই ছিলো যে, যেহেতু এই সময়টা খুবই মূল্যবান ও স্পর্শকাতর এবং জিহাদী আন্দোলন সফল হওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তাই যথাসম্ভবপর সুধারণা রেখে তাদের প্রতি সমর্থন অটুট রাখা, তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখা কিংবা সেসব কাজে কোনোভাবে শরীয়ত কর্তৃক বৈধতা থাকলে তা তুলে ধরা;আর যদি নসীহত ও উপদেশ দিতে হয়, তাহলে শরীয়ার দলীলের মাধ্যমে তা প্রদান করা হয়। যেন আমাদের কাজের দ্বারা জনসাধারণ জিহাদের পথ থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ না করে।

অপরদিকে শাইখ আবু মুসআব সূরীর রায় ছিলো-যদি আমরা যথাসময়ে তাদের ভুলগুলো শুধরে না দিই, তবে এসবের ফলে জনসাধারণ এমনিতেই জিহাদের পথ থেকে দূরে সরে যাবে। তাঁর পরামর্শ ছিলো, কেবল নসীহত এবং ভুল দিকগুলো চিহ্নিত করে দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এই জামাআত এবং তার গর্হিত কাজগুলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা উচিত।

শাইখ আবূ মুসআব সূরীর সঙ্গে অপর কিছু পুরানো মুজাহিদ, লিবিয়ার আল-জামাআতুল মুকাতিলা, মিশরের জামাআতুল জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুজাহিদ সকলেই GIA-এর পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে একমত ছিলো। শাইখ আবূ মুসআব সূরীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছিল, GIA-এর পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বিশ্বের সব অঞ্চলের জামাআতগুলোর পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতি প্রদান করা হবে। কিন্তু শুরুর দিকে আল-জামাআতুল মুকাতিলার পক্ষে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা সম্ভবপর ছিলো না। কারণ তাদের বিভিন্ন সদস্য তখনও আলজেরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান ছিলো। তাদের ভয় ছিলো, ঘোষণার পর তাদের সদস্যদেরকে হত্যা করা হতে পারে। এদিকে মিশরের জামাআতুল জিহাদের আমীর ডক্টর আইমান আল যাওয়াহিরী সুদানের পর ইয়েমেন থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর পুরোপুরি কোণঠাসা ও একঘরে অবস্থার শিকার হন। অবশ্য শাইখ আবু মুসআব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

যাহোক, যখন লিবিয়ার মুজাহিদীন এবং GIA-এর তাওবাকারী সদস্যরা আলজেরিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তখন তাদের থেকে কেউ কেউ লন্ডনে এসে খোদ শাইখ আবু কাতাদাহ হাফিজাহুল্লাহ'র সামনে বাস্তবতা তুলে ধরে এবং ভয়ানক পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়। তখন তিনিও GIA-এর পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বলতে আরম্ভ করেন এবং তাদের প্রতি পূর্বের সমর্থন প্রত্যাহার করেন। অবশ্য তিনি সমর্থন ফিরিয়ে নেওয়ার পর লন্ডনে আশ্রয় নেয়া একজন প্রসিদ্ধ খতীব শাইখ আবু হামজা মাসরী GIA-এর সমর্থক হয়ে যান। কিন্তু যখন আনতার যাওয়াবেরী আলজেরীয় জনসাধারণকে ঢালাওভাবে তাকফীর করতে আরম্ভ করে, তখন তিনিও সমর্থন থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাদেরকে খারিজী ও তাকফীরি আখ্যা দেন।

শাইখ আবূ মুসআব সূরী যখন পরিবেশ তৈরি দেখতে পান, তখন পুনরায় অফিশিয়ালি সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রসিদ্ধ আরবী পত্রিকা আল-হায়াতের একজন সাংবাদিক কুমাইল তাবীলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিবৃতি প্রকাশ করতে তাকে সম্মত করেন। অবশ্য মুজাহিদীন সিদ্ধান্ত নেয়, সবাই আলাদা আলাদাভাবে বিবৃতি দেবে। তাই শাইখ আবু কাতাদাহ, শাইখ আবু মুসআব সূরী, মিশরের জামাআতুল জিহাদ এবং লিবিয়ার আল-জামি'আতুল মুকাতিলা'র পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

সেসব বিবৃতির প্রতিপাদ্য এই ছিলো যে, জিহাদী জামাআতসমূহ এবং জিহাদী ব্যক্তিত্বরা আলজেরিয়ার আল-জামীআতুল ইসলামিয়া আল-মু সাললাহাহ'র তথা GIA-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করছে।

যাইতুনীর হত্যাকাণ্ড (জুলাই ১৯৯৬ সাল)

অবশেষে জামাল যাইতুনী মেডিয়া প্রদেশের তামযকিদা এলাকার পাহাড়ে আল-ফিদা ব্যাটালিয়নের হাতে নিহত হয়। যাইতুনী ওই রেজিমেন্টের আমীর বশির তুর্কমানকে, যার বিরুদ্ধে আল-জাযআরাহ'র অভিযোগ ছিলো, নিজের কাছে ডেকে পাঠায়। কিন্তু বশির GIA থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'আর-রাবেতাতুল ইসলামিয়া লিদ দাওয়াত ওয়াল কিতাল'গঠন করেন। যেহেতু এই গ্রুপটির অবস্থান যাইতুনীর কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিলো, এজন্য সে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধে মেতে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ওই রেজিমেন্টের সদস্যরা যাইতুনীর গ্রুপের বিরুদ্ধে ১৯৯৬সালের জুলাই মাসে আততা'র এলাকায় অ্যামবুশ পেতে যাইতুনীকে হত্যা করে।

আর তারপর আনতার যাওয়াবেরী যাইতুনীর স্থলাভিষিক্ত হয়। নেতৃত্ব লাভের পর সে এবং তার গ্রুপ আরও অধিক পথভ্রষ্টতার পথে অগ্রসর হয়। আর তখন আরও বেশি বেশি এলাকা ও সামরিক গ্রুপ GIA থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

যাইতুনী কীভাবে মারা গেছে এ সম্পর্কে আলফিদা ব্রিগেডের আলী ইবনে হাজার বলেন-

"পূর্ব থেকে অ্যামবুশ পেতে যাইতুনীকে হত্যা করা হয়নি। যখন আমরা GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, তখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখনও আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। আমরা শুধু তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে বলি যে, আমরা তাদের সঙ্গে থেকে আর জিহাদ করবো না। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেই থেমে থাকেনি, বরং মেডিয়া প্রদেশের আশেপাশে পাহাড়গুলোতে আমাদের ঠিকানা লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে আমরা তাদেরকে জবাব দেই। যখন তারা আমাদেরকে আমাদেরই এলাকায় হত্যা করতে আরম্ভ করে, তখন আমরা জরুরী মনে করি যে, আমরাও তাদেরকে তাদের এলাকায় হত্যা করবো, অন্যথায় তাদের অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে আর আমরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বো।

এ কারণে আমরা আমাদের এলাকায় উপস্থিত GIA-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে অ্যামবুশ পাতি। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো বিধায় যাইতুনী নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়। তখনও আমরা জানতাম না সে কোন্ জন? আমরা বিরোধীপক্ষের সাধারণ সদস্য মনে করে দুই সহযোগীসহ তাকে হত্যা করি। নিহতদের কাগজপত্রে যখন আমরা তাদের পরিচয় দেখি তখন বুঝতে পারি, এরা সাধারণ কোনো সদস্য নয়। কিন্তু তখনও আমরা জানতাম না, তাদের মাঝেই যাইতুনী আছে। অবশেষে রাতে আমরা রেডিওতে শুনতে পাই, ওই স্থানে যাইতুনী এবং তার দুই সহযোগী নিহত হয়েছে।”

একাদশ পরিচ্ছেদঃ আনতার যাওয়াবেরী এবং চরমপন্থার দ্বিতীয় যুগ (১৯৯৬—২০০২ সাল)

আনতার যাওয়াবেরী'র নেতৃত্ব

যাইতুনী নিহতের পর কেন্দ্রীয় এলাকায় উপস্থিত একজন ছাড়া তার সহযোগী বাকি সকলেই আনতার যাওয়াবেরী ওরফে আবু তালহাকে আমীর নিযুক্ত করার ব্যাপারে একমত হয়ে যায়। ভিন্নমত পোষণকারী হলো নূরুদ্দীন আর পি জি। একমত সদস্যদের মাঝে আবু ফারিস এবং আবু বাসির রেজওয়ানের মতো পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য সদস্যরা ছিলো সর্বাগ্রে। এই সিদ্ধান্তে অন্যান্য এলাকার অধিকাংশ সদস্যের মতামত কোনো মূল্য পায়নি। এভাবেই ১৯৯৬সালের আগস্ট থেকে ২০০২সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পথভ্রষ্ট আনতার যাওয়াবেরী'র নেতৃত্বে চরমপন্থার নতুন এক যুগের সূচনা হয়।

আনতার যাওয়াবেরী'র ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন

দ্বীনদারীর অভাব এবং চরিত্রহীনতা

সে ১৯৭০সালে ব্লিডা'র বূ ফারেক এলাকায় জন্মগ্রহণ করে। শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“আমি তাকে চিনি না। কিন্তু তার গ্রুপে থাকা পরবর্তীতে তাওবাকারী মুজাহিদদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে ছিলো চরিত্রহীন, পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের মানুষ। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ছিলো তার তাড়াহুড়ো ও কঠোরতা। অশিক্ষিত হওয়া ছাড়াও দ্বীনদারী, যিকির-তিলাওয়াতে ছিলো তার নিতান্তই অবহেলা। রাতের পুরোটাই

অপ্রয়োজনীয় কাজের পেছনে নষ্ট করতো, এমনকি অর্ধেক রাত পার হয়ে যাবার পর এশার সালাত পড়তো। ❞

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

❝অতীতে তার না ছিলো কোনো জিহাদী অবদান, আর না সে নিজে ছিলো দ্বীনদার। আসলে তার ভাই ইব্রাহিম যাওয়াবেরী আগে মুজাহিদ ছিলেন, যিনি দ্বীনদারও ছিলেন। আনতার নিজের ভাইয়ের শাহাদাতের পর ১৯৯২, ১৯৯৩সালে জামাআতে অংশগ্রহণ করে এবং আসা মাত্রই অস্ত্র তুলে নেয়। সে দ্বীনদার ছিলো না বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বাহাদুর ও সাহসী ছিলো। আবু আব্দুল্লাহ আহমদ শুরুতে তাকে নিজের কাছে এজন্যই রাখেন যে, তার ভাইও শাহাদাতের আগে আমীরের সঙ্গে ছিলেন। যাওয়াবেরিকে তিনি বিভিন্ন অপারেশনে পাঠাতেন, তবে তার কোনো পদ ছিলো না। আর এভাবেই সে যাইতুনীর সময়ও থেকে যায়। ❞

ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট হবার অভিযোগ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

❝কিন্তু তার সকল অনাচার সত্ত্বেও তাকে আমি ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মনে করি না। বাস্তবতা বোঝার জন্য যদি আমরা প্রমাণ খুঁজি, তাহলে দেখবো, প্রথমত সে শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছে। অতঃপর যে সময় তাগুত বাহিনী ঘরের লোকদেরসহ তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে অবরোধ করলো, তখন সে নিজের ছেলে আলী এবং নিজের স্ত্রীকে এন্ডফলা'র যুকার পাহাড়ে এজন্য হত্যা করে, যাতে তারা শত্রুর হাতে ধরা না পড়ে।

আনতার যাওয়াবেরী'র জামাআতে কল্যাণ ও স্বার্থ বিবেচনায় এ ধরনের একটা ফাতওয়ার উপর আমল করা হতো। এই ফাতওয়া অনুযায়ী শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের পরিবার পরিজনকে হত্যা করার অনুমতি ছিলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তার স্ত্রী-সন্তানেরাও এই ফাতওয়ার ব্যাপারে সম্মত ছিলো। ❞

বিভ্রান্তির বৃদ্ধি

আনতার যাওয়াবেরী'র সময়ে GIA-এর নেতৃবৃন্দের মাঝে আবুল মুনযির আল-জুবায়ের ছাড়া অপর কোনো পথভ্রষ্ট অর্ধশিক্ষিত আলিম অবশিষ্ট ছিলো না। GIA-এর আমলে মুসলমানদের রক্ত সম্মান এবং জিহাদের পথে বিভ্রান্তির সকল দায় আবুল মুনযিরের।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কারণে জনসাধারণকে তাকফীর (১৯৯৬ সাল)

আনতার আমীরে জামাআত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে কাজটা করে তা হলো, ১৯৯৫সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী লোকদের বিধান বর্ণনা। তাই সে 'সাদ্দুল লিআম আন হাওযাতিল ইসলাম'নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণে আলজেরিয়ার জনসাধারণকে তাকফীর করা হয়। আর তাই মুরতাদের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব বলা হয়। ১৯৯৬এর শেষের দিকে এই ফাতওয়া অনুযায়ী তারা আমল করতে আরম্ভ করে। এর ধারাবাহিকতায় আলজেরিয়ার সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যার এক ভয়ানক অধ্যায় শুরু হয়।

ভয়ানক গণহত্যার শিকার মুসলমানরা (১৯৯৭ সাল)

১৯৯৭সালের গ্রীষ্মে প্রেসিডেন্ট যারবাল নিজেরই শাসনামলে প্রণীত নতুন সংবিধানের অধীনে পুনরায় পার্লামেন্ট নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে। সেই নির্বাচন চলাকালে 'সাদ্দুল লিআম আন হাওযাতিল ইসলাম' বিবৃতিটি দ্বিতীয়বার প্রচার করা হয়। ১৯৯৭সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৯সালের জুন পর্যন্ত প্রায় আঠারোটা মর্মান্তিক গণহত্যার ঘটনায় নারী শিশুসহ ২৯০০মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

মুসলিম নারীদেরকে গোলাম বানিয়ে হত্যা (১৯৯৭ সাল)

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

❝এ রক্তাক্ত অধ্যায় সর্বপ্রথম সেসব লোককে হত্যার মাধ্যমে আরম্ভ হয়, যারা নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলো। অতঃপর অপর এক বিবৃতির মাধ্যমে এই অধ্যায় সকল পুরুষ ও শিশুকে হত্যা এবং নারীদেরকে দাসী বানানো পর্যন্ত গড়ায়। শিশুদেরকে নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ কুরআনের

আয়াত—**ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا**—অর্থাৎ, ``এবং তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফির``—এর ভিত্তিতে হত্যা করা হয় এবং বলা হয়, তাদেরকে হত্যা করা না হলে বড়ো হয়ে তারা নিজেদের পিতাদের প্রতিশোধ নেবে। ”

এই বিবৃতির সঙ্গে GIA একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা জারী করে। সেই নির্দেশনায় মুসলিম জনসাধারণকে কাফির সাব্যস্ত করার পর তাদের নারীদেরকে বন্দি করে তাদের সঙ্গে জোরপূর্বক যেনা করার অনুমতি দেয়া হয়। শুধু তাই নয় বরং এই কাজের রূপরেখা এভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, একজন নারীর সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ যেনা করবে। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় থাকবে। সবার কাজ শেষ হলে ওই নারীকে হত্যা করা হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই গ্রুপ এতটাই নৃশংস ও পাশবিক কাজ করে, যা তাদের পূর্বে অন্য কোনো খারিজী পথভ্রষ্ট গ্রুপ করেনি। এ কারণে স্বতন্ত্রভাবে এ গ্রুপের নাম যাওয়াবেরী গ্রুপ হয়ে যায়। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বরবাদ করুন! যেভাবে তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করেছে এবং ইসলাম ও জিহাদকে বিকৃত করেছে।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ 'র সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“GIA কোনো সন্দেহ ছাড়াই জামাআতুত-তাকফীর ওয়াল হিজরাহ এবং খারিজীদের চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা জনসাধারণকে তাকফীর এবং প্রতিটি মানুষকে হত্যা করা জায়েয মনে করত। এটাই তাদের রীতি ছিলো। ”

“যখন একদিকে অগণিত ব্যাটালিয়ন GIA থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছিলো, অপরদিকে লোকেরা GIA-এর প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে নির্বাচনে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন GIA-এর লোকেরা ক্ষেপে যায়। তারা বিভিন্ন প্রদেশকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করে। কোনো কোনো প্রদেশকে বলে বিদ্রোহী, আবার কোনো কোনো প্রদেশকে স্থির করে মুরতাদ বলে। এভাবে সর্বপ্রথম যে প্রদেশের বিরুদ্ধে তারা লড়াই শুরু করে তা হলো টিপাজা। এই প্রদেশের সরকারি নাম্বার ছিল৪২। এরই ভিত্তিতে ৪২ নম্বর গাড়ি দেখামাত্রই তারা টার্গেট করে আক্রমণ করে বসতো। এটাও দেখার প্রয়োজন অনুভব করতো না,গাড়িতে কারা রয়েছে। ”

তালাগ গণহত্যা

“তালাগে একটা বড়ো গণহত্যা সংঘটিত হয়। GIA-এর সদস্যরা ১৯৯৭সালের রমজান মাসে তারাবীর সালাত চলা অবস্থায় এক মসজিদে প্রবেশ করে। তারা মসজিদের লোকদেরকে ডাকতে থাকে। কেউ এলে তাকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি ভোট দিয়েছেন? যদি উত্তর আসতো-জি হ্যাঁ, তখন তাকে বলা হতো, আপনি একটু অমুক কক্ষে যান। গেলে সেখানে তাকে হত্যা করা হতো। আর যদি উত্তর আসতো, না;তাহলে তাকে অন্য এক জায়গায় পাঠানো হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই হত্যা করা হয়। লোকেরা যখন চিৎকার ও আর্তনাদ শোনে, তখন মসজিদের জানালা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করে। তখন তাদেরকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। এটা চাক্ষুষ সাক্ষ্য বাণী। এটাই ছিলো সর্বপ্রথম নির্বিচার হত্যা। এই ঘটনায় ৪০জন মুসলমান শহীদ হন।

সিদি-হামেদ গণহত্যা

❝সিদি-হামেদ শহরের গণহত্যা যখন সংঘটিত হয়, তখন আমি কাছাকাছি একটি পাহাড়ে ছিলাম। পরের দিন সকালে যখন উঠি, তখন মানুষের লাশ ছড়ানো-ছিটানো ছিলো। হত্যাকাণ্ড চলাকালে রাতে কিছু টের পাওয়া যায় নি। কারণ, তারা গুলি চালিয়ে নয় বরং অধিকাংশ হত্যায় চাকু ও কুড়াল ব্যবহার করে। বিশেষ করে ওপনাল নামক এক ধরনের ফরাসি চাকু তারা ব্যবহার করেছিলো। ❞

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া

❝গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ লোক নিহত হয় হত্যাকাণ্ডে। GIA-এর সদস্যরা গাড়ি থামিয়ে পাঁচ কি ছয়জন অধিবাসীকে সেখানেই হত্যা করে দিতো। সিদি-হামেদ শহরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পরের দিন এটা আরম্ভ হয়। তারা গ্রামের লোকদের পরিসংখ্যান বের করে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আনুমানিক ১৫জন সদস্য নামত এবং ঘরে থাকা নারী-শিশুসহ ২০০জন বেসামরিক লোক রাতের ভেতরেই হত্যা করে ফেলতো। হত্যা করে তাদের স্বর্ণ ও অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতো। এমনকি এক পর্যায়ে তারা মেয়েদেরকে পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এতটা ভয়ানক অপরাধে তারা মেতে উঠে, যা বিশ্বাস করা কঠিন।

এর জবাবে গ্রামবাসী পাহারা দিতে আরম্ভ করে। তারা বড়ো সার্চলাইট ব্যবহার করতে শুরু করে। এরপর তারা সরকারের কাছে অস্ত্র দাবি করে এবং অস্ত্র পেয়েও যায়। ”

মুজাহিদদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া

“১৯৯৭ সালটা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের ভয়ানক একটা বছর ছিলো। আমি সমঝদার ইবাদতগুজার অনেক সঙ্গীকে দেখেছি, এসব দেখে তারা সহ্য করতে পারছিলো না। ফলে নিজেদেরকে সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছিলো। আমরা মানুষকে নিজেদের চেহারা দেখাতে পারতাম না তখন। আমাদেরকে দেখলেই লোকেরা বলে উঠতো, এই দাড়িওয়ালা লোকদের কাজই তো এগুলো। অবস্থা এমন ছিলো যে, লোকদেরকে বোঝানোর উপায় ছিলো না, আমরা পথভ্রষ্ট গ্রুপের লোক নই। এ কারণে নিজেদের সামনে থেকে জনসাধারণকে পালিয়ে যেতে দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিলো না। গ্রামবাসীর পাহারার কারণে আমরাও রাতে চলাফেরা করতে পারতাম না। মুজাহিদীনের মাঝে ভালো মানুষ যারা ছিলেন, তাদেরও কিছু করার ছিলো না। কারণ সবার উপর থেকেই জনসাধারণের আস্থা উঠে যায়।

একটা ঘটনা বললে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। সে ঘটনায় আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিলো। আমরা আরবিয়ার যবারবার এলাকায় গুরাবা নামক এক ব্রিগেডের কাছে যাচ্ছিলাম। দু’দিন আমরা পায়ে হেঁটে চলি। আমাদের কাছে পানি ছিলো না। পিপাসায় আমরা কাতর ছিলাম। পথিমধ্যে এগারো বছরের একটি বাচ্চা দেখতে পাই। আমরা তাকে ডাক দিলে সে ছুটে পালিয়ে যায়। কারণ, সেখান দিয়ে দুষ্টু খারিজিগোষ্ঠির লোকেরাও আসা-যাওয়া করতো। আমরা আওয়াজ উঁচু করে বলি, একটু এদিকে আসো, কথা শুনে যাও। তখন এক বৃদ্ধা ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং শিশুদেরকে নিয়ে সেও পালিয়ে যায়। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কতো বড়ো ফারাক। একটা সময় ছিলো যখন লোকেরা এগিয়ে এসে মহব্বত সহকারে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো আর এখন আমাদেরকে দেখেই তারা পালিয়ে যায়।”

ইন্টেলিজেন্স নয় বরং GIA-এর লোকেরাই করেছে

❝আজকাল ইন্টারনেটে বসে অনেককে বলতে শোনা যায়, এসব জঘন্য কাজ সরকার করেছে, তাই মুসলমানদের দোষ আমাদের ঢেকে রাখা উচিত। না, কখনই তা হতে পারে না। এই সকল জঘন্য কাজ GIA-এর লোকেরাই করে। একথা ঠিক, সরকার ছোট আকারের গণহত্যা চালিয়েছে। কিন্তু সেগুলো করেছে মিডিয়াতে মুজাহিদরূপী কিছু মানুষকে দেখানোর জন্য, যারা জনসাধারণকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এভাবে জনসাধারণের মাঝে মুজাহিদীনের প্রতি ঘৃণা উস্কে দেয়া এবং তা বৃদ্ধি করাই ছিলো সরকারের লক্ষ্য। ❞

প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন এলাকা

❝এই গণহত্যা মধ্যাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে সংঘটিত হয়েছিলো। রাজধানী আলজিয়ার্স, ব্লিডা, মেডিয়া, বূ মারডেস—এই চারটি প্রদেশে বিশেষভাবে গণহত্যা সংঘটিত হয়। কিন্তু এই প্রদেশগুলোতেই রাষ্ট্রের প্রায় ৬০ থেকে ৭০শতাংশ জনগণের আবাস ছিলো। আর যেহেতু এসব ঘটনা পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে সংঘটিত হয়নি। এজন্য পরবর্তীতে জিহাদী আন্দোলন পূর্বাঞ্চল থেকেই জেগে উঠে।❞

GIA নিশ্চিহ্নের চূড়ান্ত কারণসমূহ

GIA ধ্বংস হবার সর্বশেষ কারণগুলো তাদের নিজেদের হাতেই রচিত হয়।

আহলে হক মুজাহিদীন এবং GIA-এর মধ্যকার যুদ্ধ

একদিকে GIA-এর পথভ্রষ্টতার কারণে জিহাদের শাইখগণ তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেন, যার দরুন শুধু বহিরাগত সাহায্যের পথই বন্ধ হয়নি, বরং তাদের কাছ থেকে আহলে হক ব্যক্তিবর্গ বের হয়ে তাদের বিরুদ্ধেই ফ্রন্ট তৈরি করছিলো। হকপন্থি অটল-অবিচল মুজাহিদীনের সঙ্গে চরমপন্থি লোকদের ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো এরই ধারাবাহিকতায়। পরিণতিতে GIA-এর কর্তৃত্ব কমে গিয়েছিলো এবং তাদের অনিষ্ট নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিলো।

জনসাধারণের সঙ্গে GIA-এর যুদ্ধ

অপরদিকে GIA-এর জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম এবং ভয়াবহ গণহত্যার কারণে জনসাধারণ শুধু তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা দেয়ার পথ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারাও GIA-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফ্রন্ট রচনা করে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। সরকার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্র দেয় এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করতে থাকে। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার ঘটে। ইন্টেলিজেন্সের কিছু কমান্ডো গ্রুপের মাধ্যমে সীমিত আকারে GIA-এর মতোই কিছু গণহত্যা সংঘটিত করে সরকার। সেগুলোর দায় GIA-এর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পার্থক্য এই ছিলো যে, এমন নাটকীয় গণহত্যার জন্য সরকার জনসাধারণের পরিবর্তে মুজাহিদীনের সাহায্য সহায়তাকারী বিশেষ জনগোষ্ঠীগুলোকে টার্গেট করতো। এভাবেই জনসাধারণের সঙ্গে GIA-এর যুদ্ধ তুমুল পর্যায়ে চলে যায়।

সরকারের সঙ্গে GIA-এর যুদ্ধ

তৃতীয় দিকে মুরতাদ বাহিনী GIA-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে এবং তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে এতটাই কোণঠাসা করে যে, লড়াইয়ের পরিবর্তে GIA-এর লোকেরা রুটি-পানি সংগ্রহের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ তারা জনসাধারণের সহায়তা তো অনেক আগেই হারায়। অথচ এরা সেই জনগণ ছিলো, যারা শুরুতে মুজাহিদীনকে এতটা সাহায্য করেছিলো যে, নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করা নিয়ে তাদের (মুজাহিদীনের) কোনো চিন্তাই করতে হতো না।

GIA-এর দুই পক্ষের মাঝে সংঘর্ষ

আর যখন GIA-এর বাহিরের বিভিন্ন শক্তির পক্ষ থেকে উপর্যপুরি আক্রমণ চলছিলো, সে অবস্থায় খোদ GIA-এর অভ্যন্তরে কিছু গ্রুপ শুদ্ধি অভিযান পরিচালনার অজুহাতে নিজেদের দলেরই বিভিন্ন বিশ্বস্ত গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদীনকে সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এমনকি তাদের অবস্থা এমন চরমে পৌঁছায়, তারা প্রত্যেক সদস্য অপরজনকে সন্দেহ করতো এবং তার হাতে নিহত হওয়ার ভয় করতো। আর এ কারণেই আগেভাগে নিজের সঙ্গীকে হত্যার ফন্দি আঁটতো। এভাবেই তাদের মাঝে বড়ো আকারে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে

যায়। মূলত GIA-এর ধ্বংস হওয়ার চূড়ান্ত কার্যকারণ এভাবে তাদের নিজেদের হাতেই তৈরি হয়।

GIA-এর পরিসমাপ্তি (ফেব্রুয়ারি ২০০২ সাল)

সর্বশেষ কিছু ব্যাটালিয়ন

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

❝GIA-এর দলান্ধ যোদ্ধারা নিজেদের পথভ্রষ্টতা বিভ্রান্তি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগকারীদের প্রতি শত্রুতার মনোভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাদের মধ্যকার অনেককে তাগুতগোষ্ঠী হত্যা করে, অনেককে গ্রেফতার করা হয়, কেউ কেউ নিজেরাই মুরতাদ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ তাদের সঙ্গত্যাগীদের হাতে মারা পড়ে। অনেককে তাদের জামাআতই অঙ্গ-বিকৃত করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত ব্যাটালিয়নের সৈন্যদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করার অভিযোগ ছিলো।

ব্লিবা'র জিবালুশ শরীয়া'য় জামাআতের একান্ত নিজস্ব ব্যাটেলিয়ন, যা খাদরা ব্যাটালিয়ন নামে পরিচিত ছিলো। মেডিয়া প্রদেশের ওযারা এলাকার আস-সুন্নাহ ব্যাটালিয়ন, বারবাকিয়া এলাকায় আল মুয়াহ্হিদুন ব্রিগেড, কসর এল বুখারীর খাদরা ব্যাটালিয়নের একাংশ, এমনিভাবে জেলফা প্রদেশের আল-ফাতাহ ব্রিগেড, টিয়ারেট প্রদেশের আর-রহমান ব্রিগেড এবং আল-ইন্তিকাম ব্রিগেড। চেফ প্রদেশের আন-নাসর ব্রিগেড এবং বেল আব্বেসের আস-সুন্নাহ ব্রিগেড।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবির কারণে মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে GIA-এর লড়াকু সৈনিকদের সংখ্যা দিনদিন কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২০০১সালে তাদের মাত্র ৬০জন সৈনিক অবশিষ্ট থাকে। তাদের বলয় সংকুচিত হতে থাকে এবং শুধু চারটি ব্যাটালিয়নের মাঝে অস্তিত্ব সীমিত হয়ে যায়। সেই চার ব্যাটালিয়ন হচ্ছে—

চেফ প্রদেশের আন্ন-নাসর, তিয়ারেত প্রদেশের আল-ইন্তিক্বাম, জেলফায় আল-ফাতহ এবং ব্লিডার আল-খাদরা। এই বিষয়টি আমি GIA-এর নেতৃবৃন্দের একজনের কাছ থেকে জানতে পারি। যাকে আমরা ২০০১সালের জুলাই মাসে এন্ডফলা প্রদেশে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করি।

GIA-এর সর্বশেষ আমীর সালেহ্ আবু ইয়াসিন আশ-শিলফী'র বক্তব্য অনুযায়ী ২০০৫সালে তাদের সদস্য সংখ্যা কমে গিয়ে ৩০-এ এসে দাঁড়ায়। এরপর ২০০৮-সালের শরৎকালে ব্লিডা'র জিবালুশ শরীয়া'য় মাত্র ৭জন সদস্য অবশিষ্ট থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে তওবা করে তানযীমু কায়েদাতুল জিহাদ বি বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী'র সঙ্গে যুক্ত হয়। ❞

এভাবেই ক্রমাগত GIA-এর পথভ্রষ্ট সৈনিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যায় এবং নিজেদের এলাকাতেই তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ এক সময় তাদের এলাকাগুলো পুরো আলজেরিয়াতে মুজাহিদীনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিলো।

তল্পিবাহকদের পরিণতি

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

❝চতুর্থ অঞ্চলের কট্টরপন্থি আমীর আব্দুর রহীম কাদা ইবনে শাহিয়া যখন GIA থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন যাইতুনী নিজের সহযোগীদের মধ্য থেকে আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বূ কাবূসকে চতুর্থ অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করে। আর তখন আবু আদলান রাবীহকে সামরিক উপদেষ্টার পদ দেয়। এই দুজন যাইতুনীর চাটুকারদের শীর্ষে ছিলো। উভয়ই ১৯৯৫সালের বসন্তের মৌসুমে চতুর্থ অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে টিয়ারেট প্রদেশের পশ্চিমে এবং ভেরান্ডা'র জেলাগুলো দিয়ে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি ফটক অতিক্রম করছিলো। তখন সেনাবাহিনী গাড়িতেই তাদেরকে হত্যা করে।

নিষ্ঠুর ও নির্দয় আবু ইয়াকুব আল-আসেমী আস্সফ্ফাহ। আনতার যাওয়াবেরী'র সময়ে সে সামরিক উপদেষ্টা ছিলো। আলজেরিয়ার জনসাধারণকে গণহত্যার নির্দেশনা পালনে সর্বপ্রথম সেই বাস্তবায়নে মাঠে নামে। গিলজানের প্রসিদ্ধ ও ভয়ানক গণহত্যার নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনা-কর্তৃত্বে ছিলো সে। সে ঘটনায় হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হয়। তেমনিভাবে রাজধানী আলজিয়ার্সে 'বেনতালহা' গণহত্যারও নেতৃত্বে ছিলো সে। এ ঘটনায়ও কয়েকডজন নারী-শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হয়। এছাড়াও GIA-এর প্রতি অনুগত ব্যাটালিয়নগুলোর কয়েক ডজন মুজাহিদকে বিভিন্ন অপবাদে হত্যা করায়। এই কসাইকে শেষ পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যার অভিযোগে খোদ আনতার যাওয়াবেরী'র নির্দেশে হত্যা করা হয়।

আবু বাসীর রেজোয়ান মাকাদোর আল-আসেমী। GIA-এর মিডিয়া বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলো। আনতার মেডিয়া প্রদেশের মক্রোনোর ক্ষুদ্র বাহিনীর ওখানে তাকে যেতে বলে। এদিকে বাহিনীর আমীর আবুল হুমাম বূ কারাকে পত্র মারফত বলে দেয়, পৌঁছা মাত্রই তাকে যেন হত্যা করা হয়। আবুল হুমাম নির্দেশ মতো কাজ সম্পন্ন করে। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতকারী মুজাহিদীন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে।

আবূ সুহাইব আল-আসেমী। GIA-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রধান এবং সাংগঠনিক মুখপাত্র ছিলো। তৃতীয় এবং চতুর্থ অঞ্চলের অধিকাংশ কার্যক্রম তার দ্বারা পরিচালিত হতো। মাদরাসাতুশ শরীয়াহ[৫৪]'র ছাত্রদের একজন ছিলো সে। GIA-এর মুজাহিদীনকে হত্যায় তার বিরাট ভূমিকা ছিলো। তৃতীয় অঞ্চলের আমীর চেফ প্রদেশের টানস শহরের আবুল হুমামকে সেই হত্যা করে। আবুল হুমাম আবূ সুহাইবের পক্ষ থেকে দায়িত্ব অব্যাহতির নির্দেশ অস্বীকারের কারণে এভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। তাকেও আন্তার মুজাহিদদেরকে হত্যা করা, বিভিন্ন মুজাহিদ পরিবারকে হেনস্তা করে তাদেরকে খাবার না দেয়ার অভিযোগে হত্যা করে। তার পরিণতির ব্যাপারেও আমাদের কাছে তওবা করে আসা মুজাহিদ ভাইয়েরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

আবূ হুরায়রা আল-আসেমী আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং মুজাহিদদের ব্যাপারে কঠোরতা কারীদের একজন ছিলো। নিজের বায়বীয় ফাতওয়ার কারণে সে প্রসিদ্ধ ছিলো। সে সামরিক গ্রুপ ও ব্যাটালিয়নগুলোতে খুবই ঘোরাঘুরি করতো। আন্তার তাকে জেল্ফার আলফাতহ'র কাছে পাঠায় আর সে ওখানে গিয়ে কতক মুজাহিদকে হত্যা করে। ফিরে আসার পর তার ব্যাপারে অভিযোগ আসে তখন আন্তার তাকে নিজ হাতে মাথায় কুড়ালের আঘাত দিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারেও তওবাকারী মুজাহিদীন সাক্ষ্য দিয়েছে।

মুসআব বূ ক্কারাহ, প্রথম অঞ্চলের আমীর ছিলো। আনতারের সঙ্গে মিলে ব্লিডা ও রাজধানী আলজিয়ার্সে কয়েকটা গণহত্যায় সক্রিয় ছিলো। যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই আবেগ উদ্দীপ্ত ছিলো এবং মুজাহিদদের প্রতি খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করতো। ব্লিডা প্রদেশের মাতীজা এলাকার মাঠে সেনাবাহিনীর এক কনভয়ের উপর হামলা

[৫৪] সম্ভবত এটা GIA-এর নিজস্ব মাদরাসা ছিলো।

করার পর তার পিছু নেয়া হয় এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়।

সুরাকা বূ কারা, আন্তারের সময়ে মুসআবের পর প্রথম অঞ্চলের আমীর হয়েছিলো। নামদার চরিত্রহীন লোক ছিলো এবং মুজাহিদদেরকে হত্যা করে গর্ব করতো। মুজাহিদ হত্যাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির উত্তম মাধ্যম মনে করতো। তওবা করে আসা মুজাহিদরা বলেছে, আবু মালেক আল-বুলাইদী'র সঙ্গে সুরাকাকে কথা বলতে শুনেছিলো। আবু মালেক সুরাকাকে বলে, সে ২৫জন মুজাহিদকে হত্যা করেছে। তখন তার জবাবে সুরাকা গর্ব করে বলে, আমি তো সংক্ষিপ্ত সময়ে ৪৫জন মুজাহিদকে হত্যা করেছি। সে ব্লিডা প্রদেশ ও রাজধানী আলজিয়ার্সে জনসাধারণের ওপর পরিচালিত গণহত্যায় অংশগ্রহণ করে। অবশেষে আন্তারের নির্দেশে জিহাদে বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে তাকেও হত্যা করা হয়।

আবু জামাল সাঈদ আল-বুলাইদী। GIA-এর শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক এবং হিসাব সংরক্ষক ছিলো। ব্যাটালিয়ন ও সামরিক গ্রুপগুলোতে খুব ঘোরাঘুরি করতো এবং বায়বীয় ফাতওয়া দিতো। হিজরাহ ও তাকফীরের মানহাজ নিয়ে প্রকাশ্যে গর্ব করতো। মিথ্যা অভিযোগ, চোগলখুরী ইত্যাদি কাজে তার ছিলো বিশেষ আগ্রহ। আন্তারের নির্দেশে তাকে সম্পদের স্তূপ চুরি করা এবং অধিক পরিমাণে ফাতওয়া দেয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়।

আব্দুন নূর, আশ-শরীয়াহ এলাকায় জামাআতের নিজস্ব ব্যাটালিয়ন আল-খাদরার আমীর ছিলো। সে নিজেও মুজাহিদদেরকে হত্যা করতো, আর এই অভিযোগে তৃতীয় অঞ্চলে গমনকালে তারই সঙ্গী-সাথিরা GIA-এর প্রতিনিধি হয়ে তাকে হত্যা করে।

ফরীদ আল-বুলাইদী এবং মুসা আল-বুলাইদী উভয়ই জামাআতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং উভয়কেই মুরতাদগোষ্ঠী হত্যা করে। এদিকে আব্দুর রহীম আল-বুলাইদী আনতারের অনুপস্থিতিতে যে নির্বাহী প্রধান হতো এবং তাকেও মুরতাদগোষ্ঠী হত্যা করে। ”

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আরও এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। তার নাম আব্দুর রাযযাক আল-বারা। শাইখ লিখেছেন—

“GIA-এর নিজস্ব ব্যাটালিয়ন খাদরাতে আব্দুর রাযযাক আল-বারা নামে একজন ছিলো। পরবর্তীতে সে চাদে জার্মান পর্যটকের সঙ্গে আটক হয়। সে দেখতে ছিলো বিরাট লম্বা, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি একটা চড়ুইয়ের চেয়ে বেশি ছিলো না। সেনাবাহিনীর প্যারাসুটার সদস্যদের একজন ছিলো সে। তার বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন তার পেট নিয়ে ছিলো। আমার সামনে একবার বিশটা মালটা দিব্যি গোগ্রাসে গিলে ফেলে। তার সঙ্গী-সাথিরা বলতো, এভাবেই সে তিনটা-চারটা মুরগি একবারেই অনায়াসে হজম করে ফেলতে পারতো। তাকে বিশেষ কাজের জন্য রাখা হয়। তাকে যে নির্দেশ দেয়া হতো, তাই সে পালন করতো। সে পাগল করা বাহাদুর ছিলো। পাগলাটে ক্ষ্যাপা গোছের ছিলো। শত্রুবাহিনীকে ফায়ার করে করে তাদের সামনে চলে যেতো। এমনকি ম্যাগাজিনে গুলি শেষ হয়ে গেলে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি ভরে নিতো এবং ফায়ারিং অব্যাহত রাখতো।

আনতার যাওয়াবেরীর সময়ে তার সকল বিভ্রান্তিতে তার অংশগ্রহণ ছিলো এবং কতক ভাইকে সে হত্যা করেছিলো। যখন GIA ভেঙ্গে যায়, তখন সে তা ছেড়ে বের হয়ে আলাদা গ্রুপ গঠন করে। সে গ্রুপ কারও অনুগত ছিলো না। তখন সে মরুভূমিতে জার্মান পর্যটনের কাজ করতো। চাদ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে লিবিয়ার সরকারের মধ্যস্থতায় আলজেরিয়ার কাছে সোপর্দ করে। আলজেরিয়ায় পাঠানোর পর তাকে কারাগারে রাখা হয়। একদিকে ছিল চরম মূর্খ, অপরদিকে ছিলো অত্যন্ত বীর বাহাদুর। ”

GIA-এর সর্বশেষ নেতৃবৃন্দ

২০০২সালের ফেব্রুয়ারির ৯তারিখে যাওয়াবেরী নিজের শহর বূফারেকে একজন সমন্বয়কের ঘরে অবস্থান করছিলো। তখন সিকিউরিটি ফোর্স দুই সঙ্গীসহ তাকে হত্যা করে। এরপরই GIA-এর যুদ্ধ উন্মাদনা নেতিয়ে পড়ে।

যাওয়াবেরী নিহত হওয়ার পর রশীদ আলী ওকলী ওরফে আবু তুরাবকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। এই লোক যাওয়াবেরী’র কাছের লোকদের একজন ছিলো। সে জামাআতের প্রসিদ্ধ শক্তিশালী ও মূলধারার ব্যাটালিয়ন কাতীবাতুল মাওতের প্রধান ছিলো। নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকদের অনুপস্থিতিতে GIA-এর নেতৃবৃন্দের সহকারী লোকদের কেউ কেউ তার নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কের জেরে তাকে হত্যা করে। তারা দাবি করে মুরতাদগোষ্ঠী তাকে হত্যা করেছে। GIA থেকে তওবা

করে চলে আসা আল-জামিয়াতুস-সালাফিয়ার কতক ভাই বলেন যে, আবু তুরাব রশীদের ইচ্ছা ছিলো, সে GIAকে পুনরায় বিশুদ্ধধারায় নিয়ে আসবে এবং আল-জামাআতুল সালাফিয়া'র সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবে। এরই ভিত্তিতে তার সহযোগীদের মাঝে কেউ কেউ মুরতাদ হওয়ার অপবাদ আরোপ করে তাকে হত্যা করে।

তারপর বুদিয়াফী নূরুদ্দীন ওরফে আবু ওসমান হাকিম আরপিজি ২০০৪সালে আমীর নিযুক্ত হয়। ব্লিডা প্রদেশের বূফারেক শহর থেকে সে এসেছিলো। GIA-এর সিভিল অপারেশনের আমীর ছিলো সে। তাওবাকারী মুজাহিদদের বর্ণনা অনুযায়ী-সে খুব বড় যোদ্ধা এবং তাগুতগোষ্ঠীর প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমীরের ভালো-মন্দ সব নির্দেশের অনুগত ছিলো সে। নিজেই বলতো, আমাকে যে নির্দেশ দেয়া হবে, আমি তা পালন করবো। এতে কোনো গুনাহ হলে তা আমীরের হবে। ২০০৫সালের নভেম্বরে সে গ্রেপ্তার হয় এবং ২০০৭সালে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হয়।

তারপর শাবান ইউনুস ওরফে ইলিয়াস আমীর নিযুক্ত হয়। সে ২০০৫সালের ডিসেম্বরে সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে নিহত হয়। শাইখ আসিম আবু হাইয়ান বলেছেন যে, সর্বশেষ আমীর ছিলো সালেহ্ আবু ইয়াসিন আশ-শেলফী নামক এক ব্যক্তি, যার সঙ্গে ২০০৫সালে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

যাহোক, এভাবেই ফিতনা সৃষ্টিকারীদের মাঝে দলাদলি ও গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। কেউ কেউ নিজেদের লোকদের হাতেই নিহত হয়, আবার কেউ কেউ শত্রুদের হাতে। শেষ পর্যন্ত GIA-এর ঘটনার পরিসমাপ্তি সেভাবেই ঘটে, যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে অন্যসব খারিজীগোষ্ঠীর উপসংহার রচিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত! খারিজী মতবাদ একটি ভ্রান্ত চিন্তাধারার নাম। যেকোনো মস্তিষ্কে যে কারও মাঝে এটা আসন গেড়ে বসতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গ্রুপ শরীয়তের আলোকে নিজের সদস্যদেরকে দীক্ষিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মতবাদের ভয়াবহতা ও ঝুঁকি থেকে সেই জামাআত নিরাপদ নয়।

বিক্ষিপ্ত *GIA*

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

❝আমি এ কথা বলবো না যে, GIA-এর বিলুপ্তি ঘটে গেছে। আমি বলবো তারা চারগ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম গ্রুপে রয়েছে GIA-এর নেতৃবৃন্দ, তাদের সহকারী ও সহযোগীগোষ্ঠী, তাদের সঙ্গে মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর কিছু ব্যাটালিয়ন। এরা সকলেই চরমপন্থার প্রতি অনুরাগী ছিলো। এই মতবাদকে তারা হক মনে করতো এবং এর কারণেই GIA-এর প্রতি তারা অনুগত ছিলো। GIA ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। অবশেষে তারা নিজেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গ্রুপে সেসব ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্ট ছিলো, যেগুলো GIA-এর নেতৃবৃন্দের অবস্থান থেকে অনেক দূরে ছিলো এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ছিলো অনবহিত। কারণ আলজেরিয়া একটি বড় দেশ। আর মুজাহিদীন তার প্রায় সব এলাকাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো। GIA-এর নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে এই গ্রুপের সন্দেহ ছিলো, কিন্তু যাচাই করতে না পারার কারণে তারা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে। অবশ্য জামাআতের প্রতি অনুগত থাকা সত্ত্বেও জামাআত ত্যাগকারী গ্রুপগুলোকে সঙ্গ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ তারা করেনি। আবার জামাআতের বিভ্রান্তিকর দিক-নির্দেশনা মেনে GIA-এর পক্ষেও তারা অস্ত্র ধরেনি। যেন দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে তারা জামাআতের বিরোধী ছিলো, কিন্তু সাংগঠনিকভাবে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তারা জামাআত ত্যাগ করেনি। কয়েক বছরপর যখন বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়ে যায়, তখন তারা জিহাদ সংশোধনকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

তৃতীয় গ্রুপে সেসব ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্ট ছিলো, যেগুলো জামাআতের কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিলো। জামাআতের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে তাদের স্থির বিশ্বাস ছিলো, আর এরই ভিত্তিতে তারা সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। এ গ্রুপ জামাআত থেকে পৃথক হয়ে সাংগঠনিকভাবেই জামাআতের নাম প্রত্যাখ্যান করে এবং পুরোপুরিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে। এই তৃতীয়ভাগের কোনো কোনো গ্রুপ খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াইও করে এবং কেউ কেউ খুনখারাপি থেকে বাঁচার জন্য লড়াই ছেড়ে দূরে চলে যায়। তারা পৃথক পৃথক গ্রুপ বানিয়ে জিহাদ অব্যাহত রাখে এবং আজও পর্যন্ত সুন্নতের উপর জিহাদের পথে তারা অবিচল রয়েছে।

চতুর্থ গ্রুপে রয়েছে সেসব ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্ট, যারা চরমপন্থায় লিপ্ত হয়নি এবং জামাআতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও ছিলো অবগত। আর এ কারণেই তারা জামাআত থেকে পৃথক পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু জামাআত ভেঙ্গে পড়ার এই নাজুক পরিস্থিতিতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। কঠোরতার সামনে তারা টিকতে না পারা, ভুল ফাতওয়া অনুসরণ এবং সালভেশন ফোর্সের চালবাজি ও প্রতারণার কারণে ১৯৯৯সালে তাগুতগোষ্ঠীর সামনে তারা অস্ত্রসমর্পণ করে।

এভাবেই সর্বকালের জন্য GIA ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সেই GIA, যা একসময় তাগুতগোষ্ঠীর তাগুতি শক্তিকে সত্যিকার অর্থে আঘাতকারী সর্ববৃহৎ শক্তিশালী দল ছিলো। GIA-এর মাঝে প্রায় ৮০টি ব্যাটালিয়ন এবং ৩৫হাজার মুজাহিদ ছিলো। তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পুরোপুরিভাবে মিলে যায়, যেখানে তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন—

هلك المتنطعون—অর্থাৎ “চরমপন্থিরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ মুজাহিদীন এবং গণতন্ত্রপন্থিদের প্রণোদনার ফলাফল

সরকারি ছলচাতুরী

আলজেরিয়ার জিহাদের প্রথমদিকে নেতারা জনসমর্থন লাভ করাকে মৌলিক বিষয়ের মতো গুরুত্ব দেয় এবং এই সমর্থনকে জিহাদ সফল হওয়ার জন্য জরুরীও মনে করে। শেষ পর্যন্ত শত্রুরাও তাদের সাফল্যের এই রহস্য উন্মোচন করে ফেলে। তারা জনসমর্থন নষ্ট করার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে তারই কিছু নিম্নরূপঃ

১. সরকার এমন আইন প্রণয়ন করে যার দরুন মুজাহিদদের সঙ্গে দূরতম সম্পর্ক রাখাকেও অপরাধ বিবেচনা করা হয়।

২. জিহাদের পথে অগ্রসর ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠা করে।

৩. ডেথ স্কোয়াড নামক ফোর্সগঠন করে। এই বাহিনীর কাজ ছিলো-মুজাহিদ হওয়া অথবা মুজাহিদীনকে সাহায্য করা নিয়ে যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হতো, রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে তাদেরকে নিয়ে গুপ্তহত্যা করা। পরবর্তীতে তাদের বিকৃত

লাশ পথে-ঘাটে, বিভিন্ন গলিতে তারা নিক্ষেপ করতো, যাতে লোকদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা মুজাহিদদের সঙ্গ না দেয়।

৪. অপরদিকে সরকারের দুর্বলতার সময়ে কালক্ষেপণের জন্য মুজাহিদ ও গ্রেপ্তার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার ভান করতো এবং উপযুক্ত সময়ে আলোচনা সফল না হওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ আরম্ভ করতো।

সরকারি ইন্টেলিজেন্সের ভূমিকা

অনেকেই বলে থাকে GIA চরমপন্থি হওয়ার পেছনে ইন্টেলিজেন্সের হাত রয়েছে, যারা জামাআতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জামাআতকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এমনকি এ কথা বলতেও শোনা যায়, জামাল যাইতুনী নিজেই ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট ছিলো। কিন্তু এগুলো কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। GIA-এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত সদস্যবৃন্দ যেমন-শাইখ আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ, শাইখ আবুল বারা আহমদসহ (আল জামা'আতুস-সালাফিয়া সংগঠনের শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক)অন্যান্য ভাইদের অবস্থান এমনই। এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব থেকে সংযত অবস্থানে তারাও রয়েছেন, যারা জামাআতের একেবারে কাছাকাছি সময় কাটান। তাদের মাঝে রয়েছে ব্রাদার আবুল হুমাম উকাশা(২০০৪সালে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। আলজেরীয় জিহাদের ইতিহাস নিয়ে তার বিভিন্ন অডিও প্রকাশিত হয়েছে) এবং ব্রাদার খালীদ আবুল আব্বাস প্রমুখ।

আসল ঘটনা হলো, GIA-এর মাঝে এমন পরিবেশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে চরমপন্থা পুরোপুরি খাপ খেয়েছিলো এবং এরই পরিণতিতে তারা ভয়ানক সব কর্মকাণ্ড ঘটায়।

আর ইন্টেলিজেন্ট সম্পৃক্ততার ষড়যন্ত্র তত্ত্ব চর্চার কারণ হলো, অনেকের পক্ষে এটা কল্পনা করা মুশকিল, জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্টরা কেমন করে এসব কাজ করতে পারে? আসলে তারা কট্টরপন্থি ও চরমপন্থি আন্দোলন সম্পর্কে ততটা অবগত নয়।

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ-এরও অবস্থান হলো, GIA-এর বিভ্রান্তির পেছনে ইন্টেলিজেন্সের হাত ছিলো না, যেমনটা অনেকেই মনে করে থাকেন। তিনি বলেন-

❝সাধারণ জনগণ ও নাগরিকদের ওপর যত খুন-খারাবি ও গণহত্যা পরিচালিত হয়, সেগুলো GIA-এর প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের হাতেই সংঘটিত হয়েছে। এসবের মাঝে এমন অনেকেই ছিলো, যারা পরবর্তীতে তওবা করে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়।

শুধু তাই নয়, GIA-এর সদস্যদের মানসিক অবস্থা এমন পর্যায়ে যায়, দলটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত সদস্যরা একে অপরকে হত্যা করার চিন্তা-ভাবনা লালন করতো।

এছাড়া জনসাধারণের ওপর এমন নৃশংস গণহত্যা পরিচালনা থেকেও তো অনুমান হয়, এসবে ইন্টেলিজেন্সের দূরতম সম্পর্ক হলেও ছিলো। কিন্তু আসলে এর পেছনে বাস্তব কোনো দলীল প্রমাণ নেই।

এজেন্সিগুলো ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৪সালের ভেতর মুজাহিদদের লেবাসে কিছু হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। যাতে জনসাধারণ মুজাহিদদের সঙ্গ না দেয়। কিন্তু এজেন্সিগুলোর এসমস্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার সাধারণ জনগণ ছিলো না বরং মুজাহিদদেরকে সাহায্যকারীরাই তাদের টার্গেট ছিলো।

আর গণহত্যার প্রশ্নে বলতে হয়, প্রতিটা ঘটনাই GIA-এর পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রাক্তন সদস্যরা সাক্ষ্য বহন করে, যারা নিজেরা সরাসরি সেই গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলো।

জিহাদ পরিত্যাগকারী পরাজিত মানসিকতার কাপুরুষ-ভীতু লোকদের কথা আমাদের শোনা উচিত নয়। তারা এখন বলতে চায়, ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং বড় বড় অপারেশনগুলো তাদের পরিকল্পনাতেই পরিচালিত হয়েছে। যেমন-এল ওয়েডের কিমার অপারেশন, তাজল্ট কারাগার, ল'মিরআউট, রাজধানী আলজিয়ার্সে পুলিশ হেডকোয়ার্টার অপারেশন, বেন তালহা, গিলজান প্রদেশের অপারেশনসহ এমনই আরও বিভিন্ন সফল সামরিক কার্যক্রম। ❞

‘নোংরা যুদ্ধ’ নামক গ্রন্থ

ইসলাম প্রিয় কিছু মানুষের ধারণা যে, এত ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ মুজাহিদরা নয় বরং ইসলামের দুশমন হুকুমতের দ্বারাই সম্ভবপর। আমরা বলবো-এটা একটা অবাস্তব

দাবি। সরকার থেকে বের হয়ে যাওয়া কিছু ধর্মহীন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থে সরকারের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এই কথাগুলো ছড়িয়েছিলো। এদের মধ্যে কয়েকজনের ইন্টারভিউ আলজেরিয়া টিভিতেও প্রচার করা হয়। যেগুলোকে শাইখ আবু মুসআব আস সূরী নিজের অভিমতকে জোরালো করার লক্ষ্যে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।

এমনিভাবে একজন সাবেক সামরিক অফিসার এ বিষয়ে 'নোংরা যুদ্ধ' নামে একটি বই রচনা করে। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এই বইয়ের ব্যাপারে বলেন-

"এই বইটি মূলত আলজেরিয়ান ইন্টেলিজেন্স থেকে সাসপেন্ড হওয়া এক অফিসারের লেখা। সে আলজেরিয়া সরকারের হাত থেকে পালিয়ে অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে এটি রচনা করে। আমার কাছে এই বইয়ের বেশিরভাগ তথ্যই অবাস্তব মনে হয়। আসলে এটা হলো-আল্লাহর পক্ষ থেকে তাগুতদের বিরুদ্ধে একটি কৌশল, আর মুসলিমদের জন্য রহমত। সে তার বইয়ে এটা প্রমাণ করতে জোরালো প্রয়াস চালায় যে, এ সকল ভয়াবহ গণহত্যা সরকার ও জেনারেলরদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর GIA-এর মাঝে তাদের ইন্টেলিজেন্সের সদস্যরা সক্রিয় ছিলো। এটা প্রমাণ করার জন্য সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তবতা এটা নয়। বরং তা বিলকুল মিথ্যার কারসাজি।"

আত্মসমর্পণের ফিতনা

একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি *(অক্টোবর ১৯৯৭ সাল)*

১৯৯৭সালের অক্টোবর মাসে সাবেক সরকার নির্বাচনের আয়োজন করে। নির্বাচনে সে দ্বিতীয়বার জয়লাভ করে। বিজয় লাভের পর সে সালভেশন ফ্রন্টের সদস্যদের সঙ্গে সহনীয় আচরণ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ড.আব্বাসী মাদানীকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ ঘরে নজরবন্দি করে রাখে।

অপরদিকে এই বছরই যাওয়াবেরী এলাকায় ভয়াবহ গণহত্যার পর জনসাধারণের আন্দোলনের মুখে সরকার ও মুজাহিদীন উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতির ধারাবাহিকতা শুরু করে। সে সময় সালভেশন ফোর্সের আমীর মাদানী মিরযাক ১৭ই অক্টোবর একটি ব্রিফিং দেয়। সেই ব্রিফিংয়ে সাময়িকভাবে একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়। এখানে সাময়িক শব্দটি শুধু জামাআর সাধারণ সদস্যদেরকে ধোঁকা দেয়ার

জন্যই ব্যবহার করা হয়। এরপরই আলী বিন হুজরের নেতৃত্বে কাতাইবুল আরবিয়া (আরবিয়া বিগ্রেড) এবং মুস্তফা কারতালীর নেতৃত্বে কাতাইবুল মিদয়াহসহ (মিদয়াহ বিগ্রেড) আরও কিছু জিহাদি জামাআত ও কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিত্বও এই যুদ্ধবিরতিতে যোগ দেয়।

মুজাহিদরা যাতে ব্যাপক আকারে আত্মসমর্পণ করে এজন্য সরকার তখন পাহাড়ি এলাকায় আশপাশে এমন সদস্যদের জন্য খানাপিনার সুব্যবস্থাসহ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের নিমিত্তে বড়ো বড়ো অট্টালিকা, বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্প ও সুসজ্জিত বাংলো নির্মাণ করে। একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ও আত্মসমর্পণের এই পরিস্থিতি দুই বছর থেকেও আরও অধিক সময় পর্যন্ত বিরাজমান ছিলো। অর্থাৎ ১৯৯৭সালের অক্টোবর থেকে ২০০০সালের জানুয়ারি সময়ের মাঝে সকল জিহাদী গ্রুপ ও তাদের সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের সব ধরনের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ'র জবানে আত্মসমর্পণের ঘটনাবলী

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আত্মসমর্পণের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"সমঝোতা পরিকল্পনার প্রাথমিক চিত্র এবং এ বিষয়ে মুজাহিদদের দ্বিধান্বিত মনোভাব আমি লক্ষ্য করি। যখন থেকে সালভেশন ফোর্স একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়, এবিষয়ে সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করে এবং দেশের সকল জিহাদী রেজিমেন্টগুলোকে এতে সাড়া দেয়ার আমন্ত্রণ জানায়, আর এলক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান চালাতে থাকে, বাস্তবেই তখনকার পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো।

একদিকে জিহাদী গ্রুপগুলো পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। অপরদিকে দেশজুড়ে গণহত্যার ভয়াবহ ঘটনাও সংঘটিত হচ্ছিলো। ফলে জনগণের মাঝে হতাশা এবং ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সালভেশন ফোর্সের উদ্যোগ এবং আমন্ত্রণের সামনে মুজাহিদীনের জন্য দুটো পথ-ই খোলা ছিলো- হয় তারা যুদ্ধবিরতি মেনে নিবে কিংবা তা প্রত্যাখ্যান করবে। "

যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি

“যারা যুদ্ধবিরতির পথ অবলম্বন করেছে, এবিষয়ে তাদের সামনে পৃথক পৃথক দু’টি দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো:

প্রথমটি হলো, সালভেশন ফোর্সের। এরাই প্রথমে স্বপ্রণোদিত হয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে এবং দেশব্যাপী সবাইকে এর দাওয়াত দেয়। তাদের কর্মকাণ্ডে এবং তাদের প্রতিনিধিরা যা বলেন;তা দ্বারা আমার কাছে যেটা সুস্পষ্ট হয়, তাহলো-এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই অস্পষ্ট ছিলো। যে কেউ এর মাধ্যমে এই উপসংহারে উপনীত হতে পারবে যে, সর্বোপরি এই ঘটনার মাধ্যমে তারা স্থায়ীভাবে জিহাদ থেকে সরে আসা এবং অনেক নিচে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করা-ই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। যদিও তারা কখনই এটা সুস্পষ্ট করে বলেনি।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রুপগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিলো যে, এটা হলো ‘শরয়ী হুদনাহ’ অর্থাৎ সাময়িক যুদ্ধবিরতি। যার বিস্তারিত বিধি-বিধান ফিকহের কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ আছে।

অন্য গ্রুপগুলোর সামনে ছিলো ফিকহে ইসলামীর যুদ্ধনীতি বিষয়ক সেই আলোচনা, যেখানের এক বর্ণনা মতে-পরিস্থিতি বিবেচনায় সাময়িকভাবে শত্রুর তথা মুরতাদদের সঙ্গেও যুদ্ধবিরতির অনুমতি রয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন বিবেচনায় তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যকার সংঘাত মিটিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে ইদাদ গ্রহণ করে আবারও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে। নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করে নবউদ্যমে আবারও ময়দানে নামবে। এছাড়াও বিভিন্ন নেকবাসনা তাদের চিন্তা-চেতনায় বিদ্যমান ছিলো। এই গ্রুপে ছিলো মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন রেজিমেন্ট। যাদেরকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং তাদের মাঝে আমি স্বয়ং অবস্থান করেছি। যেমন- কাতীবাতুল আরবিয়া, এবং কাতীবাতুয যাবারবার। ”

যুদ্ধবিরতিতে বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেন্টের কর্মপন্থা

“সেই সময়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থানরত লোকদের কাছে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ঠিক ও যথার্থ সংবাদ সুনিশ্চিতভাবে আমাদের জানা ছিলো না। কিন্তু আমরা দুর্বল সূত্রে সংবাদ পাই যে, পশ্চিমের কিছু রেজিমেন্ট

সালভেশন ফোর্সের যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়। তবে অধিকাংশ রেজিমেন্টের ব্যাপারে প্রবল ধারণা এবং প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করবে। বিশেষত পূর্ব এবং দক্ষিণের মরু এলাকার রেজিমেন্টগুলো। এ অঞ্চলের রেজিমেন্টগুলোর অধিকাংশ সদস্য কঠোর ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলো। কেন্দ্রীয় এলাকায় GIA-এর যে অপকর্ম চলছিলো, তা থেকে তারা অনেকাংশে সুরক্ষিত ছিলো। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চলের রেজিমেন্টগুলো পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলের ন্যায় তেমন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলো না।

এমনিভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর আরও কিছু রেজিমেন্ট যেমন-রাজধানী আলজিয়ার্স, বূ মারডেস, ব্লিডা, মেডিয়া, বুয়াইরিয়া প্রদেশগুলোতে যেসব রেজিমেন্ট বিদ্যমান ছিলো, তাদের মাঝে GIA-এর রেজিমেন্টগুলো ব্যতীত হাসান হাত্তাবের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অঞ্চল এবং রাজধানী আলজিয়ার্স অঞ্চলের কিছু গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যরা দ্বিতীয় পথেই হেঁটেছে। অর্থাৎ তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

উল্লিখিত রেজিমেন্টগুলো ছাড়াও এসব এলাকায় GIA বিরোধী আরও কিছু রেজিমেন্ট ছিলো, যাদের সদস্যরা GIA-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে এবং GIA-এর গণহত্যার কারণে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়। বিশেষ করে আরবিয়া ও বূকরাহ এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায়। আমি নিজে দেখেছি যে, আরবিয়া, যাবারবার, মেডিয়া, মিফতাহ ও শিরারবাহ এলাকার মুজাহিদরা এবং তাদের সমমনা অধিকাংশ রেজিমেন্টের মুজাহিদীন জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তারা আভ্যন্তরীণ কোন্দলের গুরুতর অসুবিধার মুখে বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় যে দৃষ্টিভঙ্গি তথা নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য সময় নেওয়া, এই উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। (অর্থাৎ তারা এটা ধারণা করে যে, এটা হলো-শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ সাময়িক যুদ্ধবিরতি, যাকে পরিভাষায় 'হুদনাহ' বলা হয়।)

আমি আরও দেখিযে, তাদের মধ্যে অনেক নেককার ও সুদৃঢ়প্রত্যয়ী মুজাহিদ ছিলো, যারা তাদের মধ্যকার সমস্যাবলী মীমাংসা করে জিহাদে ফিরে আসতে উদগ্রীব ছিলো এবং উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ('হুদনাহ') প্রত্যাখান করতে ইচ্ছুক ছিলো। কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি ছিলো খুবই দুঃখজনক এবং বিভিন্ন

রেজিমেন্ট আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে। পরস্পরের মাঝে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য আর অরাজকতা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, আত্মসমর্পণই যেন একমাত্র সমাধান হিসেবে সামনে ছিলো। এধরনের পরিস্থিতিতে নেককার এবং সুদৃঢ়প্রত্যয়ী মুজাহিদদের কিছুই করার ছিলো না।

তাদের হিম্মত হারিয়ে ফেলার এটাও একটা কারণ ছিলো যে, তারা ছিলো ত্রিমুখী শত্রু বেষ্টনিতে আবদ্ধ। তারা বলতো-সংখ্যায় আমরা এত স্বল্প! আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাগুত সরকার আমাদের সামনে, হিংস্র GIA আমাদের পিছনে, অপরদিকে হাসান হাত্তাব (দ্বিতীয় অঞ্চলের আমীর) তৃতীয় দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ভূমিকা পালন করছে। তার ব্যাপারেও আমরা নিরাপদ হতে পারি না। কারণ সে আমাদেরকে বিদআতী আখ্যা দেয়। আর তার অন্যায় কার্যকলাপের কারণে আমরা তার সঙ্গে যুক্তও হতে পারি না।

বিদআতী আখ্যা দেয়ার কারণ এই ছিলো যে, সাধারণ মুজাহিদীনের রেজিমেন্টগুলো আরবিয়া, যাবারবার, মেডিয়া এবং আশপাশের এলাকার রেজিমেন্টগুলোকে আল-জাযআরাহ'র মধ্যে গণ্য করতো। অথচ তাদের মাঝে অনেক ধরনের সদস্য বিদ্যমান ছিলো। সবার উপর ঢালাওভাবে আল-জাযআরাহ'র হুকুম আরোপ করাই ছিলো চরম বে-ইনসাফী। অপরদিকে যাদের উপর আল-জাযআরাহ'র অপবাদ দেয়া হতো, তারা হাসান খাত্তাব এবং তার দলকে GIA-এর নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করতো। আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে, এর পিছনে যৌক্তিক অনেক কারণও বিদ্যমান ছিলো!

যুদ্ধবিরতির সময় আমি আলজেরিয়া থেকে বের হই। পরে জানতে পারি যে, সেসব রেজিমেন্টের অধিকাংশরাই সাধারণ ক্ষমার ফাঁদে পা দিয়ে তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়। তদের মধ্যে অনেক নেককার, মুখলিস মুজাহিদদের ব্যাপারে আমি অবগত ছিলাম, কিন্তু বাস্তবতা হলো-তারা ছিলেন পরিস্থিতির শিকার। যার কারণে তারা নিরাশ হন এবং ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। ফলে তারা হতোদ্যম হয়েই এমনটা করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের দুআ-আল্লাহ যেন সেই ভাইদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে দেন এবং হিদায়াত দান করেন।

পাহাড়বেষ্টিত আলজেরিয়া সহিষ্ণুতার চারণভূমি

“আমরা আলজেরিয়ান ভাইদেরকে বলতাম, আল্লাহ তাআলা তো আপনাদেরকে চমৎকার একটি কাজের ক্ষেত্র দান করেছেন। চারদিক থেকে পাহাড়বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, দীর্ঘ মরুভূমি, সুরক্ষিত পরিবেশ সব মিলিয়ে আপনারা যদি চান যে, এখানে দশকের পর দশক কাজ করে যাবেন, তাহলে নির্বিঘ্নে করতে পারবেন। কেউ আপনাদের নাগাল পাবে না। এমনকি ন্যাটোজোট ইচ্ছা করলেও আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আমি তাদের সামনে কঙ্গোর কমিউনিষ্ট লিডার লরেন্ট কাবিলা’র (Laurent-Kabila)উদাহরণ তুলে ধরি। সে জায়ারের বন-জঙ্গলে ত্রিশ বছর কাটায়। ১৯৬৫তে জায়ারের (সাম্প্রতিক কঙ্গো) তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোবুতু সিসি সেকোর বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলো। এমনকি তখন লরেন্ট কাবিলার বন্ধু, প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট নেতা চে গুয়েভারাও এই জঙ্গলেই তার সঙ্গ দেয়। কিন্তু সিসি সেকোর ক্ষমতা যেহেতু অনেক মজবুত ছিলো, তাই তারা তার তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তারা সেই বন-জঙ্গলে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধৈর্যের সঙ্গে অবস্থান করেছিলো। এরপর ১৯৯৫সালে যখন সিসির হুকুমত দুর্নীতির উইপোকা দ্বারা অন্ত:সার শুন্য হয়ে যায়, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডিতে ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছিলো, ফলে সেখানে হুতু ও টুটসি উপজাতির মাঝে প্রচণ্ড লড়াই হয়। তখন কাবিলা দেখে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এটাই মোক্ষম সময়। তাই সে এই পরিস্থিতিকে দুর্দান্তরূপে কাজে লাগায়। এমনিভাবে সে এলাকায় যুদ্ধের ফলে শরণার্থী সমস্যার সুযোগ নিয়ে মানুষদেরকে ব্যাপকহারে তার দলে টানতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে বিপুল বিক্রমে সে জায়ারের উপর হামলা করে তা দখল করে নেয়, এমনকি সে দেশের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে!

এই কারণেই আমরা আমাদের ভাইদেরকে বলি, নিজেরা ধৈর্যধারণ করুন! অন্যদেরকে ধৈর্য ধরতে বলুন! কিন্তু আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, তাদের উপর পরাজয় প্রাবল্য লাভ করেছিলো। আর নৈরাশ্য ছেয়ে যায়। ”

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সরকারি ফাতওয়া

এসময় মুজাহিদদেরকে আত্মসমর্পণের উপর আগ্রহী করার জন্য আলজেরিয়ান সরকার একটি কৌশল অবলম্বন করলো। তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গনের বড়ো বড়ো একশতজনের অধিক উলামায়ে কিরামের স্বাক্ষর সম্বলিত ফাতওয়া পাহাড়ে

অবস্থানরত মুজাহিদদের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। আলজেরিয়ার সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার যোগে প্রত্যেক মুজাহিদের ঘাঁটিতে এই ফাতওয়া পৌঁছে দেয়। ফাতওয়ায় এসকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে বলেন যে, অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আলজেরিয়ান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা সকল মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব। এ ফাতওয়ায় স্বাক্ষরকারীদের মাঝে সর্বাগ্রে ছিলেন- সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ শাইখ, প্রধান মুফতি শাইখ বিন বায, শাইখ ইবনে উসাইমিন, জর্ডানে অবস্থানরত শাইখ আলবানী, কাতারে আশ্রয় নেয়া ইখওয়ানী শাইখ ইউসুফ আলকারযাভী প্রমুখ উলামাগণ। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ২০০০সনে শাইখ আলবানী জীবনের শেষ ফাতওয়া হিসেবে এই ফাতওয়ায় এই পর্যন্ত বলে ফেলেছেন যে-

“বর্তমান যুগের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তথা অস্ত্রধারণ করা মূলত সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ বা অস্ত্র ধারণ করার নামান্তর। ”(নাউযু বিল্লাহ)।

এমনকি ঐ সময়ের মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ দাঈ মুহাম্মদ হাসসান ও আয়েজ আলকরনী আলজেরিয়ায় বেশ কয়েকবার সফর করেন এবং জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে থাকতে ও মুজাহিদদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার উপর বেশ কিছু দরস প্রদান ও তারবিয়াতী মজলিসের আয়োজন অব্যাহত রাখেন।

লাঞ্ছনাকর আত্মসমর্পণ; সমাজবান্ধব আইন (জানুয়ারি ২০০০ সাল)

১৯৯৯সালে ইয়ামিন যারবাল ইস্তফা দেয় এবং আব্দুল আযীয বুতফ্লিকা নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বুতফ্লিকা একসময় সামরিক অফিসার ছিলেন এবং আলজেরিয়ান প্রথম প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন এর আমলে মন্ত্রিত্বও লাভ করেন। সে নিজেও ছিল ধর্মবিদ্বেষী ও ফ্রান্সোফোনি ছিলো। কিন্তু বুমেদীন এর বিপরীতে কিছুটা ডানপন্থি ছিলো। তবে সে ছিল ঝানু ও প্রাজ্ঞ রাজনিতীবিদ। তার পলিসি ছিলো জনগণের সঙ্গে কোমল আচরণ দিয়ে তাদেরকে কনভার্ট করা। সে ক্ষমতায় বসেই সালভেশন ফোর্স এবং সালভেশন ফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে হাতিয়ার ফেলে দিতে উৎসাহ যোগায়। এই পলিসিতে সে আলজেরিয়ান সিভিল কনকর্ড রেফারেন্ডাম বা আলজেরিয়ার সমাজ বান্ধব আইনের আওতায় ১৩ই জানুয়ারি ২০০০সনে মুজাহিদদেরকে পাহাড় থেকে নেমে আসার আহ্বান জানায়।

মাদানী মিরযাক এই আইনের উপর স্বাক্ষর করে লাঞ্ছনাপূর্ণ পদ্ধতিতে আত্মসমর্পনে রাজী হয়ে যায়। এতে করে সে তার সিপাহিদেরকে বিনামূল্যেই বিক্রি করে দেয়। এমন জেনারেলদের হাতে;যারা দীর্ঘসময় যাবত তাদের দেশ-জাতি ও পরিবার-পরিজনের উপর জুলুম করে আসছিলো। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়িমের পথে বাধা হয়ে যুদ্ধ করছিলো। তাছাড়া ফ্রান্সবাদী তাগুত জেনারেলদের সামনে সে বড় লজ্জাজনকভাবে অস্ত্র রেখে দিয়ে তাওবার ঘোষণা দিয়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে ২, ০০০এরও বেশি যোদ্ধা (মুজাহিদগণ) ইজ্জত ও সম্মানের সমুন্নত চূড়া থেকে লাঞ্ছনার উপত্যকায় নেমে আসেন।

যদিও সাধারণ ক্ষমা ও আত্মসমর্পণের ধারাবাহিকতা অনেক আগেই শুরু হয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট আব্দুল আযীযের সরকার ২০০৫সনে চার্টার ফর পিস এন্ড ন্যাশনাল রিকাউন্সিল্যাশন নামে এক এ্যাক্ট জারী করে। এই এ্যাক্টের অধীনে সাধারণ ক্ষমার বিষয়টিকে রিফারেন্ডাম করে এই আত্মসমর্পণকে একটি আইনী রূপ দান করে।

আফরিনার খারিজীদের পরিসমাপ্তি

আলজেরিয়ায় জিহাদের দুর্নাম করা, ব্যাপক হত্যা লুটতরাজকারী নাপাক হাতটি ছিল খারিজীদের হাত। তাদের নগ্ন কর্মকাণ্ডের ঠিক ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ যিনি তুলে ধরেছেন তিনি হলেন, শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ। তিনি বলেন-

“আফরিনার খারিজী গ্রুপের পরিসমাপ্তি এভাবে হয় যে, তারা শেষদিকে এসে সালভেশন ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ২০০০সনে সরকারের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনে পাহাড় থেকে নেমে তাগুতি বাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করে বসে। তখন এ বিষয়ে তাদের দলীল ছিলো, তাগুতরা হলো আসলী কাফির। আর আসলী কাফিরের সঙ্গে তো আলোচনা ও সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হতে পারে। ”

ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টির পরিণতি

ভ্যাটিক্যান কনফারেন্স (১৯৯৫ সাল)

১৯৯৪সনে যখন তৎকালীন আলজেরিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়ামিন যারবালের সঙ্গে আলোচনা চলছিলো, তখন সালভেশন ফ্রন্টের কিছু নেতা আলজেরিয়া থেকে পালাতে সক্ষম হন। তারা পূর্ব থেকেই বাহিরে পলাতক থাকা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

মিলিত হয়ে রোমে বহুদলীয় একটি কনফারেন্সের আহ্বান করেন। এই কনফারেন্স থেকে আলজেরিয়ায় যুদ্ধরত উভয়পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করে রাজনীতিক এবং গণতান্ত্রিকভাবে সমঝোতায় আসার প্রস্তাব পেশ করা হয়। সালভেশন ফ্রন্টের বহিরাগত নেতৃত্বের প্রধান রাবেহ কাবীর, ইখওয়ানের আলজেরিয়ান শাখা এবং আন্তর্জার্তিক শাখার নেতৃবৃন্দ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক লিবারেল ও ধর্মনিরপেক্ষ সকল দল ও মতের অনেকেই এই প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করে। এমনকি খ্রিষ্টজগতের পবিত্রভূমি ভ্যাটিক্যান সিটি এই কনফারেন্সকে একটি সার্থক ও কল্যাণকর উদ্যোগ হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু শুরু থেকেই আলজেরিয়ান সামরিক তাগুতি শাসনের পৃষ্ঠপোষক খ্রিষ্টজগতের এক সেক্যুলার রাষ্ট্র ফ্রান্স এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। নিজেদেরকে মুসলিম দাবিকারী এই নেতাদের চরম লাঞ্ছনাকর পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও স্যেকুলারিজমের ব্যানারে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মতের স্বাধীনতা শ্লোগানদারীরা নিজেদের গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে গিয়েও এই নগ্ন আচরণ করতে থাকে। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, স্যেকুলারিজমে সবধর্মের জায়গা থাকলেও ইসলামের জন্য সেখানে কোনো জায়গা একেবারেই নেই।

সালভেশন ইসলামিক ফ্রন্টের পরিণতি (২০০৩ সাল)

১৯৯১সালের মে মাসে শাইখ আলী বালহাজ এবং ড.আব্বাসী মাদানীকে হরতাল চলাকালীন গ্রেফতার করা হয়। এবং ১৯৯২সালে প্রেসিডেন্ট বৌদিয়াফের হত্যার পর উভয় নেতাকে তের বছরের কারাদণ্ডাদেশ শুনানো হয়। তের বছরের নির্জন কারাজীবন শেষ করার পর ২০০৩সালে শাইখ আলী বালহাজকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দিয়েই সরকার তাকে তার রাজনীতিক তৎপরতা সীমিত করা যায় মর্মে কিছু শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। বর্তমানে তিনি রাজধানীর কাবাত নামক এলাকার একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ 'মসজিদুল ওয়াফা বিল আহদ' এ কিছু দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এরপরও বেশ কয়েকবার তিনি সরকারের অনেক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন এবং কয়েকবার গ্রেফতারও হন। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার অনুমতি তাদের ছিলো না। বরং তার দলের উপর বেশ কিছু সরকারি বিধি-নিষেধ জারী ছিলো।

অপরদিকে ড.আব্বাসী মাদানীর ছয় বছর কারাজীবন কাটার পর ১৯৯৭সালের নির্বাচনের পরে প্রেসিডেন্ট যারবাল সালভেশন ফ্রন্টের ক্ষেত্রে সহনীয় অবস্থান গ্রহণ করার সুবাদে তাঁর সঙ্গে কোমল আচরণ শুরু করে। ফলে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ ঘরে নজরবন্দি করে রাখে। পরবর্তী সাত বছর জোরপূর্বক নজরবন্দি রাখার পর তের বছরের শাস্তি পূর্ণ হওয়ার কারণে তাঁকেও মুক্তি দেয়া হয়। এরপর ২০০৪সালে তিনি কাতার চলে যান। কাতারে থেকে তিনি সরকারের কাছে একটি রাজনীতিক প্রস্তাবনা পেশ করেন, কিন্তু সরকার সেটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না দিলে তিনি চুপ হয়ে যান।

আলজেরিয়ান সরকার সকল দলকে আপন অবস্থায় রাখলেও সালভেশন ফ্রন্টকে আজও পর্যন্ত অস্তিত্বহীন বানিয়ে রেখেছে।

১৩তম পরিচ্ছেদ: শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ এবং এ বিষয়ক অন্যান্য মাসায়েল নিয়ে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহিমাহুল্লাহর ফাতওয়া

তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম

আলজেরিয়ার জিহাদ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। যখন GIA-এর দলে গুমরাহী প্রকাশ পাওয়া শুরু হয়, তখন বিপরীতমুখী দু’টি চিত্র সামনে আসে।

একদিকে, হক্কানী উলামা ও মুজাহিদগণ GIA থেকে বারাআত ঘোষণা করে। তার অপকর্মের সমালোচনা করে;এটাই ছিল মূলত করণীয়।

অপরদিকে, দুঃখজনকভাবে ইসলামী বিশ্বের বহু উলামা দেশে দেশে মুসলিমদের উপর চেপে থাকা তাগুত সরকারদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হওয়াকেই ভুল বলে সিদ্ধান্ত দিলো। এদের মধ্যে কিছু তো ছিলেন সরকারি মৌলভী, দরবারী আলিম। কিন্তু কিছু মুখলিস উলামাও বাস্তব চিত্র সম্পর্কে অনবগত থাকার কারণে দরবারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই মত গ্রহণ করে। পাশাপাশি যারা তাগুত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরে তাদের উপর বেশ কিছু অভিযোগ ও প্রশ্ন উত্থাপন করে। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ তাদের এসব প্রশ্ন ও অভিযোগের বিস্তারিত জবাব লিখেন। মুখলিস উলামাদের মধ্যে ছিলেন, সৌদি আরবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম শাইখ ইবনে উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ

নাসির আল-উমর। শাইখ নাসির আল-উমরের জবাবে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ ১৪২৫হিজরীতে ‘আনাল মুসলিম’ ফোরামে একটি মাকালা লিখেন। নাম দেন- ‘তাওজীহাত ফিল মাসআলাতিল জাযাইরিয়্যাহ ওয়া কাযিয়্যাতিল জিহাদ’

জিহাদের পক্ষে উলামায়ে কিরামের ফাতওয়া

মুজাহিদদের বিপক্ষে একটি প্রশ্ন এমন ছিলো, আচ্ছা কোনো আলিম আলজেরিয়ার জিহাদের পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন? এর জবাবে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন-

“শাইখ আহমদ সাহনুন(পূর্বে অনেক জায়গায় তাঁর আলোচনা করা হয়েছে)মুজাহিদদের সাপোর্ট করেছেন। মুরতাদরা অনেক চেষ্টা করেছে, বহু লাইনে তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করেছে মুজাহিদদের বিপক্ষে বলার জন্য, কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি মুজাহিদদের পক্ষেই বলে যান। এমনিভাবে শাইখ আলী বালহাজ জিহাদের সমর্থক ছিলেন। শাইখ মুহাম্মদ আস সাঈদ তো নিজেই জিহাদে শরীক হন। এমনিভাবে শাইখ ইয়াখলুফ শারাতী মুজাহিদদের সমর্থনে দেশব্যাপী ফাতওয়া জারী করেন। এই ফাতওয়ার কারণেই তিনি সারকাজী কারাগারে মুরতাদদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। ”

এমনিভাবে আনাল মুসলিম ফোরামে তার দ্বিতীয় মাকালা ‘সুয়ারুম মিন আরদ্বিল জিহাদ ফিল জাযাইর’ নামে ছাপা হয়েছে। এখানে তিনি লিখেন-

“মৌরতানিয়ার অনেক উলামার ব্যাপারে আমার জানা আছে যে, তারা ১৯৯৩-১৯৯৪সালের মাঝামাঝিতে আলজেরিয়ান ভাইদের জিহাদের স্বপক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন। আমি ইচ্ছা করলেই তাদের নাম নিতে পারি, কিন্তু এই জন্যই নিচ্ছি না যে,তারা এখনও জীবিত আছেন। নিরাপত্তার বিষয়টিও তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ”[৫৫]

এমনিভাবে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ’র ‘আমালে কামেলা’র মধ্যেও এ বিষয়ক বেশ কিছু মাকালা ছাপা হয়। সেখানে তিনি আলজেরিয়ার জিহাদের প্রতি

---

[৫৫] শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র আমালুল কামেলা'য় মৌরিতানিয়ার দু’জন বড় মাপের আলেম শাইখ বাদাহ ওলদ আলবূসীরী রহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ মুহাম্মদ সালিম ওলদ আদুদ রহিমাহুল্লাহ'র ইন্তেকালে শোক বিবৃতি রয়েছে। শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ সেখানে এই উভয় আলিমের ব্যাপারে লিখেছেন, তারা আলজেরিয়ায় জিহাদের সমর্থক ও সহায়তাকারী ছিলেন। এই বিবৃতি ১৪৩০ হিজরীতে লেখা হয়েছে। [পৃষ্ঠাঃ ১১৮০]

সমর্থন, এর আবশ্যকীয়তা এবং এর বিরোধিতার ক্ষতিসমূহ নিয়ে যথেষ্ট তথা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুরতাদ সরকার প্রধানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির বিধান

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“আলজেরিয়ান প্রশাসনের পক্ষ থেকে পেশকৃত জাতীয় সন্ধিচুক্তির আহ্বান মূলত কাফির শক্তির একটি কূটচাল। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের সমস্যাগুলো (অচলাবস্থা) কাটিয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর একযোগে হামলা করে জিহাদের পরিসমাপ্তি ঘটাতেই প্রয়াসী। এজাতীয় সন্ধিচুক্তিতে সরকারের হাতই প্রভাবশালী থাকে। তাই শরীয়ত কিংবা যুক্তি কোনো দিক থেকেই এজাতীয় সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করা কিংবা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা জায়েয নয়। আমার মতে, কোনো ঈমানদার এতে সন্দেহ করতে পারে না। তবে মুনাফিক কিংবা শরীয়তের ব্যাপার গণ্ডমূর্খরাই এবিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবে। তবে নিঃসন্দেহে হুকুম এটাই। অর্থাৎ এ জাতীয় সন্ধিচুক্তি জায়েয নেই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুরতাদ সরকারের এই জঘন্য পরিকল্পনা তাঁরাই মেনে নেয়;যাঁরা দ্বীনদারিতা, মুরতাদ বিরোধী জিহাদে অগ্রগামিতা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টির কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এর পিছনে কারণ ছিলো যে, তারা পরিস্থিতির সামনে হার মানে। তাদের মানসিকতায় বসে যায়, এখন আর কোনোভাবেই জিহাদে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। তাই সমূলে ধ্বংসের চেয়ে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়।

এখন কথা হলো, যে বা যারা বাস্তবেই অক্ষম হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় আত্মসমর্পণ ও সন্ধিচুক্তি একটি ইজতেহাদি মাসআলা হিসাবেই বহাল থাকে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তখন রুখসতের উপর আমল করা বৈধ হয়। কিন্তু বিষয় হলো, আসলেই কি তারা জিহাদ চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়েছিলো, না এটা তাদের শুধু ধারণা ছিলো মাত্র। কারণ বাস্তবেই অক্ষম হওয়া আর অক্ষমতার ধারণা দুটো ভিন্ন বিষয়, এবং এর হুকুমও ভিন্ন হবে। ”

মুরতাদের সামনে আত্মসমর্পণের হুকুম

“মূল মাসআলা হলো, পরাজিত এবং অক্ষম হওয়া ব্যতীত শত্রুর সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং গ্রেফতারীর শিকার হওয়া জায়ের নয়। তাই যার জিহাদ চালানোর সামর্থ্য আছে, তার জন্য জায়েয নেই যে, সে কাফিরের কথায় তার অধীনে চলে যাবে এবং নিজেকে তার হাতে সোপর্দ করবে এবং লাঞ্ছনার সম্মুখীন করবে। এ বিষয়ক দলীলের সংখ্যা এত বেশি পরিমাণ যে, তা গণনা করাই দুরুহ ব্যাপার।

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, কিতাল করবে, তাদেরকে হত্যা করবে, ধ্বংস করবে, অস্থির করে রাখবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে কাফিরদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তাদের থেকে বারাআত ঘোষণা করবে, সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে, তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবে না। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। তাদের সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে না। আরও বলে দেন যে, ঈমানদাররা দ্বীন, ঈমান, হিদায়াতের আলো ইত্যাদি পেয়ে কাফিরদের অনেক উর্দ্ধে। তাই তারা কখনই কাফিরদেরকে নিজেদের উপর প্রবল হতে দেবে না। নিজেদেরকে তাদের সামনে কখনও লাঞ্ছিত করবে না এবং লাঞ্ছিত অবস্থার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না। বরং নিজেদের দ্বীনি মর্যাদাবোধ ও ঈমানী মূল্যবোধ নিয়ে কাফিরদের থেকে স্বতন্ত্র থাকবে।

তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু কিছুদিন সুখে থাকার জন্য, নিরাপদ থাকার জন্য, অথবা কষ্ট-ক্লেশ থেকে দূরে থাকার জন্য (যা প্রত্যেক মানুষের জীবনে আসবেই)কখনই নিজেকে তাদের হাতে সোপর্দ করা, নিজেকে তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবার আয়োজন মেনে নেয়া, যাতে তারা তার উপর কুফুরী কানুন প্রয়োগ করতে পারে, তা কখনই জায়েয হবে না। দ্বীন ইসলামের মেজাজ সম্পর্কে অবগত এমন কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। ”

অপারগ অবস্থায় আত্মসমর্পণ

“কোনো মুসলিম যে এই মূলনীতির আলোকে কাফিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে, কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে সে এতটা অক্ষম হয়ে গেলো যে, এখন আর টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। জিহাদ চালিয়ে যাবার কোনো

রাস্তাই আর বাকী নেই। সে আত্মসমর্পণ না করলেও দুশমন তার নাগাল পেয়ে যাবে, তাকে উঠিয়ে নিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। তাহলে এমন অপারগতার অবস্থাকে ‘হালতে ইকরাহ’ বলা হয়। এমন অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়াশীল হয়ে অনুমতি দেন যে, সে আত্মসমর্পণ করতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা অবশ্যই যেন ইকরাহ তথা চরম অপারগতার মুহূর্তে হয়।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেন-

إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً[৫৬]

আরও ইরশাদ করেন-

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ[৫৭]

এজাতীয় অন্যান্য আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী ইকরাহের অবস্থা সাব্যস্ত হবে।

এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে একটি ছাড়। কিন্তু এ পরিস্থিতিতেও উত্তম এটাই যে, সে শহীদ হওয়া পর্যন্ত সবর ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। আত্মসমর্পণ না করে এবং গ্রেপ্তারির শিকার না হয়ে সর্বশক্তি প্রদর্শন করে যাবে। যে সবর করতে সক্ষম তার জন্য এটাই উত্তম। একেই বলে আযীমত।

এ বিষয়ে একটি বিশেষ দলীল হলো, আসিম বিন ছাবিত রাজীআল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার দশ সঙ্গীর ঘটনা। বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এঘটনা বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই ঘটনার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে-কোনো ব্যক্তি কি নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে? আর যে তুলে না দেয় এবং যে শাহাদাতের সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করে।

এই ঘটনার সারাংশ হলো-দশজন সাহাবীর মধ্যে কেউ কেউ আযীমতের উপর আমল করেছেন। তারা আত্মসমর্পণ করেন নি। শাহাদাত লাভ করা পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। আর কিছু সাহাবী রুখসত অবলম্বন করেছেন। তারা আত্মসমর্পণ

---

[৫৬] তবে তোমরা তাদের জুলুম থেকে বাঁচার কোনো পদ্ধতি যদি অবলম্বন করো। (তবে সেটার সুযোগ আছে) (সূরা আলে ইমরান: ২৮)

[৫৭] তবে তার কথা ভিন্ন যাকে (কুফুরী বাক্য বলতে)বাধ্য করা হয়, আর তার অন্তর ঈমানের উপর স্থির। (সূরা নাহল: ১০৬)

করেছেন। কাফিরদের হুকুম মেনে নিয়েছেন। কাফিররা প্রথমে তাদেরকে গ্রেফতার করে, এরপর বিক্রি করে দেয় এবং সবশেষে কতল করেছে।

এটাই হলো এই মাসআলার সারকথা। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার;যিনি সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। ”

আত্মসমর্পণের কারণে কি মুরতাদ হয়ে যাবে?

“আমাদের পূর্বের মাসআলার আলোকে এতটুকু বলা যায়, যারা আলজিরিয়ান সিভিল কনকর্ড রেফারেন্ডাম আইনের অধীনে পাহাড় থেকে নেমে অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাগুতদের সাধারণ ক্ষমা মেনে নেন, তাদের উপর মুরতাদের হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না। বরং এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

- যারা বাস্তবেই মাজুর, অপারগ ছিলো না এবং অক্ষমও হয়নি বরং শুধু এজন্যই নেমে আসে যে, তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে, টিকে থাকার জন্য তাদের এতটুকু কষ্ট করতে হবে; যতটুকু সাধারণত শরীয়তে অসাধ্য বলে বিবেচিত নয়। পাশাপাশি তারা শুধু একটু ভালো থাকা বা আরামে থাকার জন্য নেমেছে, তাদের এই কাজটি মারাত্মক পর্যায়ের হারাম কাজ হবে, তবে এটা কুফুর নয়।

- পক্ষান্তরে যদি বাস্তবেই অক্ষম-অপারগ ও বাধ্য হয় এবং শরীয়তের ছাড় গ্রহণ করেই এমনটা করে থাকে, তাহলে তারা শরীয়তে মাজুর বলে গণ্য হবে। এতে তাদের কোনো অপরাধ হবে না।

- তবে যাদের নেমে আসা ও আত্মসমর্পণের সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ও যুক্ত হয় তাদের হুকুম সে বিষয়গুলো সামনে রেখেই বর্ণনা করতে হবে।

যেমন-যারা নেমে আসে তাগুতদের সঙ্গে মুয়ালাত অবলম্বন করলো, তাদের সদস্যদের মতো হয়ে গেলো, তাদের কাতারে শামিল হয়ে গেলো, তাদের হুকুম তাগুতদের মতোই। অর্থাৎ তারা মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে। যাদের আর কোনো সম্মান বাকী থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

এমনিভাবে যে নিজের খেয়াল-খুশি মতো শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাদেরকে মুসলিমদের গোপন তথ্য শেয়ার করে দেয়, তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে

সহযোগিতা করে, তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো- সে যদি গ্রহণযোগ্য ইকরাহের শিকার না হয়।"

মুরতাদের সঙ্গে 'হুদনা' তথা সাময়িক যুদ্ধবিরতির হুকুম

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"সারকথা হলো, মুরতাদ সরকার চাই আলজেরিয়ায় হোক বা অন্য কোনো দেশের, তাদের সঙ্গে 'হুদনা' তথা সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা অকাট্য কুফুর নয়। কোনো আলিম এমন কথা বলেন নি!

হুদনা হয়ত জায়েয হবে, না হয় নাজায়েয বা হারাম হবে। কুফুর হবে না। এই বিষয়টি ইজতেহাদী ও আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। আমার খেয়ালে এটা তখনই জায়েয হবে, যখন মুজাহিদদের এটা প্রয়োজন হবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এর মাঝে ফায়দা থাকবে। বর্তমান সময়ের মুরতাদদের হুকুম আসলী কাফিরদের মতই। ওয়াল্লাহু আলাম।

এ কথা শুধু আমার নয়, বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য অনেক আলিমই এমনটা বলেন। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং মতামত ও দলীল উপস্থাপনের জায়গা এটা নয়। এটা হলো, সবধরনের হুদনার সাধারণ হুকুম। যা ফিকহের কিতাবাদীতে এসেছে।

তবে আলজেরিয়ার মুজাহিদদের সঙ্গে যা হয়েছে, যেমন- আলজেরিয়ান সিভিল কনকর্ড রেফারেন্ডাম এ্যক্টের অধীনে, জাতীয় সন্ধিচুক্তি, মুজাহিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা, পাহাড় থেকে নেমে আসা, অস্ত্র জমা দেয়া, জিহাদ পরিত্যাগ করা, নিজেরা আত্মসমর্পণ করা, তাগুতদের অধীনতা গ্রহণ করা, পূর্বের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাওবার ঘোষণা দেয়া ইত্যাদি তা কখনই ইসলামী ফিকহের হুদনা বা সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার হুকুম ভিন্ন। যা আত্মসমর্পণের মাসআলা। এর হুকুম পূর্বে আলোচনা হয়েছে। ওয়াল্লাহুল মুয়াফ্ফিক।"

শাইখ ইবনে উসাইমিন কর্তৃক অস্ত্রসমর্পণের ফাতওয়া এবং তার জবাব

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“আমাদের মতে এই ফাতওয়া অনেক বড়ো ধরনের ভুল এবং অবিবেচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করুন।

শাইখের ইখলাস নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, বরং আমরা এটাই বলব যে, শাইখ বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি না জানার কারণেই এমন ফাতওয়া দিয়েছেন। তাগুতদের কিছু দোসর এবং জিহাদ ও মুজাহিদদের কতিপয় দুশমন, যারা শাইখের আস্থাভাজন;তারা শাইখের কাছে গিয়ে মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। তাই তিনি এমন ফাতওয়া দিয়েছেন। অন্যথায় তার ইখলাস ও ইলমী গভীরতাকে অস্বীকার করতে পারে? নিঃসন্দেহে তিনি আলিম ও ফকীহ ছিলেন।

এখানে আরেকটি কথা বলা ভালো-প্রকৃতপক্ষে আলমী জিহাদের ব্যাপারে শাইখের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা প্রায় সবারই জানা আছে। আমরা সেগুলো এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। আর এখানে এগুলো বিশদ আলোচনার স্থানও নয়। অবশ্য মুজাহিদীন ও তাদের উলামায়ে-কিরাম, মাশায়িখ ও নেতৃবৃন্দের কাছে এগুলো সুপরিচিত বিষয়।

তবে এখানে যেটা বলতে চাই তা হলো, মুজাহিদদের লক্ষ্য করে শাইখের এই ফাতওয়া দেয়া যে, তারা পাহাড় থেকে নেমে আসুক, তাগুতের কাছে অস্ত্রজমা দিয়ে জিহাদ ছেড়ে দিক, এমন তাগুতী সরকারের অধীনতা মেনে নিক;যারা কাফির, মুরতাদ, আল্লাহদ্রোহী, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। নিঃসন্দেহে এই ফাতওয়া একটি মারাত্মক ভুল ফাতওয়া। বরং এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড়ো ক্ষতি ও মুসিবতগুলোর একটি। আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে, এই জঘন্য ফাতওয়ার কারণেই আজ উম্মাহর বড়ো বড়ো উলামা আর নওজোয়ানদের মাঝে বিশাল দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।

মুরতাদরা এই ফাতওয়া ও এ জাতীয় অন্যান্য ফাতওয়া পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এতটাই উচ্ছ্বসিত হয়েছে যে, পুরো দেশে তা ঢালাওভাবে প্রচার করছে। আমার কাছে সংবাদ আসে যে, পাহাড়-পর্বত ও গহীন জঙ্গলে হেলিকপ্টার যোগে পঙ্গপালের ন্যায় এই ফাতওয়া ছড়িয়ে দেয়া হয়।

আলজেরিয়ান তাগুত সরকার এর আগেও বেশ কয়েকবার মুজাহিদদেরকে আত্মসমর্পণের ও তাওবা করার দিকে আহ্বান করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্যর্থ

হয়েছে। (আল্লাহ তাদেরকে সর্বদা ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত করুন) কিন্তু এবার এই ফাতওয়ার কারণে তারা খুব সহজেই সফল হয়ে গেলো। ফাতওয়া দিয়ে মুজাহিদদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করার এই প্রচলন অনেক প্রাচীন। আমেরিকাও আফগানে ঢুকার পর তালেবান ও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে একই পলিসি গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু তারা সফল হয়নি। সব দুশমনই এই পলিসি সবসময়েই গ্রহণ করে থাকে।

কিন্তু এবারের ফাতওয়াটি সাধারণ কারও ছিলো না। মুসলিম বিশ্বের সর্বজন পরিচিত এক বড়ো আলিমের ফাতওয়া। যেই ফাতওয়ায় তিনি মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের (মুরতাদের) বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত মুজাহিদদেরকে জিহাদ ছেড়ে তার দলভুক্ত হওয়ার আহ্বান করছেন! যেই ফাতওয়ায় এই (মুরতাদ) মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের দোসরকে মুসলিম শাসক বলে আখ্যা দিচ্ছেন! মাআজাল্লাহ! হাশা লিল্লাহ! ! আলইয়াজু বিল্লাহ! ! !

আলজেরিয়ান শাসকদের মত লিবাসদারী মানুষ কীভাবে মুসলিম হতে পারে! তারা একযোগে –ধর্মহীন, অসভ্য, সেকুলার, জাতীয়তাবাদী, দেশপূজারী, ক্রুসেডারদের বন্ধু, শরীয়তের দুশমন, মানবরচিত আইনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা , দ্বীন ও দ্বীনদার শ্রেণির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।

তাদেরকে মুসলিম ঘোষণা করা কোন মুসলমানের পক্ষে কীভাবে সাজে! কোনো বড়ো আলিম সে অনেক দূরের কথা! ! হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

এ জাতীয় ফাতওয়া দিয়েই উলামায়ে-কিরাম অভিযোগ করে, যুবকরা আমাদের কথা মানে না। তারা আমাদের শ্রদ্ধা করে না!

আসলে এ জাতীয় মারাত্মক ভুল ও গুমরাহীপূর্ণ ফাতওয়ার জবাব দেয়াই প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ আমি তো কথা বলছি, আহলে জিহাদ ও আনসারে জিহাদের সঙ্গে। তাদেরকে শুধু এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি যে, এই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে দু'টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। আর উভয় মূলনীতিই মারাত্মক ভুল।

এক- আলজেরিয়ান সরকার ইসলামী সরকার। তার হুকুমত শারঈ হুকুমত।

দুই- মুজাহিদরা হলো খাওয়ারিজ, তারা মুসলমানদেরকে তাকফীর করে তাদের বিরুদ্ধে খুরুজ ও বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের রক্ত নিজেদের জন্য হালাল করেছে। পথভ্রষ্ট GIA এবং সত্যনিষ্ঠ, নেককার ও অধিকাংশ মুজাহিদদের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য না করেই, কোনো ধরনের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই সবার উপর ঢালাওভাবে একই হুকুম আরোপ করেই। অর্থাৎ সবাইকেই খাওয়ারিজ বলে দেয়া হয়েছে!

পূর্বে উল্লেখিত ফাতওয়ার উভয় মূলনীতি যে ভ্রান্ত মূলনীতি, তা জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাউকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আর আমাদের কাছেও এই উভয় মূলনীতি সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য। তাই এই ফাতওয়ার প্রবক্তাদের প্রতি মনোযোগ দেয়ারও আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ”

শাইখ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের অবস্থান

“বেশির থেকে বেশি শাইখ উসাইমিন সম্পর্কে আমরা এটা বলতে পারি যে, তিনি মাজুর। কারণ তাঁর সততা, ইখলাস ও ইলম সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। উম্মাহর মাঝে ইলমে নাফি ও আমলে সালেহের পুণর্জাগরণে সূচনায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। (এমনিভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানানোকেও আমরা ঠিক মনে করি না।)এই ফাতওয়ার কারণে আমরা তাকে মাজুর মনে করি। তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং তাঁর জন্য ক্ষমার দুআও প্রার্থনা করি।

কিন্তু এই ফাতওয়া... যে জঘন্য পর্যায়ের একটি বিভ্রান্তি, এই বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বরং তা সুস্পষ্ট গুমরাহী। আল্লাহর কসম! বিষয়টি এমনই।”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ‘আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা’ নামক অডিও ক্লিপে বলেন-

“আমি হিসবা ফোরামের জবাবে ইতোপূর্বেও বলেছি, এটা সুস্পষ্ট গুমরাহী। শুধু ভুল নয়, স্পষ্ট গুমরাহী। শাইখ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ-এর এই ফাতওয়া, ইলমের কোনো মূলনীতির অধীনে পড়ে না। আমার বুঝে আসে না, শাইখ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ-এর মতো জাদরেল আলিম, কীভাবে এই গুমরাহীর শিকার হলেন! এটা কাল্পনিক হলে হতে পারে, বাস্তবে এমনটা হওয়া তো অসম্ভবপর ছিলো। ”

আত্মসমর্পণের ব্যাপারে যুবকদের প্রতি নসীহত

“যুবকদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো, আপনারা বিনা দ্বিধায় জিহাদ চালিয়ে যান। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। পুনরায় আবার মুজাহিদীনের বিজয়ের দরজা খুলেছে। এখন আপনাদের কর্তব্য হলো ধৈর্যের সঙ্গে হকের উপর অটল থাকা। ইনশাআল্লাহ, সামনের পরিস্থিতি আরও উত্তম থেকে উত্তম হবে। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই মুজাহিদদের অনুকূলে। যুবকদের উচিত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। সবর করা এবং অটল থাকা। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সহায় হেন।

তাগুত হুকুমতের সঙ্গে কোনো ধরনের সন্ধিচুক্তিতে (সন্ধিচুক্তিতে) আবদ্ধ হওয়া, তাদের সাধারণ ক্ষমা গ্রহণ করা এবং এজাতীয় যেকোনো প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে আপনারা বিরত থাকুন।

সুবহানআল্লাহ! আমরা তাদেরকে জিহাদ ছাড়ার পরামর্শ কীভাবে দেবো, অথচ আল্লাহ তাআলা এই জিহাদের পথ ধরেই তাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই তাদেরকে তাগুতদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তারা কি আল্লাহর দেয়া এই নিয়ামত ও সম্মান লাভের পর আবার লাঞ্ছনার পথে পা বাড়াবে? কখনও না! আল্লাহর শপথ কোনো মুসলিমকেই আমরা এমন পরামর্শ দিতে পারি না।

তবে তার কথা ভিন্ন, যে চূড়ান্তরূপে অপারগ হয়ে যায়। সে নিশ্চিত হয় যে, সে অবশ্যই পরাজিত হবে। ফলে তাকে শহীদ করা হবে, কিংবা গ্রেফতার করে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা হবে। দুশমনের উপর বিজয় লাভ বা তার হাত থেকে বেঁচে যাবার কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই। তাহলে সে আত্মসমর্পণ করতে পারে। তবে তাকেও আমরা শুরুতেই আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেই না। বরং তার ব্যাপারেও আমাদের পরামর্শ হলো, যথাসম্ভবপর ধৈর্যের সঙ্গে অটল থাকুন। কাফিরের হাতে আত্মসমর্পণ করে লাঞ্ছিত হওয়া এবং তার হুকুম মেনে নেয়ার চেয়ে শহীদ হওয়ার পথ বেছে নিন। যদি সে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে এটাই তার জন্য অতি উত্তম।

কিন্তু যদি সে এমন পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করে ফেলে, এদিকে আমরা জানি যে, সে সৎ ও মুখলিস;তবে সে একান্তই অপারগ ও অক্ষম...তাই তাকে আমরা মাজুর মনে করি। তার জন্য ক্ষমার আশা করি। সে আমাদের বন্ধু। সে আমাদের ভাই।

বর্তমানে আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল-এর অন্তর্ভুক্ত আমাদের ভাইদের অবস্থা সবার জানা হয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব, দক্ষিণ এবং মধ্যবর্তী এলাকাগুলোতে। এই অবস্থায় এখন আর কোনো ধরনের অপারগতা নেই বললেই চলে। তবে কখনও কখনও পরিস্থিতি কোথাও পরিবর্তন হতেও পারে।

ঐ অবস্থায় মুজাহিদ ভাইদের উপর আবশ্যক হলো, সবর ও দৃঢ়তার সঙ্গে অটল থাকা। আত্মসমর্পণ এবং তাগুতী হুকুমের অধীনতা গ্রহণ, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রতারণামূলক অ্যাক্টের সঙ্গে একমত হওয়া কোনোভাবেই বৈধ হবে না। যে এমনটা করবে, সে বড়ো ধরনের খিয়ানতে লিপ্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে। আত্মসমর্পণের পর তার সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হবে, তাতে সে কুফুরীতে লিপ্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কুফুরীতে প্রবেশ করার অনেক দ্রুততম চোরাই পথ হলো এটা।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে শান্তি চাই, নিরাপত্তা চাই, হকের উপর অটল থাকার তাওফীক ও শক্তি চাই। নিজেদের জন্য ও আমাদের সকল ভাইদের জন্য। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ”

****

পঞ্চম অধ্যায়: নতুন সূচনা

আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ (১৯৯৬ সাল)

GIA-এর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের কারণে মুজাহিদদের একটি দল তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা ১৯৯৬সালে অন্য অঞ্চলের আমীর হাসান হাত্তাবের নেতৃত্বে নিজস্ব দলগঠন করে। একদিকে, হাসান হাত্তাব জিহাদ সংস্কারের নিজীয় প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং অন্যদিকে, GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী রেজিমেন্টগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে সারিবদ্ধকরণের প্রচেষ্টা শুরু করে। কিন্তু যেহেতু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এলাকাগুলোও অনেক দূরে দূরে ছিলো, সেই সঙ্গে দীর্ঘ দূরত্বের পথ পায়ে হেঁটে যেতে হতো, তাই ১৯৯৯সালের এপ্রিলের আগে তাদের মধ্যে জোটগত বন্ধন গড়ে উঠতে পারেনি। 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল' নামে হাসান হাত্তাবের ইমারত গঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সমস্ত সৈন্যদল এবং তাদের এলাকাগুলো 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল'-তে যোগদান করে। আত্মসমর্পণের ফিতনার পর ২০০০সালে, কেবল সেই মুজাহিদীন পাহাড়ে রয়ে যান, যারা চরমপন্থার অতল গহ্বরে পতিত হননি এবং তাগুতের মিথ্যা যুদ্ধবিরতি দ্বারা প্রতারিত হননি।

'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ' সম্পর্কে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর মতামত

যাদের কাছে 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ' সম্পর্কিত পরিস্থিতি এখনও পরিষ্কার ছিলো না এমন পর্যায়ের লোকদের সম্পর্কে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"GIA-এর হাতে এতো বড়ো অন্যায় ও গুমরাহী প্রকাশের পর সাধারণ জনগণের কাছে মুজাহিদীনের প্রকৃত পরিস্থিতি অস্পষ্ট হয়ে যায়। এর একটি কারণ তো ছিলো GIA-এর গুমরাহী। তবে এটাও একটি কারণ যে, আলজেরিয়া ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র থেকে তুলনামূলকভাবে দূরে, এমনকি খবরের মধ্যেও তেমন আলোচনায় আসে না। "

তারপর পরিস্থিতি পরিষ্কার হওয়ার পর, শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ রেকর্ড করা অডিওতে এই জামাআত সম্পর্কে বলেন-

“এই দলটি মূলত GIA-এরই অংশ ছিলো। এই দলের মারকাজ দ্বিতীয় অঞ্চলে ছিলো। আমি ঐ অঞ্চল এবং ঐ অঞ্চলের বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। হাসান হাত্তাবের নেতৃত্বে এই এলাকাটি GIA বিপথগামী হওয়ার বেশ পরেই তার থেকে আলাদা হয়। যে সময়[১৯৯৬সালের আগস্টে] আনতার যাওয়াবেরী GIA-এর ইমারত দখল করে নেয়, তখন আলাদা হয় এত বিলম্ব করাটা ছিলো তাদের ভুল সিদ্ধান্ত। আসলে শুরুর দিকে তারা GIA-এর পক্ষে অনেক কিছুই করেছে। GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত করে। কোনো ভালো কাজেই তাদেরকে দেখা যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি রহম করেন এবং জামাল যাইতুনীর হত্যার পর তারা GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেন।

GIA নামটি তাদের অন্তরে এতোটাই প্রভাব সৃষ্টি করে যে, শুরুতে এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের জন্য GIA-এর নামটিই গ্রহণ করেছিলো। তারা দাবি করতো যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই আসল GIA। অন্যদিকে আনতার যাওয়াবেরী এবং তার দল বিপথগামী হয়েছে এবং বিদ্রোহ করেছে। তাই তারা GIA-এর দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। যদিও এমনটা প্রকৃত বাস্তবতা হয়, তবুও রাজনীতির জগতে এ ধরনের নাম আঁকড়ে থাকার উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়দা নেই। কারণ GIA-এর নামটি ইতোমধ্যে ফিতনাহ-ফ্যাসাদ, বিপথগামিতা এবং অপরাধমূলক মানসিকতার সমার্থক হয়ে উঠে।

যখন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক শিরারবাহ এলাকায় আমাদের কাছে আসলো, যা আরবিয়া এবং মিফতাহর প্রভাবাধীন ছিলো, তখন আমি এই বিষয়টি নিয়ে ঐ অঞ্চলের মানুষেদের সঙ্গে কথা বলি এবং এই নাম পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সেসময় তাদের মাঝে বাসা বেঁধে থাকা কুসংস্কার, দলীয় গোঁড়ামি এবং অবাঞ্ছিত আবেগের কারণে নাম পরিবর্তন করা তাদের জন্য অনেক কঠিন ছিলো।

আমার ধারণা ও জানা অনুযায়ী-এই সময়ের মাঝে অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনেক ভুল প্রকাশ পায়, এমনকি আমি তাদের ব্যাপারে আশাহত হয়ে পড়ি। এটাই যথেষ্ট

ছিলো যে, এসব লোকেরাই শেষ পর্যন্ত জামাল যাইতুনীর সঙ্গে থাকবে, আর তারাই তো ঐ সমস্ত অঞ্চলের জিম্মাদার ছিলো।

'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ' গঠন হওয়ার আগেই আমি দেশ ত্যাগ করি। পরবর্তীতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় অঞ্চলের অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা তথা পঞ্চম ও ষষ্ঠ এলাকা ও মধ্যাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রেজিমেন্ট এবং পরবর্তীতে দক্ষিণাঞ্চলের রেজিমেন্টগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর এই গ্রুপটি গঠিত হয়। যাহোক, হাসান হাত্তাবের নেতৃত্বে আমি সবসময় একটি নেতিবাচক সংকেত পেতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে শুনতে পাই যে, তাদের উন্নতি আসছে। তারা অতীতের ভুল স্বীকার করছে, পরামর্শ গ্রহণ করছে, উন্নতির সন্ধান করছে, বিষয়বস্তু এবং বক্তৃতা-শৈলী সংশোধন করছে এবং সংযম আর নম্রতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

হাসান হাত্তাবের পর নতুন নেতৃত্বের আগমনে আমি আনন্দিত হই। কারণ এখন 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া' সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আলজেরিয়ান যুবকদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো- তারা যেন এই জামাআতের সঙ্গে থাকে এবং তাদের কাফেলায় যোগদান করে। ”

হাসান হাত্তাবের পর শাইখ আবু ইব্রাহিম মোস্তফা রহিমাহুল্লাহ'এর ইমারত

তাজল্ট এলাকার জেলখানায় অপারেশন পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত আমীর শাইখ আবু ইব্রাহিম মুস্তফা ১৪২৪হিজরীর জমাদিউস সানী মুতাবেক ২০০৩সালের আগস্ট মাসে 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল'-এর মজলিসে-আয়ান তথা আমীর-উমারা পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন। তারপর ২০০৩সালের শরৎকালে তিনি উক্ত জামাআতের আমীর মনোনীত হন। ২০০৪সালের জুন মাসে তিনি বিজায়াত প্রদেশের কছূর উপত্যকায় শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের পর সালাফী জামাআতের আমীর নিযুক্ত হন ৩০বছর বয়সী যুবক মুজাহিদ আব্দুল মালিক দ্রুকদেল। যিনি শাইখ আবু মুস'আব আব্দুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ নামে সমধিক পরিচিত।

‘আল-জাআমাত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ’এর আল-কায়েদায় অন্তর্ভুক্তি (২০০৬ সাল)

২০০৬সালে ‘আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল জিহাদ’–এর আমীর শাইখ আবু মুস‘আব আব্দুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ’এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে আল-কায়েদায় যোগদান করার ঘোষণা দেন। এরপরের বছর তথা ২০০৭সালে তিনি ‘আল-জামাআত আস-সালাফিয়া’ নামের পরিবর্তে ‘তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামি’ (আল-কায়েদা ইসলামী মাগরিব শাখা) নাম ব্যবহার করা শুরু করে দেন।

জিহাদ কি আল-কায়েদার সঙ্গে নাকি আলাদাভাবে?

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ আল-হিসবা ফোরামে বলেন-

“সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে [আল-কায়েদায় যোগদান] শরয়ী, রাজনীতিক এবং কৌশলগতভাবে ঠিক কাজ হয়েছে। তবে যোগদান এই শর্তে যে, একে অপরকে ভালোভাবে জানতে হবে ও একে-অপরের প্রতি আশ্বস্ত হতে হবে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও পরিচিতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে। এক্ষেত্রে কোনোও তাড়াহুড়ো করা হবে না এবং এটি কেবল আবেগের চেতনায় প্রবাহিত হলেও হবে না।

আমি এই বিষয়ে আল-কায়েদার ভাইদেরকে পরামর্শ দিবো যে, আপনাদের দরজা তখনই খুলবেন, যখন আপনারা তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানবেন এবং আপনাদের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে তাড়াহুড়ো করে কিছু করার প্রয়োজন নেই। কারণ কাউকে আপনাদের সঙ্গে শামিল করার ব্যাপারে আপনারা যতটুকু সফল হবেন, অন্যান্যদের মাঝে আপনাদের ব্যাপারে ততটুকুই আস্থা জন্ম নেবে। তখন অন্য এলাকার মুজাহিদীনও আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহবোধ করবে। আপনাদের নাম গ্রহণ করবে এবং আপনাদের তানযীম তথা সংগঠনে যোগ দিতে আগ্রহী হবে। আমার কথা হলো, যে কেউ প্রবেশ করতে চায়, তাদের জন্য আপনাদের দরজা খোলা থাকবে। তবে সেটা যেন হয়, অন্তর্দৃষ্টি, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং জানা-শোনার ভিত্তিতে। ইনশাআল্লাহ, এই আমল প্রতিটি অঞ্চলের মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রেণির মানুষের কাছে প্রিয় এবং কাম্য।

সুতরাং নিয়মটি যেন এমন হলো-আপনি যত বেশি আশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবেন, আপনি তত বেশি সফল হবেন। আর আপনি যতো বেশি সফল হবেন, আপনি ততোই অন্যদেরকে আপনার দলে ভিড়াতে পারবেন।

এই একই নীতি সব এলাকায় স্থানীয় তানযীমের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। যাতে করে তাদের জন্য আল-কায়েদায় যোগদান করা অদূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের ফায়দাকে সামনে রেখে সবকিছুর হিসাব-কিতাব করা এবং ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করেই সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

والله الموفق لا اله غيره- ولا رب سواه- سبحانه."

‘তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী’ (আল-কায়েদা ইসলামী মাগরিব শাখা)

‘তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী’ (আল-কায়েদা ইসলামী মাগরিব শাখা) গঠিত হওয়ার পর আলজেরিয়ায় জিহাদ ঠিক দিক-নির্দেশনা খুঁজে পায় এবং গুমরাহী মুক্ত পবিত্র জিহাদের সূচনা হয়। আলজেরিয়াসহ পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুজাহিদীনের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়, পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জিহাদের তরঙ্গ তীব্রতর হয়েছে।

লক্ষ্য

তানযীম প্রতিষ্ঠার সময় তার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলো যে, এই জামাআত:

“ইসলামী মাগরিবকে পশ্চিমা শক্তিগুলোর, বিশেষ করে ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্ব, পাশাপাশি তাদের মিত্র মুরতাদ সরকারগুলো থেকে মুক্ত করতে চায়। এমনিভাবে এই অঞ্চলটিকে বহিঃশোষণ থেকে রক্ষা করে শরীয়ত বাস্তবায়নকারী একটি প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।”

এলাকা

আল-কায়েদার সঙ্গে যোগদানের পর আলজেরিয়ার মুজাহিদীন ছাড়াও মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, মালি এবং নাইজেরিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত মুজাহিদগণও এই তানযীমে যোগদান করে। যদিও এই তানযীমের মৌলিক

কার্যক্রম আলজেরিয়ায়, কিন্তু দক্ষিণের বিস্তীর্ণ মরুভূমিতেও তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। আল-কায়েদার মানহাজ অনুসরণ করে যেন তানযীম তার স্থানীয় বৃত্ত থেকে সরে আঞ্চলিক বৃত্তে প্রবেশ করেছে। তানযীমের মুখপাত্র হিসাবে মিডিয়ার কাজ আঞ্জাম দেয়া হত- **مؤسسة الأندلس للإنتاجالإعلامى** তথা 'আন্দালুসিয়ান ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি' নামক মিডিয়া থেকে।

২০১৭সালে মালি ও মরুভূমির তাওয়ারাক উপজাতি এবং অন্যান্য মুজাহিদীনের সমন্বয়ে 'নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' নামে একটি জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর উক্ত জামাআতের আমীর শাইখ আবুল ফযল আইয়াদ আল-গালী'এর নেতৃত্বে পুরো জামাআত 'তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী'-এর সঙ্গে যোগদান করে। ফলে আল্লাহর রহমতে সেখানকার মুজাহিদীনের শক্তি আরও বেড়ে যায়।

গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনসমূহ

এপ্রিল ২০০৭ সাল: রাজধানীতে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ ও পুলিশ সদর দফতরে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে ডাবল বোমা হামলায় ৩০জন নিহত এবং ২২০জন আহত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সাল: দক্ষিণ তিউনিসিয়া থেকে দুই অস্ট্রিয়ান পর্যটককে গ্রেফতার।

জানুয়ারি ২০০৯ সাল: মালিতে ৪জন আমেরিকান পর্যটককে গ্রেফতার।

জুন ২০০৯ সাল: মৌরিতানিয়ার রাজধানী 'নুওয়াকশুত'তে একটি দাতব্য সংস্থার আড়ালে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারকারী একজন আমেরিকান ক্রিস্টোফারকে হত্যা।

জুলাই ২০১৩ সাল: তিউনিসিয়ার শাআনবি পাহাড়ে ৮জন তিউনিসিয়ান সৈন্য হত্যা।

জুলাই ২০১৪ সাল:: একই পাহাড়ে ১৮জন সৈন্য হত্যা।

জানুয়ারি ২০১৬ সাল: বুরকিনা ফাসোর রাজধানী 'ওয়াগাদুগু' এর বিখ্যাত হোটেলে বিস্ফোরণ। যা ফরাসি সৈন্যদের কেন্দ্র ছিলো এবং যেখানে সেসময়

বিদেশিদের একটি সভা চলছিলো। এতে ২৩জন নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক ছিলো এবং ৩৩জন আহত হয়।

মালি এবং লিবিয়ায় জিহাদের প্রভাব

বিস্তীর্ণ মরু সাহারাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মুজাহিদীনের লক্ষ্য এটাই ছিলো যে, সেখানে আলজেরিয়ার জিহাদের জন্য একটি দুর্গম বেস ক্যাম্প তৈরি করা। ভালো ফলাফল লাভের পর জিহাদী চিন্তা-ভাবনাকে সেখানকার জনসাধারণের কাছে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে বর্তমানে সেখানকার জনসাধারণ কুরবানীর অনন্য উদাহরণ স্থাপন করছে এবং ফ্রান্স ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাশাপাশি সেখানে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

শাইখ আবুল লাইস আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ বলতেন-

“আলজেরিয়ার জিহাদের বরকতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, জিহাদী চিন্তাধারা পুরো সাহারা মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই একটি সাফল্যই এমন যে, তা আলজেরিয়ার মুজাহিদীনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। ”

প্রথমে জিহাদ আলজেরিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিলো। আল্লাহর শুকর যে, বর্তমানে তা পুরো ইসলামিক মাগরিব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মালি এবং লিবিয়ায় জিহাদের শুভ সূচনা হওয়ার কারণে শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায় এবং মুজাহিদীনের জন্য সদস্য নিয়োগের নতুন দরজা খুলে যায়। বাহ্যত এই কাজের জন্য কিছু আলজেরীয় নেতৃবৃন্দ আলজেরিয়ার ময়দান খালি রেখে দেয়। কিন্তু এটা কোনো ক্ষতির বিষয় নয়, বরং তা হলো দাওয়াহ ও জিহাদ ছড়িয়ে দেওয়ার সুগম পথ বিনির্মাণের প্রয়াস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসংখ্য সাহাবাদের মাঝে মাত্র অল্প কয়েকজন সাহাবী মদিনায় ইন্তেকাল করেন। বাকী অধিকাংশ সাহাবাই দাওয়াহ ও জিহাদের জন্য বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

দায়েশ (IS/আইএস) এবং আলজেরিয়ার মুজাহিদীন

মুজাহিদ আবু আকরাম হিশাম বলেন-

“আলজেরিয়ায় জামাআতে দাওলা (অর্থাৎ দায়েশ তথা IS) নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়ার পর, আদনানী কর্তৃক পেশকৃত কিছু সংশয়ের কারণে

কতিপয় যুবক তানযীমুল কায়েদা থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, আজ আলজেরিয়ায় এই দাওলার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ দাওলা এখানে মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলো। অবশ্য তাগুত সরকার তাতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য মরণপণ চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাতে সফল হতে পারেনি। এর কারণ ছিলো এই যে, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কেউই দাওলার কাছে বাইআত গ্রহণ করেন নি। কেননা, তারা নিজেরাই একবার খারিজীদের জাহান্নামের কিনারা দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে GIA থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চরমপন্থি সালাফীগোষ্ঠী 'হুমাতুদ-দাওয়াহ্ আস-সালাফিয়্যাহ' (সালাফী দাওয়াতের প্রহরী বাহিনী)-এর কিছু 'জিহাদি টোলি' দাওলার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো।

কিন্তু আমি এটা স্পষ্ট করে বলছি যে, বাস্তবে তখনও এই জামাআতের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। তারা একটি কৃত্রিম প্রাসাদে সময় কাটাচ্ছিলো। তারা নিজেদেরকে আলজেরিয়ার একমাত্র সালাফী মুজাহিদগোষ্ঠী মনে করতো এবং তারা আরও মনে করতো যে, তারাই জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের এই কাল্পনিক ভুল চিন্তার কারণেই 'আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল'-তে যোগ দেয়নি। যদিও ততদিনে GIA-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সমস্ত এলাকার রেজিমেন্টগুলো এই দলে ('আল-জামাআত আস-সালাফিয়া লিদ-দাওয়া ওয়াল কিতাল'এ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এজন্যই 'হুমাতুদ-দাওয়াহ্ আস-সালাফিয়্যাহ' (সালাফী দাওয়াতের প্রহরী বাহিনী)-এর বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। তাদের মধ্যে অনেক মুজাহিদীনের কাছে যখন আসল হাকীকত তথা প্রকৃত বাস্তবতা প্রকাশ পেলো, তখন তারা নিঃশর্তভাবে তানযীম আল-কায়েদায় যোগদান করে। কিন্তু যখন আবার দাওলার ফিতনা শুরু হয়, তখন 'হুমাতুদ-দাওয়াহ্ আস-সালাফিয়্যাহ' (সালাফী দাওয়াতের প্রহরী বাহিনী)-এর কিছু নেতা তানযীমের বাইআত ভঙ্গ করে। হায়! তারা যদি এই সীমানা আর অতিক্রম না করতো;এই পর্যন্ত এসেই থেমে যেতো, তবে কতইনা উত্তম হতো, কিন্তু তাদের কেউ কেউ (এখানে কেউ কেউ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-আবু আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-ইদ্রীসী) আল-কায়েদার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের তির্যক তীর ছুঁড়া শুরু করে দেয়। এমনকি সে বলে যে, 'তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী' শরীয়তের আইন প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে, এর দ্বারা সে তাদেরকে তাকফীর করার দিকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত

করেছিলো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই এই লোকটি অপমানিত-লাঞ্ছিত অবস্থায় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ”

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“এটা এক আশ্চর্যজনক বিষয় যে, এতদসত্ত্বেও যখন দাওলার আন্দোলন শুরু হলো, তখন ‘তানযীম কায়েদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল-ইসলামী’-এর কতিপয় সদস্য এই তানযীম থেকে আলাদা হয়ে ইব্রাহিম বদরির হাতে বাইআত গ্রহণ করল। অথচ এই ইব্রাহিম বদরি জামাল যাইতুনী এবং আনতার যাওয়াবেরীর মতো ইমামতে উযমা এবং খিলাফতে ইসলামিয়ার দাবি করে বসে। আর সে GIA-এর অভিজ্ঞতা থেকে কোনোও সতর্কবার্তা গ্রহণ করেনি!

আমি এটা সুস্পষ্ট করতে চাই যে, এমন সমস্যাদের অধিকাংশই ইলম ও বুঝের দিক দিয়ে দুর্বল সাধারণ মুজাহিদীন। তাদের অধিকাংশই বয়সের দিক দিয়ে ছোটো ও সদ্য জিহাদে যোগ দেয়া মুজাহিদীন। তাছাড়া প্রাক্তন ও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ এবং মুজাহিদীনের কেউই ‘বাগদাদী’র বাইআত গ্রহণ করেননি। কারণ তারা অভিজ্ঞতালদ্ধ জীবন পাড়ি দেওয়ার মাধ্যমে পরিপক্ক হন। যার কারণে আসল ও নকল আমীরদের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে জানতেন ও বুঝতে পারতেন।

আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যদি এই কম বয়সের মুজাহিদরা GIA-এর বিপথগামিতার জমানায় থাকতো, তাহলে তারা সর্বপ্রথম জামাল যাইতুনী এবং আনতার যাওয়াবেরীর হাতে বাইআত গ্রহণ করতো।

ইসলামী আচারপ্রথায় একে অপরের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে না জানা অনেক গুরুতর একটা বিষয়। উম্মাহর কত যুবক আবেগের বশে কিছু একটা করে নিজেদের সময় নষ্ট করেছে এবং গোটা জীবনে বারবার ব্যর্থতার গ্লানি তাদের সইতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ

“পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। ”

****

ষষ্ঠ অধ্যায়: পাঠ, শিক্ষা ও উপদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সফলতার কারণসমূহ

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ’এর ভাষ্য অনুযায়ী আলজেরিয়ায় জিহাদী আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যের পেছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহ অবদান রেখেছে-

ব্যাপক জনসমর্থন

শহরগুলোতে মুজাহিদগণ কমপক্ষে ৭০% জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। যা কখনও কোথাও অর্জন করা যায়নি। তবে গ্রামে সমর্থন ছিল প্রায় শতভাগ।

দাওয়াত ও রাজনীতিক অঙ্গনের তৎপরতা

জনসমর্থন এমনিতেই অর্জন হয়ে যায়নি। বরং এর পিছনে উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার পূর্ববর্তী গণসচেতনতামূলক আন্দোলন এবং জাবহাত আল-ইনকায (সালভেশন ফ্রন্ট)-এর দাওয়াতী ও রাজনীতিক কর্মতৎপরতার বড়ই অবদান ছিলো।

জিহাদের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি

জনসমর্থন লাভের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো-জনগণের সামনে যৌক্তিক, বৌদ্ধিক এবং যুক্তিসঙ্গত দলীল বিদ্যমান থাকা। যার কারণে চিন্তাগত ও কার্যত দিক থেকে জনসাধারণের মনে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। লোকেরা বলাবলি করতো-এই নিরীহ মুজাহিদগণ;নৈতিক ও নীতিগত দিক বিবেচনায় আমাদের দেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, অথচ এই জালেম সরকার তাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাতিল সাব্যস্ত করেছে। এখন সরকার আসলে কি করতে চায়? এমতাবস্থায় জিহাদ করা ছাড়া তো আর কোনো বিকল্পপথ খোলা নেই।

অথচ অধিকাংশ সাধারণ জনগণ ছিলো সহজ-সরল। শাসকগণ মুরতাদ কি মুরতাদ নয়? তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ না অবৈধ? এসব মাসআলা তাদের সামনে ছিলো না। তবে জিহাদের বৈধতার পক্ষে একটি সাধারণ যুক্তিগত যৌক্তিকতা তাদের সামনে ছিলো, আর তাতেই তারা মুজাহিদদের সাপোর্টার হয়ে যায়।

সরকার ও সেনাবাহিনীর জুলুম

জনসমর্থন লাভের অন্য আরেকটি কারণ হলো-বিপ্লব চলাকালীন সময়ে সরকারের সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের পাশাপাশি সেনাবাহিনী কর্তৃক শত শত নিরপরাধ লোককে হত্যা করা এবং ঠুনকো অজুহাতে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা।

সরকারের দুর্নীতি

পাক সরকারের ন্যায় সীমাতীত দুর্নীতি চালু ছিলো। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, এমনিভাবে দেশের বৃহত্তম কোম্পানিগুলোর প্রায় সবকটি সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মালিকানাধীন ছিলো। সামরিক বাহিনী আর রাজনীতিক নেতারা মিলে দেশের অর্থনীতি নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়।

চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান

“আমরা আলজেরিয়ান ভাইদেরকে বলতাম, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে চমৎকার একটি কাজের ক্ষেত্র দান করেছেন। চারদিক থেকে পাহাড়বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, দীর্ঘ মরুভূমি, সুরক্ষিত পরিবেশ সব মিলিয়ে আপনারা যদি চান যে, এখানে দশকের পর দশক কাজ করে যাবেন, তাহলে নির্বিঘ্নে করতে পারবেন। কেউ আপনাদের নাগাল পাবে না। এমনকি ন্যাটোজোট ইচ্ছা করলেও আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। ”

জাতিগত বৈশিষ্ট্য

“আলজেরিয়ান জাতি বিপ্লবী জাতি। তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো-তারা যেকোনো কষ্ট খুব দ্রুত ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে সামলে নিতে সক্ষম। জুলুমের মোকাবেলায় খুব দ্রুতই উঠে দাঁড়াতে পারে। ধৈর্য-সহিষ্ণুতা তাদের স্বভাবজাত বিষয়। তাদের ইতিহাস-বিপ্লব, স্বাধীনতা এবং জালিমের মোকাবেলা করার উপাখ্যান দিয়ে ভরপুর। ”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ব্যর্থতার কারণসমূহ

GIA কেন ব্যর্থ হলো?

মানহাজের ভিন্নতা এবং জিহাদী মানহাজের দুর্বলতা ও অসঙ্গতি

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“জিহাদী তৎপরতার শুভ সূচনা হবার পূর্বে ৯০-এর দশকের শুরুতে আলজেরিয়ার দাওয়াতী ময়দান এবং মসজিদগুলোতে মানহাজ নিয়ে চরম বিরোধ দেখা দেয়। যখন জিহাদী কার্যক্রম বিস্তৃত হচ্ছিলো, তখন চলমান এই বিরোধ মসজিদের গণ্ডি অতিক্রম করে মুজাহিদদের মারকাযসমূহে শাখা বিস্তার করতে লাগলো। জিহাদের ময়দানে বিভিন্ন আকীদা মানহাজের লোকেরা শামিল হতে লাগলো। যদিও আলেজেরিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে সবাই একমত ছিলো, কিন্তু তাদের পরস্পরের মাঝে আকীদা-বিশ্বাস, ফিকহের অসংখ্য মাসায়িল ও চিন্তা-দর্শন নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিলো। যার ফলে তারা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে এক হওয়া সত্ত্বেও আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনায় ছিল শতধা বিভক্ত। আর এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদের মাঝে গ্রুপিংও হয়েছিলো।

যখন ১৯৯৪সনে GIA-এর আমীর আবু আব্দুল্লাহ আহমদ মুজাহিদদেরকে এক পতাকার নিচে সমবেত করতে চান, তখন তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিলো আকীদা-মানহাজের এই ভিন্নতা। তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো, কীভাবে সবাইকে একই মানহাজের আওতায় আনা যায়। জামাআতের প্রত্যেকেই অপরের প্রাক্তন আন্দোলন, দলীয় মানহাজ ও চিন্তাধারার ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত থাকতো। অমুক মনে হয়, আমাকে পিছনে ফেলে আগে চলে যাবে। এই কারণে সকলেই ঐক্য ও বাইয়াতের উপর অটল থাকার শর্ত আরোপ করতো। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ঐক্য বিনির্মাণের প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু করেন, অন্যদিকে তিনি আমীর হওয়ার ছয় মাসের মাথায় শাহাদাত বরণ করেন।

মতদ্বৈততার কারণে তাদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস ছিলো শূন্যের কোঠায়। একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। এমনকি জিহাদের ময়দানে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরিবর্তে একে অপরকে ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। অনৈক্য, আস্থাহীনতা আর অস্থিরতা শেকড় বিস্তার করে।

সর্বোপরি, কতিপয় মুজাহিদ এই ঐক্যকে বাস্তব এবং সার্বজনীন বলে মনে করেনি। আসলে এখানে এমন ঐক্য প্রয়োজন ছিলো, যা হৃদয়ে আসন গেঁড়ে নেয়, চিন্তা-দর্শনকে কাছাকাছি করে দেয়, কাতারগুলোকে পাশাপাশি এনে দেয় এবং জিহাদ ও মুজাহিদদের আভ্যন্তরীণ সকল ত্রুটির পথ রোধ করে দেয়।

ফিকহী ইখতিলাফ

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“শরীয়তের মূলনীতি এবং কাওয়ায়িদ সামনে না রেখে শাখাগত বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা জিহাদের সূচনাতেই সাধারণ মুজাহিদদের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। যদিও প্রথমে এর বড়ো ধরনের প্রভাব ছিলো না। কিন্তু যখন সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির মাত্রা বেড়ে যায় এবং চরমপন্থিরা GIA-এর নেতৃত্বে আসন গেড়ে বসে, তখনই এই ফিকহী ইখতিলাফ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। একে তারা আকীদার উপর প্রাধান্য দিতে লাগলো। এর ভিত্তিতে একে অপরকে কাফির ও বিদআতী আখ্যা দিতে লাগলো। ”

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“জিহাদের সূচনার পূর্ব থেকেই মুজাহিদীনের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান ছিলো না, যেখানে প্রতিষ্ঠিত মানহাজ ও শারঈ মূলনীতি এবং সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত লোকের সমারোহ থাকবে, যারা নবাগত মুজাহিদদের বিশাল কাফেলাকে নিজেদের মাঝে নিয়োগ প্রদান করবে। অতঃপর সেই মানহাজের আলোকে শারঈ সীমারেখার ভিতরে থেকে সকল মুজাহিদকে গাইড করবে ও তাদের তারবিয়তের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ইখতিলাফী বিষয়াবলীকে মিটিয়ে দিবে বা কমপক্ষে তাদেরকে একই ধারার অধীনে নিয়ে আসার প্রয়াস চালাবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত ছিলো। ”

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“পুরো আলজেরিয়া জুড়ে বিস্তৃতভাবে জিহাদী কর্মকাণ্ড চলার কারণে এবং যুদ্ধের তীব্রতার কারণে শুরুতে নেতৃত্ব দেয়ার মতো যে কয়জন কমান্ডার ছিলেন, তারা সবাই শহীদ হয়ে যান বা গ্রেফতার হন। ফলে অনভিজ্ঞ ও অনুপযুক্ত সদস্যরা নেতৃত্বের আসনে বসেন। যাদের না ছিলো ঠিক জ্ঞান, উন্নত চরিত্র, সামরিক বুদ্ধিমত্তা ও উম্মাহর সমস্যাবলীর যথার্থ অনুভূতি।”

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“ইলমি এবং আখলাকী দুর্বলতার কারণে নেতৃত্বে বড়ো ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অপরদিকে সাধারণ মুজাহিদদের মাঝে চরমপন্থা, নিরক্ষরতা এবং জ্ঞানগত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ভালো অবস্থা প্রাধান্য পেয়েছিলো। যার কারণে অনেক দিক বিবেচনায় নেতৃবৃন্দের চেয়ে তারা ভালো ছিলো।

চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার নেতৃবৃন্দ সবসময় নিজেদের সমচিন্তার লোকদেরকেই কাছে রাখতো। আর নেককার লোকদেরকে দূরে রাখতো; শুধু তাই নয়, তাদের উপর উপর্যুপরি অনেক তুহমত আরোপ করতো। তাদেরকে অন্যদের কাছে ছোটো বানিয়ে রাখতো। সামান্য অপরাধের বাহানায় হত্যা করে ফেলতো। এমনিভাবে নেতৃত্বে তারাই আসতে পারতো, যারা ইলমি ও আখলাকি বিবেচনায় অনেক রুগ্ন ছিলো।

এটাই সুন্নাতুল্লাহ। আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ। উমর বিন আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন-আমীর হলেন, বাজারের মতো। যেই ধরনের পণ্য সেখানে বিক্রি হয়, সেই ধরনের লভ্যাংশই ফিরে আসবে। নেতৃবৃন্দ তখনই জনগণকে তারবিয়ত করতে পারবে, যখন তারা নিজেরা তারবিয়তের উপর থাকবে। প্রতিটি পাত্রে যা আছে তাই তার থেকে নির্গত হবে। কিন্তু GIA-এর নেতৃত্ব সব ধরনের পঙ্কিলতায় পূর্ণ ছিলো। আদর্শ মুসলিমের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বুঝও ছিলো না। না ছিলো আরবদের মতো চরিত্র, আর না ছিলো অমুসলিমদের মতো বৈষয়িক নলেজ। তাদের সামনে অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব পেশ করা হয়, কিন্তু তারা সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করে। ”

যোগ্য এবং মুত্তাকী আলেমের অভাব

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“ব্যর্থতার অন্যতম কারণের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত বিভ্রান্তি, ইলমি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবও ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অবশ্যই যারা জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলো, তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় বৈচিত্র্য ছিলো। কিন্তু এই বৈচিত্র্য খারাপ কোনো বিষয় নয়, এমনটা থাকতেই পারে। কেননা আমরা সমস্ত ইসলামী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদীনের ব্যাপারে শতভাগ পরিশুদ্ধতার দাবি

করতে পারি না। আর এটা সম্ভবপরও নয়। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনদের সময়েও সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশ এরকম ছিলো। কিন্তু বিপজ্জনক বিষয় হলো- এমন কোনো কেন্দ্রীয় এবং শক্তিশালী একাডেমিক নেতৃত্ব না থাকা, যার উপর মানুষ একমত হতে পারে। এটা ছিলো অভ্যন্তরীণ বুনিয়াদি সমস্যা। কিন্তু বাহ্যিক আরেকটি মূল সমস্যা এই ছিলো যে, দেশ-বিদেশের উলামাগণ তাদেরকে সমর্থন করেনি। হ্যাঁ আমরা দাবি করবো, উলামাদের জিহাদে বের না হওয়া এবং মুজাহিদদের সাপোর্ট না করাই এর বড় কারণ ছিলো। ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত, আধা-পণ্ডিত এবং অজ্ঞরা তাদের জায়গা দখল করে নেয়। ”

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

“আমি মনে করি- আলজেরিয়ান জিহাদের আসল সমস্যা ছিলো সাধারণ মানুষের অতি-উৎসাহ, যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর এবং শরীয়াহর সঙ্গে অপরিচিত। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা ও ফিকহশাস্ত্র না বুঝে এবং মুতাশাবাহাতের মধ্যে পার্থক্য না করে শুধু ধর্মীয় বই মুখস্থ করে সাফল্য আনা যায় না। এজন্যই বিপুল সংখ্যক মুজাহিদীন খারিজীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। আর এটা আমি তাদের কাছ থেকে শুনি, যারা GIA থেকে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ”

শাইখ আবু আকরাম বলেন-

“জিহাদে যোগদানকারী যুবকদের একটি বড় অংশ এমন ছিলো, যারা সবেমাত্র কিছু দিন হলো, ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে। ফলে ইসলামের নীতিমালা ও বিধি-নিষেধের ব্যাপারে তাদের গভীর কোনো ধারণা ছিলো না। ”

শাইখ আবু মুসআব আস-সূরী বলেন-

“জিহাদের ময়দানে অধিকাংশ ভুল-ভ্রান্তি শুধু যোগ্য উলামায়ে কিরাম এবং অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের অভাবের কারণেই হয়ে থাকে। উমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন-

ولله الأمر من قوة الجاهل وعجز الثقة

অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা জাহিলদের শক্তি বৃদ্ধি এবং ভালো লোকদের দুর্বলতা দ্বারা মানুষদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। ”

আমীর-উমারা ও উলামায়ে-কিরামের মাঝে দূরত্ব

আসলে 'আমীর-উমারা ও উলামায়ে-কিরামের মাঝে দূরত্ব'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-জিহাদকে শরীয়াহ থেকে আলাদা করা। অথচ জিহাদ তো সেটাই, যা শরীয়ার আলোকে সম্পাদিত হয়। শরীয়াহ থেকে বিচ্ছিন্নতা জিহাদকে পার্থিব যুদ্ধে পরিণত করে। এই বিষয়টি তখনই ঘটে:

• যখন উলামায়ে-কিরাম আমীরদের কোনো ভুলের সমালোচনা কিংবা সংশোধন করতে যান, তখন আমীরগণ তাদের কথা মানার পরিবর্তে, কেবল তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন এবং স্বেচ্ছাচারিতার পথে অবাধে বিচরণ করার সুবিধার্থে সত্যপথের অনুসারী উলামায়ে-কিরামকে হয়তো নির্বাসনে পাঠান বা হত্যা করে ফেলেন।

• অতঃপর যখন সাধারণ মুজাহিদীনের সামনে তাদের জঘন্য কৃতকর্মের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা আধা-শিক্ষিত, অপরিপক্ক এবং অনভিজ্ঞ যুবকদেরকে আলেম হিসেবে দেখানোর পায়তারা করে এবং তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেয়।

• তারপর এই ধরনের আধা-মোল্লারা জনপ্রিয় হওয়ার অভিলাষে এমনসব ফতোয়া জারী করে, যার মাঝে এক বিরল ধরনের সীমালঙ্ঘন ও উগ্রতা থাকে।

• অবশেষে এধরনের অর্ধশিক্ষিত জাহিলরা হকপন্থি উলামায়ে-কিরামকে গুমরাহ তথা বিপথগামী, বিদআতী বা কাফির ইত্যাদি বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়।

চরমপন্থা ও খারিজী চিন্তাধারা

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“[ব্যর্থতার কারণসমূহের অন্যতম একটি কারণ এটাও যে,] সীমালঙ্ঘন এবং অযাচিত চরমপন্থার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়া। যার উপাদানসমূহ ছিলো নিম্নরূপ:

• খোদ জাতির মেজাজেই উগ্রতা থাকা।

• জিহাদের ময়দানে কেবল বাহাদুরি ও সাহসিকতা প্রদর্শনকে শ্রেষ্ঠত্বের মান হিসাবে ঘোষণা করা।

• উগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে আপোষ করে এর বিকাশের সুযোগ প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত।"

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"তাদের মাঝে ফিকহ তথা আইনশাস্ত্র, শরীয়াহ, সুন্নাহ, বিদআত, কুফর ও ঈমান, উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনি জামাআতগুলোর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা বলবৎ ছিলো। "

"১৯৯৬সালে তো GIA-এর মাঝে চরমপন্থা আরও বেশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এমনকি তারা সাধারণ মানুষকে তাকফীর করে তাদের জান-মাল এবং ইজ্জতকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নেয়। ফলে নিঃসন্দেহে তারা খারিজীতে পরিণত হয়।"

ইরজা নিজেই চরমপন্থার রসদ

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

"ইনসাফের সঙ্গে বললে বলতে হয় যে, গুমরাহী ও ফিতনার দায় কেবল চরমপন্থিদের উপরই বর্তায় না। বরং চরমপন্থার বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো- দ্বীনি ব্যাপারে ইরজাগ্রস্ত লোকদের উপস্থিতি। ইরজা চরমপন্থা প্রতিপালনের এক বিরাট হাতিয়ার। তবে এর বিপরীতটাও ঠিক অর্থাৎ চরমপন্থা নিজেও ইরজা-এর রসদ।

GIA-তে আরও একটি গ্রুপ ছিলো, যারা জিহাদের উপর তাদের মতাদর্শ চাপানোর চেষ্টা করতো। তারা জাযআরাহ নামে পরিচিত ছিলো এবং তারা শাইখ মুহাম্মদ আস-সাঈদের অনুসারী ছিলো। তারা দ্বীনি বিষয়াদিতে শিথিলতা করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য তাগুত-মুরতাদদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করে। [এব্যাপারে শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর অবস্থান আগেই বলা হয়েছে যে, শাইখ মুহাম্মদ আস-সাঈদের সকল অনুসারী সম্পর্কে এটা বলা ঠিক নয়। কেননা, তাদের মধ্যে সৎ এবং নেককার মানুষও ছিলেন। বাকী একটি সাধারণ মাসআলা হতে পারে যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি তাদের কিছুটা নমনীয়তা রয়েছে, যা সবসময় আপত্তিকর নয়]।

অন্যদিকে সালভেশন ফোর্সও বিদ্যমান ছিলো। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা নিজেরাই ঘোষণা দেয় যে, নির্বাচন ও সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার করা। যদিও তারা পাহাড়ে অস্ত্র তুলে রাখতো, তবুও তাদের হৃদয় নিজেদের সদ্য অবলুপ্ত দল সালভেশন ফ্রন্ট ও তাদের গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জুড়েই ছিলো। এই জন্য দলটি তাগুতের পক্ষ থেকে আলোচনা প্রস্তাবের প্রথম ইশারাতেই সাড়া দেয় এবং আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা শুরু করে দেয়। এমনকি একপক্ষীয় সাময়িক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

একইভাবে আমরা দরবারি উলামাদের পক্ষ থেকে নির্বিচারে চালানো আক্রমণ থেকেও দৃষ্টি ফিরাতে পারি না। তারা ফতোয়ার বন্যা বইয়ে দেয়। যে ফতোয়ার মাধ্যমে তারা মুজাহিদীনে কিরামকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাগুতের সামনে আত্মসমর্পণ করাকে আবশ্যক বলে ঘোষণা প্রদান করে। এভাবে এই ভ্রান্ত ফতোয়ার কারণেও অনেক দুর্বল মুজাহিদীনের পা পিছলে যায়।

আলজেরিয়ার জিহাদে তিনদিক থেকে আক্রমণ এসেছে। ধূর্ত কাফিরগোষ্ঠী, ইরজাগ্রস্ত দরবারি উলামা এবং মুজাহিদদের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা সীমালঙ্ঘনকারী খারিজীগোষ্ঠী। তাদের কারণে মুবারক এই জিহাদ বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে সত্যপন্থিদেরকে অটল-অবিচল রাখেন। আজও খারিজী ও মুরজিয়াগোষ্ঠী জিহাদ-আগ্রহীদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার দৃষ্টিতে আলজেরিয়ার জিহাদে মূল বিষয় জনসাধারণের বল্গাহীন আবেগ, যাদের অধিকাংশই শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে এবং শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। জাগতিক নিয়ম-কানুন না জেনে, বাস্তব জ্ঞান অর্জন ব্যতীত এবং ধোঁয়াশাপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য-জ্ঞান অর্জন না করেই কেবল ধর্মীয় বই পুস্তক মুখস্থ করার দ্বারা কখনও সাফল্য আসতে পারে না। এ কারণেই মুজাহিদদের বড় অংশ খারিজি চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তারা হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারেনি। ঐপথ থেকে তওবা করে যারা আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হন তাদের কাছেই আমি এমনটি শুনি। ”

GIA-এর শারঈ ভ্রান্তিসমূহ

ইমারতে হারবকে ইমারতে উমূমী বিবেচনা করা

ইমারতে হারব (যুদ্ধের নেতৃত্ব) আর ইমারতে উমূমী (সাধারণ নেতৃত্ব)-এর মাঝে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য না রাখলে বহুধরনের সমস্যা হতে পারে।

ইমারতে হরব হলো-জিহাদের ফরজিয়্যাত আদায় করার জন্য জিহাদের গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করনার্থে সকলের জন্য একজন আমীর নির্ধারণ করা। এর পরিধি সাধারণ ইমারতের চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত। আর ইমারতে উমূমী হলো-যা মুসলমানরা কোনো ভূখণ্ডে বিজয় অর্জনের পর রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কায়িম করে থাকে।

GIA-এর লোকেরা তাদের ইমারাহকে (যা ছিলো মূলত ইমারতে জিহাদ বা ইমারতে হারব) ইমারতে আম সাব্যস্ত করে; তার জন্য ইমারতে আম-এর বিধি-বিধান প্রয়োগ করা শুরু করল। যার ফলে অনেক ধরনের সমস্যার তৈরি হয়। যেমন-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো, হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। ইমারতে আম থেকে যে বেরিয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে বাগী বলা হয়। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাকে হত্যা করা বৈধ। কিন্তু ইমারতে জিহাদ থেকে যে বের হয়, তাকে বাগী বলা হয় না। তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।

নিজের দলকে একমাত্র ঠিক দল বিবেচনা করা

জিহাদে সাময়িক তামকীন এবং বিজয় লাভের ফলে একদিকে মুজাহিদীন তাদের ইমারতকে, আম ইমারত হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অহংকার ও গর্ববোধ তৈরি হতে থাকে। ফলস্বরূপ তারা তাদের দলকে একমাত্র ঠিক দল হিসেবে বিবেচনা করতো এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এভাবেই তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে সহযোগিতার সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

প্রত্যেক মুজাহিদের উপর তাদের বাইয়াতকে বাধ্যতামূলক করা

আলজেরিয়ায় জিহাদের সূচনাতে মুজাহিদীন আফগানিস্তানের জিহাদের ভুল-ত্রুটি থেকে নিজেদের রক্ষা করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কেবল একটি দল গঠন

করবেন। এরপর আলজেরিয়ার জিহাদে যোগ দিতে আসা সমস্ত মুজাহিদকে সেই এক জামাআতের বাইআত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে দেয়া হবে। এই ব্যাপারে তাদের অবস্থান ঠিক এই কারণে ছিলো না যে, তারা বাইআত এজন্য আবশ্যক করছে যে, তাদের ইমারত সাধারণ ইমারত অথবা তারাই একমাত্র ঠিক দল, তাদের উদ্দেশ্য কখনোই এমন ছিলো না। কিন্তু যারা পরবর্তীতে এসেছিলো তারা এই ভিত্তিতে বাইআত আবশ্যক করে যে, তাদের ইমারাত সাধারণ ইমারত এবং তারাই একমাত্র ঠিক দল। এভাবেই একদিকে অন্য জামাআতগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে তাদের মধ্য থেকে যে কেউ বেরিয়ে যেতো, তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে হত্যা করে দেয়া হতো যে, সে কৃত বাইআত ভঙ্গ করেছে বা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা [বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা]-এর ভুল মানদণ্ড

কাফিরদের সঙ্গে সবধরনের ওয়ালা তথা বন্ধুত্ব, সাহায্য ও সমর্থনকে সমান বিবেচনা করা অর্থাৎ কুফর মনে করা তাদের পন্থা ছিলো। এমনকি তারা এটাও মনে করতো যে, যারা এমন ধরনের লোকদের সঙ্গে শুধু পারস্পরিক আচরণ প্রদর্শন করবে, তাদেরকেও হত্যা করা বৈধ। অর্থাৎ যাদেরকে বিদ্রোহী, ফাসিক, বিদআতী, মুরতাদ অথবা কাফির ইত্যাদি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর সমর্থনে তাদের দলীল ছিলো এই যে, পারস্পরিক আচরণও একপ্রকার নুসরত তথা সাহায্য-সহযোগিতা।

সুন্নতের ভুল মানদণ্ড

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“তাদের অতিরঞ্জন এই পর্যন্ত পৌঁছায় যে, পুরো শরীয়াহ তাদের কাছে মাত্র তিনটি কথার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়-অমুক বিষয় সুন্নাত, অমুক বিষয় বিদআত এবং অমুক বিষয় নিষিদ্ধ। অতএব, যদি কেউ বলে যে, অমুক বিষয় মাকরুহ বা মুস্তাহাব, তাহলে সে নিন্দিত হতো।

বেশিরভাগ বিষয়াদি তাদের কাছে 'সুন্নাহ' হয়ে যায়। আর তারা সকল সুন্নাহকে ফরয ও ওয়াজিবের পদমর্যাদায় স্থান দিলো। আর এই ভিত্তিতেই তারা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা তৈরি করে এবং জনগণের মাঝে শ্রেণি বিন্যাস করে।

কখনও কখনও কিছু মানুষ ফরজের মধ্যে অলসতা করতো, কিন্তু যেহেতু তাদের দৃষ্টিতে তারা সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলো, তাই তারা তাদেরকে ভালো মনে করতো। শরীয়ত স্বীকৃত তাকওয়া, সততা, ঈমান ও এহসান ইত্যাদি গুণাবলী দিয়ে কারও প্রশংসা করার পরিবর্তে তাদের নিকট তার প্রশংসা করার জন্য শুধু দু'টি শব্দকেই যথেষ্ট মনে করা হতো;আর তা হলো-'সে সুন্নাহকে পছন্দ করে', কিন্তু বাস্তবে সে সুন্নাহকে পছন্দ করে না। এবং 'সে একজন সালাফী', কিন্তু বাস্তবে সে সালাফী নয়। এছাড়াও তাদের নিকট সুন্নাহর উপর আমল না করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, সে বিদআতে লিপ্ত। ”

তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

তাদের অন্যতম একটি গুমরাহী এই যে, তারা একজন মুসলিমকে ফাসিক, বিদআতী বা কাফির ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে শারঈ মূলনীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো না। তারা তাদের প্রত্যেক বিরোধীকে বিদআতী আখ্যা দিয়ে হত্যা করতো। এমনিভাবে তারা প্রত্যেক বিদআতীকে তাকফীর করতো। এরপর মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করতো।

এমনকি তারা সকল জনসাধারণকে শুধু ভোট দেওয়ার কারণে কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের রক্ত, সম্মান ও সম্পদকে হালাল হিসেবে ঘোষণা করতো। অতঃপর তাদের মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্তান এবং মহিলাদেরকেও মুরতাদ হিসেবে ঘোষণা করা হতো। তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যা দেয়ার পর হয়তো দাস-দাসী বানানো হতো অথবা হত্যা করা হতো।

হত্যার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

প্রকৃত মুজাহিদীনের নিকট শাহাদাত লাভের প্রত্যাশায় কিংবা বিজয়ের চেতনায় কতল হওয়া (মারা যাওয়া) বা কতল করা (মেরে ফেলা) একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর সঙ্গে যদি একজন মানুষের প্রাণের মূল্য এবং তাকে কতল করার অধিকার তার আছে কি নেই? এই পার্থক্য করার বিষয়টি মাথায় উপস্থিত না থাকে, তাহলে তার এই হত্যাকাণ্ডের মাঝে ধীরতা ও স্থিরতা চলে আসবে। GIA-এর পদ্ধতি ছিলো পূর্বোক্ত সকল সমস্যার সমাধান অবশেষে হত্যার মাধ্যমে নিরসন করা। যার মাঝে নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিলো:

• মাসলাহাত, বিদ্রোহ, শাস্তি এবং সন্দেহের নামে হত্যা।

• কোনো ধরনের রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান ছাড়াই একটি সাধারণ আদেশ বলে মাসলাহাত ও রাজনীতির ভিত্তিতে হত্যার যৌক্তিকতা বিবেচনা করা, এই স্লোগানের অধীনে যে, 'যার খারাপ তাকে হত্যা করা ব্যতীত প্রতিহত করা যায় না, তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। '

• তদন্ত ও বিচার ছাড়াই নিছক সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে হত্যা করা।

• ইমারতকে সাধারণ বলে ধরে নিয়ে প্রত্যেক দলত্যাগকারী ব্যক্তিকে বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে হত্যা করা।

• বিদ্রোহীদেরকে হত্যার পর মুছলা করা তথা নাক-কান কেটে ফেলা ও ক্ষত-বিক্ষত করার মাধ্যমে আকৃতি বিকৃত করে ফেলা এবং একে সুন্নাহ বলা।

• প্রত্যেক সুন্নাহকে ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করা এবং যে তা পরিত্যাগ করে তাকে বিদআতী হিসেবে ঘোষণা করা। এমনিভাবে তাকে বিদআতী আখ্যা দিয়ে শাস্তি দেয়া, যাতে হত্যা করাও শামিল ছিলো ।

• পরবর্তীতে প্রত্যেক বিদআতকে বিদআতে মুকাফফিরা (অর্থাৎ যে বিদআত করল, সে কাফির হয়ে গেল) ঘোষণা করে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা।

• শারঈ মূলনীতি অনুসরণ করা ছাড়াই কারও উপর তাকফীরের হুকুম লাগিয়ে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা।

• যে সকল সদস্যদের ব্যাপারে সন্দেহ জাগে, তাদেরকেও হত্যা করা।

• এমনকি শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ না করা।

• মুসলিম নারীদেরকে দাসী বানিয়ে তাদের দ্বারা যৌনচাহিদা পূরণের পর হত্যা করা।

• শত্রুর হাতে পড়ার ভয়ে নিজের সন্তান ও স্ত্রীকে পরামর্শানুযায়ী হত্যা করা।

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“শেষ পর্যন্ত তারা একটি লজ্জাজনক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। তাদের মধ্যে শয়তানি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ একে অন্যকে ফাঁদে ফেলা। একে অপরের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি

করা। উদাহারণস্বরূপ-একজন ব্যক্তি তার নিজের বন্ধু, প্রতিবেশী বা মহল্লার কারও সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের কাছে অভিযোগ করে বলবে যে, এই ব্যক্তি (হতে পারে তা দুই বছর আগের কোনো ব্যাপার) গোড়ালির উপরে পায়জামা পরিধান করে না। অথবা অন্য কোনোদিন বললো যে, অমুক ব্যক্তি বিদআতী ও গুমরাহ দলের সঙ্গে জড়িত, অথচ সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। অথবা বললো যে, আমি তার সম্পর্কে জানি-সে সুন্নাহকে ঘৃণা করে।

অবশেষে এ সকল ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে আমীর তাকে হত্যা করতো। এই ধরনের ব্যাপারগুলো বয়ান করে বুঝানো কঠিন। আর যারা সেই ভয়াবহ অবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করেননি, তাদের জন্য এ সকল ঘটনাবলী বিশ্বাস করা আরও কঠিন।

যাই হোক! এমনি ছিলো GIA-এর নেতৃত্বের করুণ অবস্থা। তো যখন নেতৃত্বের অবস্থাই এমন মারাত্মক পর্যায়ের ছিলো, তখন এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণ জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। ”

GIA-এর রাজনীতিক ভ্রান্তিসমূহ

অসৎকাজে বারণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন

ধুমপান, টিভি, গোড়ালির নিচে কাপড় পরা এবং পর্দা না করার মত ইত্যাদি গুনাহের কাজে বারণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। কিন্তু সে ক্ষেত্রে GIA-এর লোকেরা যে কঠোরতা অবলম্বন করেছে, তা ছিলো শরীয়তের গণ্ডির অনেক উপরে।

অকাল আদেশের প্রয়োগ

GIA শক্তিশালীও ছিলো এবং তার ব্যাপক জনসমর্থনও ছিলো। শাইখ আবু আবদুল্লাহ আহমদের সময়ে, অনেকগুলো এলাকায় তামকীনও ছিলো। এই কারণে জামাআত শরীয়াহর এমন অনেক হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করতে শুরু করে, যার জন্য আরও সময় নেয়ার প্রয়োজন ছিলো। যেগুলো প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ছিলো পূর্ণাঙ্গ তামকীন অর্জনের সময়। এমনিভাবে জনগণের নিখুঁত আনুগত্যের সময়।

জনগণের অর্থনীতির ক্ষতি

তারা এমন কিছু পদক্ষেপও নেয়, যা শত্রুর বদলে সাধারণ মুসলমানদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। এর একটি বড় উদাহরণ হলো-ফরাসি পণ্য বর্জন করা। শুরুর দিকে জনসাধারণকে ফরাসি বড় বড় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি, যেমন- রোনো, বেজো এবং সিট্রোয়ানকে বয়কট করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বয়কটটির পরিধি বাড়িয়ে ফ্রান্স থেকে আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল আইটেমগুলোতে সম্প্রসারিত করা হয়, যা ছিলো সমাজের অন্যতম মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর যদি কোনো ব্যবসায়ী বয়কটের নির্দেশনাবলীর বিরোধিতা করতো, তাহলে তার থেকে আমদানিকৃত পণ্যগুলি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হতো। এর দ্বারা ফরাসি অর্থনীতির তেমন কোনো ক্ষতি না হলেও জনগণের ক্ষতি হতো সুনিশ্চিত। ফলে জনগণ তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল হতে থাকে।

অজ্ঞতাসূলভ প্রশাসনিক নির্দেশাবলী

আপাতদৃষ্টিতে মুজাহিদীন ও জনগণের উন্নতির জন্য এমন সব প্রশাসনিক নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা হয়, যা উপকারের পরিবর্তে উল্টো ক্ষতি সাধন করছিলো। পাশাপাশি ক্ষতিকর দিকগুলি দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি পরিবর্তন করা হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পেট্রোলের দাম ফিক্সড (নির্ধারণ) করে দেয়া হয়। কিন্তু এর ফলে ব্যবসায়ীদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা? তা কখনোই খতিয়ে দেখা হয়নি। ফলে পেট্রোল বিক্রেতারা তাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলো। যদি কেউ এর বিরোধিতা করতো, তবে তার পেট্রোল পাম্পে অভিযান চালিয়ে ভাংচুর করে তাকে সর্বশান্ত করে দেয়া হতো।

মুজাহিদীনের পরিচয় শনাক্ত করার স্বার্থে আইডিকার্ড বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ কার্যকর করা হয়। কিন্তু এর দ্বারা সরকারি এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচলকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

মন্দ পদ্ধতিতে নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন

তাছাড়া এ সকল নির্দেশাবলী কার্যকর করার পদ্ধতিও অত্যন্ত মন্দ ছিলো। এই কাজের জন্য অজ্ঞ-অবুঝ, বদমেজাজ এবং রাগচটা মুজাহিদ নিযুক্ত করা হতো। যারা নিজেরাই ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে খুব কম জানতো।

GIA-এর আখলাকী মন্দসমূহ

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"ব্যর্থতার কারণগুলোর মাঝে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ ছিলো, তাদের খারাপ আচরণ। মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কঠোরতা, উগ্রতা ও আমিত্বভাব পাওয়া যেতো। তারা কখনও ভুল ক্ষমা করতে জানতো না। সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত লোকদের সঙ্গে বেয়াদবীমূলক আচরণ করতো। এছাড়াও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলো। যেমন-অহংকার, হিংসা, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রভৃতি।

তারা বলতো যে, জিহাদে সহানুভূতির কাজ কী? জিহাদে কোনো সহানুভুতি নেই। তারা 'জাযআরাহ' গ্রুপের লোকদের নিন্দা করে বলতো যে, এরা হলো আবেগপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। কারণ তারা ছিলো মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও রহমদিলওয়ালা। এর বিপরীতে GIA-এর লোকদের মাঝে দেশ-জাতি ও জনগণের প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিলো না। তাই যারা মানুষের মনতুষ্টির কথা বলতো, তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতো। "

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

"GIA-এর নেতৃবৃন্দ দ্বীনি বিষয়ে চরমপন্থার দোষে দুষ্ট ছিলো। এর অনেকগুলো উল্লেখ্যযোগ্য কারণ ছিলো। বিশেষ করে তাদের মাঝে শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞতা, কুরআন ও সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা, সেই সঙ্গে অহংকার, গর্ব, কঠোরতা, অন্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং মতবিরোধের শিষ্টাচার সম্পর্কে অজ্ঞতার মতো মন্দ বিষয়াবলী বিদ্যমান ছিলো। "

"অজ্ঞ মুজাহিদীন এমনসব মন্দ পদক্ষেপ নেয় যে, যার দ্বারা জনসাধারণ মুজাহিদীনকে ঘৃণা করতে শুরু করে। তাদের উপর কঠোর আর্থিক শাস্তি আরোপ করা হয়, গোয়েন্দা সন্দেহে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়, স্ব-জাতির সামনে

তাদেরকে মুছলা তথা নাক-কান কাটা, ক্ষত-বিক্ষত করার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়, সাধারণ জনগণের সামনে জাতির নেতৃবৃন্দকে অপমানিত করা হয়, তামাক ব্যবহারে হদের অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করা হয়। রাতের বেলা বাড়িতে-বাড়িতে অভিযান চালান হয় এবং পরিবারের সদস্যদের ভয়-ভীতি দেখানো হয়, কোনো বিনিময় ছাড়াই জোরপূর্বক মানুষের গাড়ি নিয়ে যেতো। এছাড়া আরও বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়াতো, যার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ।

এই জাতীয় অপরাধ GIA-এর গুমরাহীর পূর্ব থেকেই চালু ছিলো। যদিও গুমরাহীর পর ব্যাপারটা সমপূর্ণ ভিন্ন রকম ছিলো। উদাহরণস্বরূপ-জনগণকে মুরতাদ ঘোষণা করা হয়, তাদের সম্পদ, জীবন ও সম্মান লুণ্ঠন করাকে নিজেদের জন্য বৈধ মনে করা হয়, গণহত্যা চালানো, মুসলিম নারীদেরকে দাসী বানানো হয়, এমনকি মুসলিম শিশু এবং বৃদ্ধদেরও হত্যা করা হয়। ”

শত্রুর কূট-কৌশলসমূহ

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“এটা ঠিক যে, ইন্টেলিজেন্সও এক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এসব কিছুই ইন্টেলিজেন্স করেছে। বিষয়টা এমনই যেমন কেউ বললো যে, শত্রু এই জন্যই জিতেছে যে, সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। তাহলে কি শত্রুর কাজ ধোঁকা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু হয়? ওহে চরমপন্থি গুমরাহ দল! তোমরা যদি ঠিক পথের দিশারী হতে, তাহলে ইন্টেলিজেন্স কখনও তোমাদের মাঝে প্রবেশ করতে পারতো না। ”

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“এমনকি তাদের কাজের কারণে তাগুতরা শ্বাস নেয়ার সুযোগ পায়, অথচ মুজাহিদদের গ্রহণ যোগ্যতার কারণে সরকার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কথা ছিলো। GIA-এর এই অপকর্মগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা করে। একদিকে তারা মুজাহিদীনের চেহারা বিকৃত করে দেয়, অন্যদিকে তারা জনগণকে মুজাহিদদের শত্রু বানিয়ে ফেলে। তারপর জনগণকে সশস্ত্র করে তাদের মাধ্যমেই মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তৃতীয় দিকে যারা এই জাহান্নাম থেকে পালাতে চাচ্ছিলো, তারা তাদের জন্য আত্মসমর্পণের দরজা খুলে দেয়।

ফলস্বরূপ আলজেরিয়ার সরকারের আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, যা দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করে নেয় এবং তাদেরকে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। সাবেক রাষ্ট্রপতি আহমেদ আবু ইয়াহিয়া ২০০৪সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একটি বক্তৃতায় বলেন যে, 'আমরা যদি এই আর্থনীতিক উন্নয়নকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে আমরা কিছুই করতে পারিনি। '

সরকার এই যুদ্ধের উপর একটি রাজনীতিক আলখেল্লা পরাতে সফল হয়ে যায়। সরকার ইসলামী বাহিনীর আত্মসমর্পণকে এমনভাবে উপস্থাপন করলো যে, যেনো জিহাদ শুরু করার পূর্বে সমগ্র ইসলামী রাজনীতিক বিপ্লব এবং শরীয়াহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ভুল ছিলো।

সরকার নিজেও শরীয়াহর আলখেল্লা পরার আপ্রাণ প্রয়াস চালায়। এমনকি শত শত দাঈ এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের আলজেরিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানায়। যাতে সাধারণ জনগণের সামনে প্রমাণ করতে পারে যে, সন্ত্রাসীদের (মুজাহিদদের) যুদ্ধ করা ভুল ছিলো, গুমরাহীপূর্ণ ও নিষ্ফল ছিলো। সরকারের এমন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঐ সময়ের মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ দাঈ মুহাম্মদ হাসসান ও আয়েজ আল-করনী আলজেরিয়ায় বেশ কয়েকবার সফর করেন। তারা জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে থাকতে ও মুজাহিদদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার পরামর্শ দেয়। এছাড়াও ১০০জনের বেশি উলামার স্বাক্ষরিত ফতোয়া দেশব্যাপী প্রচার করা হয়।

সরকার জনগণের সঙ্গে 'গাজর ও লাঠি' (Carrot & Stick)-এর রাজনীতি প্রয়োগ করেছিলো। যে কেউ মুজাহিদীনের সঙ্গে সামান্যতম পারস্পরিক লেনদেন করত, তখন তার উপর কঠোরতম শাস্তি আরোপ করা হতো। এর বিপরীতে যে কেউ তুলনামূলকভাবে যতো ছোটো তথ্যই সরকারকে প্রদান করুন না কেন, তখন তার জন্য বড় পুরস্কার প্রস্তুত থাকতো। এমনকি কোনো একজন মুজাহিদকে হত্যার কাজে সহযোগিতা করার বিনিময়ে ৫০০মিলিয়ন নগদ অর্থ এবং একটি ঘর প্রদান করা হতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ফলাফল

জনসমর্থন হারিয়ে ফেলা

মুজাহিদ আবু আকরম বলেন-

“শুরুতে মুজাহিদদের বিপুল পরিমাণ জনসমর্থন ছিলো। সাধারণ জনগণ মুজাহিদদের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি বিলিয়ে দিতো। মুজাহিদদের দিবারাত্র পাহারা দিতো। তাদের খানা খাওয়াতো। তাদের কাপড়চোপড় ধুয়ে দিতো। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করে দিতো। নিজেদের শিকারের গুলি-বন্দুক মুজাহিদদের দিয়ে দিতো। সাধারণ জনগণ নিজেদের বাহন মুজাহিদদের দিতো। শত্রুর খবরাখবর সম্পর্কে মুজাহিদদের অবগত করতো। তাই শুরুতে মুজাহিদীনও তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হচ্ছিলো। ”

“কিন্তু জনগণের উপর ভ্রষ্ট সম্প্রদায় (GIA) যে নির্যাতন করে, তা ভুলার মতো না। গেরিলা যোদ্ধাদের মূলশক্তি হচ্ছে জনসমর্থন। আর GIA-এর কৃতকর্মের কারণে এ জনসমর্থন প্রায় শেষ হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধ যতোই দীর্ঘ হয়, লোকজন ততোই বিরক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে আলজেরিয়া জিহাদের ২৫বছর হতে চলেছে। ”

শাইখ আবু মুসআব আস-সূরী বলেন-

“গেরিলা যুদ্ধ ও জিহাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে জনসমর্থন। শত্রু জনসমর্থন হ্রাস করার জন্যে মুজাহিদদের ভুলগুলোকে কাজে লাগায়। তাকফীর, মারামারি, উগ্র মেজাজ আর মূর্খতার কালিমা লেপন করে মুজাহিদদেরকে ঘৃণিত করে তোলা হচ্ছে তাগুতী রাষ্ট্রযন্ত্রের সফল পলিটিক্স। যাতে উম্মাহকে মুজাহিদদের থেকে পৃথক করা যায়।

এভাবে আলজেরিয়ার জনগণ একদিকে ভ্রষ্ট মুজাহিদীন, অপরদিকে জালিম-মুরতাদ সরকারের ফাঁদে আটকা পড়ে। জালিম-মুরতাদ শাসক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অজুহাতে জনসাধারণকে সবধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন করে যেতো। আর তা অত্যন্ত সুকৌশলে সূক্ষ্মভাবে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে চালিয়ে দিতো। ”

জিহাদ সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“এই ভ্রষ্টতা আলজেরিয়ায় জঘন্য প্রভাব ফেলে, অন্যান্য দেশে আলজেরিয়া অপেক্ষা কম। তবে আল্লাহর বিশেষ এক রহমত, মুসলিমবিশ্ব এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে সরকারের পক্ষ থেকে হয়েছে বলে অনুমান করেছে।

এই ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ করে সেই সব মুজাহিদদের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, যারা এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন। (তাদের অবস্থা ভিন্ন, যারা এই সকল পরিস্থিতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেনি।)

তাদের একটু সময়ের প্রয়োজন, যাতে তারা এই ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে পারে। আলজেরিয়াবাসীদের জন্য এতো বড়ো একটা বিপর্যয়ের পরে একটু উত্তম সময়প্রয়োজন, যাতে তাদের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে, তা কেটে যায় এবং দ্বিতীয়বারের মতো যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী দেয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, তারা আরেকবার বিপ্লব এবং জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে যায়।

মুজাহিদীনকে ধৈর্য ও আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রেখে জিহাদে দৃঢ়পদ থাকা চাই। জিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করুন। সামাজিক জ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান শিখুন, যাতে বিপর্যয়ের সময় তা আপনার সহযোগী হয়। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং বিজয়ের আশা রাখুন। ”

মুজাহিদ আবু আকরাম বলেন-

“বর্তমানে অনেক এলাকা মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কারণ GIAসম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ির ফলাফল এখনো তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। এখনও এমন মুজাহিদীন আছেন, যারা লাঞ্ছনার উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়। তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় কোনো অনুতপ্ত নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ গভীর চিন্তা-ভাবনা করার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

জনগণ জিহাদের সমর্থন কেন করবে?

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“আলজেরিয়ার সাধারণ জনগণের বড়ো একটা অংশ এটা বিশ্বাস করে যে, শাসকবর্গ কাফির, ধর্মনিরপেক্ষ, ঈমানহীন ও শরীয়তের শত্রু এবং দুর্নীতিবাজ। কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, জনগণ সরকারকে উৎখাত করতে এবং জিহাদের ফায়দা ভোগ করতে কতটুকু আগ্রহী? বিশেষ করে যখন তারা পূর্বে একটা ধাক্কা খেয়েছে।

যদিও জিহাদ শুরু হওয়ার পূর্বে জনগণ জিহাদের ফায়দা ভোগ করতে খুব আশাবাদী ছিলো। কিন্তু তারা যতটুকু আশাবাদী ছিলো, বিপর্যয়ের পর ততটুকু তারা নৈরাশ হয়ে গেছে। এমনকি কতক লোক তো এমন মনে করে বসেছে যে, সরকার যদিও কাফির-মুরতাদ এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তারপরও তা ভয়াবহ গণহত্যা এবং বাড়াবাড়ি থেকে অনেক উত্তম।

আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, সাধারণ জনগণের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন, নিরাপত্তা এবং সামাজিক উন্নয়ন;তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ধর্মীয় কাজ তাদের কাছে দ্বিতীয় অপশনে। তাই সাধারণ জনগণের সঙ্গে চলতে অবশ্যই আমাদেরকে পলিটিক্যাল করে চলতে হবে। তাদেরকে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে উত্তেজিত করতে হবে। পরিশেষে যেন তারা বিভিন্ন কারণে ইসলাম এবং জিহাদের কাছাকাছি চলে আসে। সবাই আমাদের মতো সরকারকে কাফির হিসেবে বিশ্বাস করুক;এমনটা জরুরীও না সম্ভবপরও নয়। এতোটুকুই যথেষ্ট যে, যখন আমরা সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বের হবো, তখন যেন সাধারণ জনগণ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান করে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের সঙ্গে থাকে। কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে এজন্য একত্রিত হবে যে, সরকার কাফির ও মুরতাদ। কেউ কেউ সরকারকে জালিম মনে করে, আবার কেউ সরকারকে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক মনে করে, আবার কেউ এমনই অন্যান্য কিছু কারণে একত্রিত হবে।

সাধারণ জনগণের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ আমাদেরকে সমর্থন করা, আমাদের জন্য খুব জরুরী। তারা আমাদেরকে ভালোবাসবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সমর্থন করবে। তারা যেন দুটো বিশ্বাস রাখে-আমরা ন্যায় ও ইনসাফ, রহমত ও ইহসানের বার্তা নিয়ে এসেছি। সমাজের মঙ্গল এবং উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তারা যেন আমাদের এটা না বলে,

إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿القصص: ١٩﴾[৫৮]

[৫৮] আপনি কেবল পৃথিবীতে একজন শক্তিশালী মানুষ হতে চান, আপনি সংস্কারক হতে চান না। (সূরা ক্বাসাস: ১৯)

নব্বইয়ের দশকে মুজাহিদীন সম্পর্কে আলজেরিয়াবাসীদের এরকমই অস্বাভাবিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। আমি না এর আগে কখনও এমনটা দেখেছি বা শুনেছি, না তারপরে। ”

মুজাহিদগণ কেন সফল হতে পারেন না?

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

এখন পর্যন্ত উম্মাহ বিজয়ের জন্য প্রস্তুত নয়

“মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে। নিজের উপর ফরয দায়িত্ব আদায় করছে। প্রত্যেক মুজাহিদীনই স্বীয় রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য জিহাদে শরীক হয়। নিজ রবের সম্মানার্থে তাঁর সমস্ত হুকুম-আহকামের সামনে নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। এবং শেষ দিবসের দিন জান্নাতের আশা রাখে।

যেদিন জালিমের কোনো ওজর কবুল করা হবে না, জালিমদের উপর অভিসম্পাত পতিত হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

আর এ সমস্ত মুজাহিদীনের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ তাদের কবুল করুন। তারাই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের সম্পর্কে শুধু তারাই কটুক্তি করতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন পর্যন্ত উম্মাহ কখনও একনিষ্ঠতার সঙ্গে মুজাহিদীনের সঙ্গ দেয়নি। আর যারা মুজাহিদীনের সঙ্গ দিয়েছে, বিপর্যয় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা মুজাহিদীনের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। অধিকাংশ মুসলমানই সবক্ষেত্রে, বিশেষত জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উলামা এবং ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুবই পিছিয়ে। এজন্যে বিজয় আসতে দেরি হলেও হতাশার কিছু নেই। এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার সুন্নত সবার জন্য সমান। কারও সঙ্গে বিশেষ আচরণ করা হবে না। ”

মুজাহিদগণ এখনও পর্যন্ত যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেননি

“জিহাদের স্রোত প্রবাহমান থাকবে। জিহাদে যোগদানকারী উম্মাহই বিজয় লাভ করবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি-তিনি যেন মুজাহিদীনকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তায়ফায়ে মানসূরাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচিয়েছেন এবং নিজেদের দ্বীনকেও রক্ষা করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হতে দেরি করলো বা সাহায্য করলো না বরং উল্টো করেছে, মুজাহিদদের বিরোধিতা করেছে, তাহলে সে পাক্কা অপরাধী।

মুজাহিদীন তো বিজয়ের প্রকারসমূহ থেকে কোনো একপ্রকারে বিজয়ী হবেনই।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ ۫ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ[৫৯].

আর যারা মুজাহিদীনের বিরোধিতা করেছে, তাদের সঙ্গে খিয়ানত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

ইসলামিক মাগরিবের দেশসমূহে জিহাদের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে এবং আজও চলমান আছে। তবে হ্যাঁ, কিছু কারণে মুজাহিদীন সেখানে পরাজিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যেমন-আমরা হতাশা-ভরা ভাষা নিয়ে পূর্বেই বলে এসেছি।

সম্ভবত বর্তমানে মুজাহিদীনের এতটুকুই যোগ্যতা বা কার্যক্ষমতা আছে। তাই তারা এতটুকুই অগ্রসর হচ্ছেন। ভবিষ্যতে আমরা যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরাও একই ফলাফলের উপযুক্ত হবো, ইনশাআল্লাহ।

﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً﴾ [النساء:٧٩][৬০]

---

[৫৯] আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের কোন একটির অপেক্ষা করছো; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমাণ। (সূরা আত-তাওবাহ্: ৫২)

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾[الشورى:٣٠][৬১]

আমরা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানী এবং তাঁর রহমত মাগফিরাতের প্রত্যাশী। আল্লাহ্ দরজাসমূহ উন্মুক্তকারী 'ফাত্তাহ' এবং সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত 'আলীম'।"

মুজাহিদীন হেরে যাওয়ার পরেও সফল

"মুজাহিদীনদের কোনো ধরনের লোকসান হয়না, চাই তারা পরাজিত হোক বা পরাস্ত। বরং তারা সর্বাবস্থায় বিজয়ী। কটূক্তিকারীরা কেন তাদের দোষারোপ করে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ক্রন্দন তো সেই করবে যে তাদের সঙ্গ দেয়নি এবং জিহাদের মত পবিত্র কাজ থেকে বঞ্চিত।

এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা যদিও পরাজিত হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়,

তথাপিও জিহাদ চলমান রাখার মাধ্যমে, জিহাদের উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে, ধারাবাহিক জিহাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা জারী রাখার মাধ্যমে...

প্রত্যেকবার নতুন রক্ত যোগ করার মাধ্যমে...

উম্মাহ্ এবং জিহাদী আন্দোলনের সাধারণ সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে...

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে...সর্বোপরি, এই জিহাদ এক পবিত্র ও গৌরবময় ইতিহাস।

এটাই কল্যাণ ও বরকত, সম্মান ও মর্যাদা। এটাই আশু বিজয়ের পথ। চাই তা যতোই দেরিতে অর্জিত হোক না কেন। বিজয় অর্জনে বিলম্ব এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাঁর নিখুঁত প্রজ্ঞা অনুযায়ী মাখলুকের পরীক্ষা নিবেন।"

মুজাহিদীন ইসলামপন্থিদের মুখোমুখি

শাইখ আবু মুসআব আস-সূরী বিশ্লেষণ করে বলেন-

---

[৬০] তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে, আর তোমার যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে। এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছি। আর (এ বিষয়ের)সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আন-নিসা: ৭৯)

[৬১] তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশ-শূরা: ৩০)

“যদি মুসলিম বিশ্বে ঠিক গণতন্ত্র থাকতো, তাহলে ইসলামপন্থিরাই ভোটে জয়ী হতো। মুসলিম বিশ্বের তাগুতি সরকারগুলিও সবচেয়ে মধ্যমপন্থি ইসলামিক দলকেও স্বাধীনভাবে কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয় না। পাছে আবার না তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। ইসলামপন্থি দলগুলো যতোই পশ্চিমা পূজারী হোক না কেন, আখেরে পশ্চিমারা তাদেরই শত্রুই থাকবে।

পক্ষান্তরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং তাঁর অনুসারীগণ যখন রাজনীতিক দল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মানহাজ হিসেবে নির্বাচন করলো। তখন থেকেই তারা সাংবিধানিক ক্ষমতায় যোগ দেয়ার পেছনে পড়লো। ফলে তারা জিহাদীধারার বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট তৈরি করতে বাধ্য হলো। পাশাপাশি শাসন ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ফ্রন্টে তারা পুরো শক্তি নিয়ে জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। এ সকল ইসলামপন্থিদের মুখোমুখি হওয়ার পর মুজাহিদীনে কিরাম অ-জিহাদী ইসলামী জাগরণ আন্দোলনের সামনে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো। এই ফ্রন্টের সূচনা আফগান জিহাদের সময় থেকে জিহাদী ময়দানে শুরু হয়েছিলো। যেখানেই জিহাদের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে একই সঙ্গে এই ফ্রন্টও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলো।

যদি জাবহাত আল-ইনকায (সালভেশন ফ্রন্ট)-এর নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের পরে খোমেনী বিপ্লবের মতোও বিপ্লব চালু রাখতো, তাহলে জিহাদের নামে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে, তার চেয়ে আরও অনেক কম রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে তারা নিজেদের যুবকদেরকে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করাতে পারতো, কিন্তু তারা এরকম করেনি।

পাশ্চাত্যে রাজনীতির ধরন এমন ছিলো, যেমনটা ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিত্রান ঘোষণা দিয়েছিলো:‘উগ্রপন্থি মুসলিমদেরকে মধ্যপন্থি মুসলিমদের মাধ্যমে ধ্বংস করো।’ এজন্য দেখা যায়, অনেক গণতান্ত্রিক এবং রাজনীতিক ইসলামিক দল নিজেদেরকে মধ্যপন্থি দাবি করে জিহাদী দলসমূহকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করেছে। যাতে পশ্চিমাদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়।

এই স্বার্থপর মধ্যপন্থি ইসলামী দলগুলো প্রত্যেক সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পর রাজনীতিক এবং মিডিয়া অঙ্গনে নেমে আসে, তারপর মুজাহিদীনের বিরোধিতা

করার মাধ্যমে অর্থ কালেকশন করে নিজেদের পকেট ভারি করে। নিজেরা আরামের জিন্দেগি যাপন করে, বিনিময়ে তারা ইসলামের সঙ্গে গাদ্দারী, মুনাফিকি এবং পশ্চিমাদের তোষামোদ করে। প্রতিটি সশস্ত্র আন্দোলনের পর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এই মধ্যমপন্থি ইসলামী দলগুলোর ন্যাক্কারজনক একটি মুসিবত এও রয়েছে যে, তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে আর জিহাদের তীব্র বিরোধিতা করে। অন্যদিকে ভ্রষ্ট এবং খারিজী মুজাহিদরা ঠিক মানহাজের মুজাহিদদেরকে মুরতাদদের কাতারে শামিল করে বসে।

পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক সিস্টেম কস্মিনকালেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় লাভের ঠিক পথ নয়। বরং ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো দাওয়াত এবং জিহাদের পথ।

আঞ্চলিক জিহাদ বনাম গ্লোবাল জিহাদ

শাইখ আবু মুসআব আস-সূরী বলেন-

"আঞ্চলিক জিহাদের যুগ শেষ। বর্তমানে কুফফার বিশ্ব যেভাবে জিহাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে যুদ্ধ করছে, আমাদেরও ঠিক সেভাবে জোটবদ্ধভাবে যুদ্ধ করতে হবে। কোনো মুসলিম দেশের জনগণ এই কথা বলতে পারে না যে, আমাদের দেশের জিহাদে অন্যান্যদেশের মুজাহিদীনরা যোগ দিতে আসবে না। আলজেরিয়ায় এই সমস্যাটা ছিলো। আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। "

আমাদের সবাইকে এক হতে হবে, যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মুজাহিদীনরাই শুধু না হয় বরং পুরো উম্মত ও পুরো উম্মাতের মুজাহিদীন তাতে শামিল হয়।

আঞ্চলিক শত্রু ও বৈশ্বিক শত্রুর মোকাবেলায় কার্যবিধির ভারসাম্যতা

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"আমার মনে হয় না যে, আলজেরিয়ার মুজাহিদদের রণকৌশল পরিবর্তন করা জরুরী। তারা স্থানীয় সরকার থেকে শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা করবে আর মূল

টার্গেটে রাখবে আমেরিকাকে। কিন্তু তারা তা না করে কয়েক বছর যাবত স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।

আমেরিকা তো এখন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁসে গেছে। আমেরিকা এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়া তো সামগ্রিকভাবে লাভজনক। সবচেয়ে বড় উপকার হলো এই যে, সমস্ত জিহাদী আন্দোলনের সামনে শত্রু এক হয়ে গেলো অর্থাৎ আমেরিকা ও তার মিত্ররা। এটি আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে একটি কৌশল। ”

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ উপদেশমালা

শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

“যুবকদের উচিত, তারা নিজেরা এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানবে এবং এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আশ্বস্ত থাকবে। এটা প্রত্যেকেরই অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়। শরীয়তের এই ফরয দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টিকারী ও বিরোধী লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

কত লোক এমন রয়েছে;যারা অল্প কিছু লোকের অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এমন অনেক জিহাদী জামাআতের সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা কাফির ও মুরতাদগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিলো লড়াইরত। তাদের অজুহাত এই ছিলো যে, এ জামআতের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে অন্য জামাআতগুলোর অবস্থা অনুরূপ হবে বৈকি। অথচ প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো সত্যকে সত্য বলে জানবে এবং নিজের উপর অর্পিত জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করবে, অতঃপর সে পথে ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখবে।

প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত, তাকে বিপদের মুখে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তো দরিদ্র নগণ্য বান্দার মতো। আগামীকালই তার মৃত্যু আসন্ন এবং তার সামনে কাজের যে সুযোগ ছিলো, তা শেষ হয়ে যেতে চলেছে। তাই তাকে চেষ্টা করতে হবে, সে যেন আল্লাহর দল এবং তার বন্ধুদের কাতারে শামিল হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩][৬২]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ [المجادلة:٢٠][৬৩]

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر:৪][৬৪]

শাইখ আসিম আবু হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ জিহাদে সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো তুলে ধরতে গিয়ে মুজাহিদদেরক নসীহত করে বলেন-

“তাকওয়া অবলম্বন, আমলে ইখলাস, হকের উপর অবিচলতা, জিহাদের কষ্টে ধৈর্যধারণ ও শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকা। (প্রত্যেকটা আমল খুবই জরুরী)

ঐক্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে, এমনিভাবে স্পষ্ট মানহাজ ও সালাফদের পন্থার আলোকেই হবে। ঐক্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং সবার জানা থাকতে হবে। আর সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো- দ্বীনকে বিজয়ী করা, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা।

অনুরূপভাবে ঐক্যকে সুসজ্জিত করা হবে-শরীয়তের অকাট্য মূলনীতি, উত্তম চরিত্র, আদাবে ইখতেলাফ, সুধারণা ও ভালো আচরণের মাধ্যমে।

আহলে ইলম, আহলে ফন, আহলে হিকমত ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এই জাতীয় নৃতাত্ত্বিক দক্ষ মানুষের উপস্থিতি প্রয়োজন, যারা জিহাদকে খুব কাছ থেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং যেকোনো ত্রুটিকে তাৎক্ষণিক চিহ্নিত করে তা পর্যায়ক্রমে সংশোধন করবে। ঈমানদারদের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেখানে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি উভয়টিই পরিহার করা হবে।

---

[৬২] হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। (সূরা আত-তাওবাহ: ১১৯)

[৬৩] নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (সূরা মুজাদালাহ: ২০)

[৬৪] এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর: ০৪)

মুজাহিদদের আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিশেষ করে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও উত্তম চরিত্র গঠন, সুন্দর আচার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং কুরআন-সুন্নাহর ঠিক জ্ঞান ও বুঝ প্রভৃতি। এগুলো অর্জনের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরী।

মতানৈক্যের কারণ চিহ্নিত করে শুরুতেই তা রোধ করা উচিত। পাছে যেনো তা আবার মারাত্মক আকার ধারণ না করে। মতবিরোধ চাই যতোই ছোট্ট হোক না কেনো!

মুজাহিদীনকে গ্রহণযোগ্য মুফতিয়ানে কিরামের উপর একীভূত করা। যত্রতত্র যে কেউ যেন দ্বীনি বিষয়ে কথা না বলে, এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ভুল ফাতওয়ার খণ্ডন যথাসময়ে খোলাখুলিভাবে করা। চাই তা আকাবীর (বড়দের) থেকে হোক বা আসাগীর (ছোটদের) থেকে।

মুজাহিদীনের মাঝে উত্তম আখলাকের প্রচার ঘটানো উচিত। বিশেষ করে নম্রতা ও বিনয়, সুধারণা, মায়া-মহব্বত, কুরবানী ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মতানৈক্যের সময় উপযুক্ত আচরণ প্রভৃতি। ”

****

উপসংহার

এ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দের শেষ দশকের মধ্যে আলজেরিয়ায় সংঘটিত কিছু ঘটনা এবং সেখানে জিহাদী আন্দোলনের উত্থান-পতনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। আমরা এই ফিরিস্তি আন্দোলনে শামিল, এমন বিজ্ঞ আলিমদের লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছি। যদিওবা এই ঘটনাপ্রবাহ ৫০টি মুসলিম দেশ থেকে শুধু একটি দেশের ঘটনা। ইতিহাসেরও শুধু এক দশকের কাহিনী। তন্মধ্যে অসংখ্য ইসলামীধারা হতে বিশেষভাবে জিহাদিধারারই ইতিহাস। কিন্তু আলজেরিয়ার উল্লিখিত অবস্থা ও পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত অন্যান্য স্বাধীন মুসলিম দেশের অবস্থাও এক ও অভিন্ন। এই বইটি এমন এক আয়না, যার

দ্বারা প্রত্যেক অবস্থাকে অবলোকন করা সম্ভবপর এবং এমন একটি কষ্টিপাথর, যার দ্বারা প্রত্যেক অবস্থাকে যাচাই-বাছাই করা সম্ভবপর।

বইটিতে মুসলিম দেশসমূহের শাসকশ্রেণির বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে যেসব শাসকশ্রেণির লাগাম বৈশ্বিক তাগুতদের হাতে রয়েছে, তাদের সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। বইটিতে মুসলিমদেশের সেক্যুলার ধারার প্রকৃত রূপ অঙ্কন করা হয়েছে, একইসঙ্গে অঙ্কন করা হয়েছে আহলে দ্বীনের ও ইসলামিক জাগরণী ধারার আসল রূপ। অতঃপর জিহাদীধারার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটিতে প্রত্যেকটি শ্রেণির জন্য, তাদের অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষণীয় অসংখ্য বিষয় রয়েছে যদিওবা এই বইয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য জিহাদীধারা বর্ণনা করা এবং সম্বোধনও তাদেরকেই করা হয়েছে। তবে বইটি অন্যান্য শ্রেণিকেও পরোক্ষভাবে সম্বোধন করেছে। এমনকি মুসলিমদেশের সাধারণ জনগণও নিজেদের পাথেয় এই বই থেকে খুঁজে নিতে পারবেন।

বইটিতে নিজকে বুঝা ও অন্যকে বুঝানোর মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। এখন কাজ হলো-সামনে অগ্রসর হয়ে রণকৌশল পরিবর্তন করা। বর্তমান কর্মপন্থা পরিবর্তন করা।

পরিশেষে প্রত্যেকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর করার প্রয়াস ব্যয় করার অনুরোধ করছি।

সারাংশ

১. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো- দীন ইসলামকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও তাঁর আনুগত্য করা। এতেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর ইহকালীন উন্নতি-প্রগতি ও সফলতার প্রকৃত রহস্য।

২. বৈশ্বিক কুফরি শক্তির একমাত্র লক্ষ্য হলো-ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহকে করতলগত করা এবং নিজেদের আওতাধীন রাখা। এজন্যে তারা সবসময় ইসলাম-বিরোধী দলের পক্ষপাতিত্ব করে থাকে এবং তারা চায়, সরকারের গদিটা যেন ইসলাম-বিরোধী দলগুলোর হাতেই থাকে।

৩. ইসলামীধারার দলগুলো এবং দীনি জামাআতগুলো যেন নিজেদের মানহাজকে বহিরাগত শক্তির সংবিধান ও মানহাজ অনুযায়ী নির্ধারিত না করে, ইসলামী

গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং শরীয়াহর আহকাম অনুযায়ী নির্ধারণ করে। এমনিভাবে শরীয়াহর দাঁড়িপাল্লায় দুনিয়াবি কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা উচিত।

৪. উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদারদের জন্য আবশ্যক হলো-তাদের কাজগুলো যেনো শুধু তাদের দেশে ইসলামের বিজয়ের জন্য না হয়, বরং তা যেনো পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যতটুকু সম্ভবপর দ্বীনদারদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এটা তখনই সম্ভবপর হবে, যখন তারা এমন সব শাসকশ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যাদের সঙ্গে পশ্চিমাদের আঁতাত রয়েছে।

৫. মুজাহিদীন এবং মুজাহিদ নেতাদের নিয়ে কি আর বলবো? পুরো বইয়ে তাদের জন্য রয়েছে ভরপুর শিক্ষণীয় বিষয়। এরাই তো তারা, যাদের আমল ও কাজের সঙ্গে ইসলাম এবং তার মাজলুম উম্মাহর ভবিষ্যৎ জড়িত। তারা যদি নিজেদের কাজের মুহাসাবা করেন, ভুল শুধরানোর প্রতি মনোযোগী হন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়াকে নিজেদের নিদর্শন বানিয়ে নেন, প্রত্যেক বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে নিজেও বাঁচেন এবং অনুসারীদেরকেও বাঁচান, গ্রহণযোগ্য উলামাদের মতানুযায়ী কল্যাণ-অকল্যাণের মানদণ্ড ঠিক করার ঠিক কষ্টিপাথরকে নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে নেন এবং মাযহাবগত মতানৈক্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঐক্যের চাদরে উম্মাহকে ঢেকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে শুধু কোনো একটি মুসলিম ভূখণ্ড নয়, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যৎ একমাত্র ইসলাম হবে। বলা যায় যে, ভবিষ্যতে পুরো বিশ্বেই ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়বে এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব মুসলিমদের হাতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৬. আল্লাহ না করুন! যদি এমনটা না করা হয়, তাহলে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। এর মাধ্যমে শুধু মুজাহিদরা প্রভাবিত হবেন না, বরং মুসলিমদের প্রত্যেকটা শ্রেণি প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটাই ইসলামের বিজয়ের পথে বড় আঘাত হানবে। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বারবার ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার ভার বহন করা সম্ভবপর নয়। লাগাতার ব্যর্থতার কারণে এক পর্যায়ে সাহস হারিয়ে যায়। ফলে তাদের সাহসিকতা হ্রাস পায়। মুজাহিদদের ব্যর্থতার ফলে উম্মাহর মাঝে জিহাদী আন্দোলনের যে ভাটা

প্রতিভাত হয়েছে, তাতে জিহাদী স্পৃহা চিরতরে দমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি উম্মাহর মধ্যে জিহাদী জযবা দৃঢ় না হয়, তাহলে ইসলামের বিজয়ের মানযিলটি অনেক দূরে হয়ে যাবে। এই অবস্থাটি মনে পড়লে অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

আমরা প্রথমত, আল্লাহর রহমতে এবং দ্বিতীয়ত, শুহাদায়ে মুজাহিদীনদের পবিত্র রক্তের বরকতে দৃঢ় আশা রাখি যে, মুজাহিদীনদের এ রকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না, বরং এখন ইসলাম বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, আর কুফর ও কাফিররা পরাজিত হবে এবং নিপাত যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের ঠিক বুঝ দান করুন এবং সে অনুযায়ী শুদ্ধ আমলের তাওফীক দান করুন, আমীন!

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করুন এবং কুফর ও কাফিরদের এবং মুনাফিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করুন, আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،وصلي الله تعالي علي نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلي آله وصحبه وأمته وعلينا أجمعين!

****

আলজেরিয়ার জিহাদ

ইতিহাস ও শিক্ষা

"ইসলামী আচারপ্রথায় একে অপরের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে না জানা অনেক গুরুতর একটা বিষয়। উম্মাহর কতো যুবক আবেগবশত কিছু একটা করে নিজেদের সময় নষ্ট করেছে এবং গোটা জীবনে বারবার ব্যর্থতার গ্লানি তাদের সইতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ

“পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। ”

-শাইখ আবু আসিম হাইয়ান হাফিযাহুল্লাহ

“যুবকদের উচিত, তারা নিজেরা এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানবে এবং এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আশ্বস্ত থাকবে। এটা প্রত্যেকেরই অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়। শরীয়তের এই ফরয দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টিকারী ও বিরোধী লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

কতো লোক এমন রয়েছে;যারা অল্প কিছু লোকের অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এমন অনেক জিহাদী জামাআতের সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা কাফির ও মুরতাদগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিলো লড়াইরত। তাদের অজুহাত এই ছিলো যে, এ জামাআতের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে অন্য জামাআতগুলোর অবস্থা অনুরূপ হবে বৈকি। অথচ প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো সত্যকে সত্য বলে জানবে এবং নিজের উপর অর্পিত জিহাদের ফরয দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। সে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করবে, অতঃপর সে পথে ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখবে।

প্রতিটি মুসলমানের জেনে রাখা উচিত, তাকে বিপদের মুখে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তো দরিদ্র নগণ্য বান্দার মতো। আগামীকালই তার মৃত্যু আসন্ন এবং তার সামনে কাজের যে সুযোগ ছিলো, তা শেষ হয়ে যেতে চলেছে। তাই তাকে চেষ্টা করতে হবে, সে যেনো আল্লাহর দল এবং তার বন্ধুদের কাতারে শামিল হতে পারে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। ” (সূরা আত তাওবা: ১১৯)

-শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ

****